22 30

কবিতা

আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৪
বর্ষ ২২, সংখ্যা ১
ক্রমিক সংখ্যা ৯১

ভাষা, কবিতা ও মনুষ্যত্ব

(সরকারি ভাষা-কমিশনের বিবৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ)

একমাত্র মানুষের ভাষা আছে, এবং মানুষমাত্রেরই ভাষা আছে। সমস্ত জীবজগতে অন্য কারো ভাষা নেই।

জীবের কাছে প্রকৃতির চাহিদা এই যে সে বংশানুক্রমে পৃথিবীতে টি'কে থাকবে। এই চাহিদা মেটাবার জন্য ভাষার কোনো প্রয়োজন হয় না। আত্মরক্ষা, প্রজনন ও সন্তানপালন—এই তিন কর্মই বিনা ভাষায় সম্পন্ন ও সুসম্পন্ন হ'তে পারে।

এমনকি মানুষের পক্ষেও ইঙ্গিতের দ্বারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ব্যক্ত করা সম্ভব, এবং যৌন কামনা জানাতে ও জাগাতে হ'লে বরং ভাষার চেয়ে কটাক্ষই বেশি কাজে লাগে। শিকার বা যুদ্ধ যখন মানুষের জীবিকার উপায় ছিলো তখন চীৎকার তার বলবৃদ্ধি করেছে, এবং সন্তানের জন্মের ভূমিকাস্বরূপ আজ পর্যন্ত নরনারীর কণ্ঠ যা উচ্চারণ ক'রে থাকে, আমাদের পূর্বপুরুষ তার নাম দিয়েছিলেন শীৎকার। চীৎকার বা শীৎকার, এর কোনোটাকেই ভাষা বলে না।

প্রজাপতির সংকল্পপূরণ ভাষানিরপেক্ষ ব্যাপার। দুই অংশিদার, পরস্পরের ভাষা না-জেনেও, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব লাভ করতে পারে। যদি আণবিক অস্ত্রে মানবজাতির ধ্বংস ঘটে, টি'কে থাকে শুধু কতিপয় কাফ্রি পুরুষ ও কতিপয় এস্কিমো নারী, তাহ'লে—যদি ঐ দু-দলে সাক্ষাৎ হয়—তারাই মানবজাতিকে আসন্ন লুপ্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না তা নয়। তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারে না ব'লে সেই মহৎ কর্মে বিঘ্ন হবে না।

অন্যান্য প্রাণীর গলা দিয়েও আওয়াজ বেরোয়। খিদে পেলে, আঘাত পেলে কামের বা বাৎসল্যের আবেগে অধিকাংশ স্থলচর পশু নিজ-নিজ বিধিবদ্ধ ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার ক'রে থাকে। পুরুষ-পাখি ইনিয়ে-বিনিয়ে সঙ্গিনীকে আহ্বান

করে, আমাদের কানে তা সুশ্রাব্য ব'লে বোধ হয়, আমরা তার নাম দিয়েছি 'গান'। কিন্তু সেই ধ্বনিসমূহের পরপারে, অন্য এক দিগন্তে, মানুষের ভাষার উদয় হয়েছিলো।

পিঁপড়ে ও মৌমাছি সংঘবদ্ধ সামাজিক জীবন যাপন করে; মৌচাক বা বল্মীকের গঠনপটুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই প্রাণীদের বিষয়ে বিস্ময়কর তথ্য বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। এরা ব্যূহরচনা জানে, পারে দূরে কাছে খবর পাঠাতে, বিপৎকালে স্বজাতিকে সতর্ক ক'রে দিতে। অর্থাৎ সামাজিক জীবন ভাষা বিনাও সম্ভব।

২

ভারতীয় ভাষা-কমিশনের যে-বিবৃতি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তার মুখবন্ধের সংস্কৃত বচন উদ্ধৃতিযোগ্য :

> ......যদ্বৈ বাঙ্ নাভবিষ্যৎ ন ধর্মো নাধর্মো ব্যজ্ঞাপয়িষ্যৎ ন সত্যং নানৃতং ন সাধু নাসাধু ন হৃদয়জ্ঞো নাহৃদয়জ্ঞো বাগেবৈতৎ সর্বং বিজ্ঞাপয়তি বাচমুপাস্স্বেতি।
>
> (ছান্দোগ্য-উপনিষদ্, (৭।২।১)
>
> যদি বাক্ না থাকতো তবে ধর্ম বা অধর্ম বিজ্ঞাপিত হ'তো না; সত্য বা অসত্য, শুভ বা অশুভ, মনোজ্ঞ বা অমনোজ্ঞ—কিছুই বিজ্ঞাপিত হ'তো না। বাক্‌কে উপাসনা করো।

বাক্ যদি উপাস্য হয় তা কি শুধু এইজন্য যে তার অভাবে 'কিছুই বিজ্ঞাপিত হ'তো না'? ভাষা ছাড়া কিছুই জানা যায় না, এ-কথা কি সত্যি? নিমের পাঁচন মুখে পড়লেই আমরা জানতে পারি সেটা মনোজ্ঞ নয়, আর মধু যে মনোজ্ঞ তার প্রমাণ রসনাতেই নির্ভুলভাবে পাওয়া যায়। ভঙ্গিতে ও চোখের দৃষ্টিতে মিথ্যা ধরা পড়ে; শীতে আচ্ছাদন বা তৃষ্ণায় জল যে শুভ বস্তু তা স্বতই ও সেই মুহূর্তেই বিজ্ঞাপিত হ'য়ে থাকে। যে-লোকটার এইমাত্র পকেট কাটা গেলো তাকে ধর্ম ও অধর্মের তফাৎ বোঝাবার জন্য শাস্ত্র প'ড়ে শোনাতে হয় না। অতএব, যদিও উপনিষদের বচন, ভাষার এই সংজ্ঞার্থ অগ্রাহ্য।

কিন্তু উপনিষদ্-সমূহেই ভাষা বিষয়ে অন্য যে-সব বাণী আছে, সেগুলিকে উপেক্ষা ক'রে যে ভাষা-কমিশন এই বিশেষ বচনটিকে বীজমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছেন—তা দৈবাৎ নয়, রীতিমতো সুচিন্তিতভাবে। ভাষা বিষয়ে অধিকাংশ

সদস্যের যা মনোভাব—ভাষা বলতে তাঁরা যা বোঝেন—তার নিকটতম সংহত রূপ এই বচনে বিধৃত আছে। সে-মনোভাব তাঁদের ২৬৯ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘায়িত আলোচনার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে, এবং ২৬৯ পৃষ্ঠা ধ'রে যে-কথা তাঁরা প্রচ্ছন্ন রেখেছেন তা স্পষ্টভাবে, নির্ভুলভাবে প্রকট হ'য়ে উঠেছে গ্রন্থের সর্বশেষ অনুচ্ছেদটিতে :

> Language is in a sense profoundly important and in another sense of little or no consequence! It is important at the level of instrumentality. It is a loom on which the life of a people is woven. It is, however, of no intrinsic consequence in itself because it is essentially an instrumentality: the loom, not the fabric; only a vehicle of thought and not thought itself; a receptacle for the traditions, usages and cultural memories of a people, but not their substance. It is not language but education that is aimed at in the schools; it is not language but good government that is aimed at in the field of public administration; it is not language but justice that is sought in the law courts. That which lends itself to the most convenience is the correct solution of the language problem in the various fields. Surely, there does not have to be heat and passion over the issue of Language, ever the instrumentality and not the substance!
>
> (ভাষা-কমিশনের রিপোর্ট : পরিচ্ছেদ ১৫, অনুচ্ছেদ ১৮, পৃ ২৬৯)
>
> ভাবানুবাদ :
> ভাষা এক অর্থে অত্যন্ত বেশি জরুরি, অন্য অর্থে এতে প্রায় কিছুই এসে যায় না! ভাষা যেখানে যন্ত্র, সেখানে তা মূল্যবান। ভাষা সেই তাঁত, যাতে জাতির জীবন বোনা হ'য়ে থাকে। কিন্তু তার নিজস্ব মূল্য কিছু নেই, কেননা তা সারত একটি যন্ত্র মাত্র : শুধু তাঁত, বস্ত্র নয়; শুধু চিন্তার বাহন কিন্তু চিন্তা নয়; একটি জাতির আচার, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক স্মৃতির আধার, কিন্তু তাদের সারবস্তু নয়। বিদ্যালয়ে আমাদের লক্ষ্য ভাষা নয়, শিক্ষা; সরকারি কর্মের ক্ষেত্রে আমাদের যা লক্ষ্য তা ভাষা নয়, সুশাসন; আদালতে আমাদের লক্ষ্য ভাষা নয়, সুবিচার। সুবিধা যাতে সর্বাধিক, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাষাসমস্যার সেটাই নির্ভুল সমাধান। ভাষার প্রশ্ন নিয়ে নিশ্চয়ই হৃদয়াবেগ ও উত্তেজনার প্রয়োজন করে না—যে-ভাষা কখনোই সারবস্তু নয়, শুধু যন্ত্র!

অনুচ্ছেদটির প্রথম ও শেষ বাক্যে একেবারে সরলভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে ভাষা নামক বস্তুটা কোনো বস্তুই নয়, তাতে প্রায় কিছুই এসে যায় না। এই বক্তব্যকে জোরালো ক'রে তোলার জন্য এর প্রণেতাগণ দু-দুটি অবজ্ঞাসূচক বিস্ময়চিহ্নেও বিদ্ধ করেছেন একে—যেন ভাষা ব্যাপারটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চান। 'Instrument'-এর বদলে 'instrumentality' ব'লে ঠিক কী তফাৎ করা হ'লো তা বোঝার মতো সুগভীর ইংরেজি জ্ঞান আমার নেই;

কিন্তু এ-কথা সহজেই অনুমেয় যে 'যন্ত্র'রূপে স্বীকার করলেও যেটুকু স্বকীয় মর্যাদা দিতে হয় তাও তাঁরা ভাষাকে দিতে নারাজ, তাকে তাঁরা অতি কষ্টে মানতে পারেন বড়ো জোর একটি 'যান্ত্রিকতা' হিশেবে—যা সম্পূর্ণ নির্বস্তুক, বিমূর্ত, প্রায় অস্তিত্বহীন। কিন্তু শব্দপ্রয়োগের সূক্ষ্ম বিচারে যদি প্রবৃত্ত নাও হই, তাহ'লেও সন্দেহ করা যায় না যে ভাষা-কমিশনের অধিকাংশ সদস্য ভাষা বলতে বোঝেন একটি যন্ত্র বা বাহন, একটি আধার বা উপায় মাত্র, যার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন ক'রে থাকি। এবং আমি এই মুহূর্তেই ব'লে নিতে চাই যে ভাষা বিষয়ে এই ধারণা সারত ভুল, মূলত মিথ্যা, মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতিবাদী।

ভাষা যে-অর্থে উপায়মাত্র—'means of communication'—সে-অর্থে ইতর প্রাণীরও ভাষা আছে। পাখি ডাকে, পশু গর্জন করে, পিঁপড়ে প্রভৃতি কীটেরা স্পর্শের দ্বারা বার্তা পৌছিয়ে দেয়। শুধু বার্তা পৌছিয়ে দেবার জন্য মানুষেরও সব সময় ভাষার দরকার করে না। চোখের দ্বারা প্রেম, ঘৃণা, অনুরোধ, নিষেধ, ভয়, বিতৃষ্ণা ব্যক্ত করা যায়; হাতের স্পর্শে প্রকাশ করা যায় সেবা, কামনা, শুভেচ্ছা, আবার সেই স্পর্শেরই ওজন বাড়িয়ে দিলে হিংসাবৃত্তি প্রকট হ'য়ে ওঠে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসংখ্য সাংকেতিক ভঙ্গি মানবসমাজে প্রচলিত আছে: চিমটিও একপ্রকার বার্তা—'communication', চিমটিভোগীর 'উঃ' শব্দও তা-ই। ভাষা বাদ দিয়েও যদি এতদূর পর্যন্ত বিনিময় করা যায়, আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধিতে বিঘ্ন না ঘটে, এবং সামাজিক জীবনও সম্ভব হয়, তাহ'লে মানুষের ভাষার প্রয়োজন হ'লো কেন?

উত্তরে বলা যেতে পারে যে চিমটি, চুম্বন বা হ্রেষাধ্বনির তুলনায় ভাষা অনেক ব্যাপকতর অর্থে বার্তাবহ; মানবসমাজের বহুবিচিত্র কর্মের যথাযোগ্য সম্পাদনের পক্ষে যথেষ্ট হবে এমন চিহ্নসমূহ শুধু ভাষাতেই পাওয়া যায়;—স্পর্শে, ভঙ্গিতে বা নিনাদে নয়। 'আমার খিদে পেয়েছে' বা 'আমি তোমাকে কামনা (বা ঘৃণা) করি'—এ-রকম কথা ভঙ্গির দ্বারা বলা গেলেও 'কংগ্রেসকে ভোট দিন', 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক' বা 'একনায়কত্বের অবসান চাই' বলতে হ'লে ভাষা ভিন্ন চলে না। 'গ্রীষ্মের পরে বর্ষা আসে', 'ভারতের বর্তমান

রাষ্ট্রপতি হিন্দি প্রচার ক'রে থাকেন', 'একটি ত্রিভুজের দুই ভুজ যুক্ত হ'লে তৃতীয় ভুজের চেয়ে দীর্ঘ হবেই'—এ-সব বলার জন্যও ভাষা চাই। এবং এ-সব কথা বাংলায় যত ভালোভাবে বলা যায়, কানাড়া, মরাঠি, হিন্দি বা উড়িয়াতেও ততটাই—উনিশ-বিশের বেশি তফাৎ এখানে হ'তে পারে না। যে-বস্তু একটা 'উপায়মাত্র, সারবস্তু নয়', যার 'নিজস্ব মূল্য কিছুই নেই', তা হিন্দি হোক বা ইংরেজি হোক বা রাশিয়ান হোক, তাতে কী-ই বা এসে যাচ্ছে। অতএব—এই হ'লো ভাষা-কমিশনের অধিকাংশ সভ্যের পরামর্শ—আসুন আমরা সর্ব-ভারতে সবাই মিলে হিন্দিকে গ্রহণ করি, তাতে জাতীয় ঐক্য দৃঢ় হবে এবং সারা দেশে সর্বপ্রকার কাজ চালাবার পক্ষে সুবিধে হবে সবচেয়ে বেশি।

যদি ভাষার কাজ হ'তো শুধু বার্তাজ্ঞাপন, তথ্যপরিবেশন ও স্লোগান বা বিজ্ঞাপনধর্মী স্থূল আবেগের প্রকাশ, যদি তার দ্বারা শুধু সরকারি পত্র, রিপোর্ট, দলিল, সাংবাদিক প্রবন্ধ বা জনসভার বক্তৃতা রচনা করতে হ'তো, তাহ'লে এ-কথা মেনে নেবার তেমন বাধা ছিলো না। যদি ভাষার দ্বারা মানুষ ইতিহাস, ধর্মনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন, বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা ছাড়া আর-কিছুর চর্চা না করতো, তাহ'লেও এ-কথা মেনে নেয়া একেবারে অসম্ভব হ'তো তা নয়। কেননা ইতিহাসে দেখা যায় যে মানুষ পরভাষায় এই সব কাজই চালাতে পেরেছে। মোগল আমলের ভারতে পারস্য যখন রাজকার্যের ভাষা ছিলো তখন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিরা তা শিখে নিয়েছেন; মধ্যযুগের য়োরোপে ইটালি, হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি সব দেশেই পণ্ডিতেরা লাটিন ভাষায় সূক্ষ্ম জটিল বিতর্ক ও সারবান গ্রন্থ রচনা করেছেন; উনিশ শতকের রাশিয়াতে ফরাশি ছিলো—শুধু দরবারি আমির-ওমরাহের নয়, সমগ্র শিক্ষিত শ্রেণীর সামাজিক ও পারিবারিক ভাষা, যাতে এমনকি মা ছেলেকে আদর করেন বা তরুণযুগলের প্রেমালাপ চলে। গত দেড়শো বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব থেকে আরম্ভ ক'রে সেন্সাস-রিপোর্ট পর্যন্ত বহু বিষয়ে মূল্যবান গবেষণাপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বহু পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, যার ভাষা ইংরেজি এবং প্রণেতাগণ ভারতীয়। ইংরেজিতে আমরা যা পেরেছি, হিন্দিতেই বা তা পারবো না কেন?

কিন্তু একটি প্রশ্ন বাকি থেকে যায়। কেন, যে-কালে য়োরোপ ভ'রে বিদগ্ধজন লাটিনে ভিন্ন চিন্তা করতেন না, সেই কালেই য়োরোপের কবিরা তাঁদের নিজ-নিজ মাতৃভাষায় রচনা ক'রে গেছেন, শৌর্য এবং প্রেমসম্পৃক্ত অসংখ্য রোমান্স—যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আর্থারের রাজসভার কাহিনীমণ্ডল—আর কেনই বা পরবর্তী পশ্চিমী সাহিত্য সেই দেশীয় সাহিত্যের প্রভাবেই ভরপুর? কেন প্রভাঁসালের মতো লৌকিক ভাষায় লাটিনপ্লাবিত য়োরোপ তার আধুনিক গীতিকাব্যের মূলসূত্র আবিষ্কার করেছিলো? কেন ক্যাথলিক ধর্মের যেটি শ্রেষ্ঠ সপ্রাণ অভিব্যক্তি সেই 'ডিভাইন কমেডি'র ভাষা লাটিন হ'লো না, হ'লো তখনকার অবহেলিত ইটালিয়ান? উনিশ শতকের রুশ লেখকেরা যখন অমর সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, সেই সাহিত্যের ভাষা কেন ফরাশি হ'লো না, হ'লো রাশিয়ান—যাতে তাঁরা ভৃত্য, পিতামহী ও কৃষকদের সঙ্গে ভিন্ন পারতপক্ষে কথা বলতেন না? আর কেনই বা গত দেড়শো বছরের মধ্যে, বিদেশীর পক্ষে যতদূর সম্ভব উত্তমরূপে ইংরেজি শিখেও, কোনো ভারতীয় ইংরেজিতে কোনো মৌলিক সাহিত্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেনি, যা ইংরেজি সাহিত্যের সম্পদরূপে স্বীকৃত হয়েছে?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে মুহূর্তের বেশি সময় লাগে না। মানুষ পরভাষায় প্রায় যে-কোনো কাজই চালাতে পারে, পারে না শুধু কাব্য, নাটক, উপন্যাস লিখতে, সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনা করতে। কেন পারে না? যেহেতু সাহিত্য যেখানে সৃষ্টিশীল সেখানে মানুষের সমগ্র অন্তরাত্মা সক্রিয় হ'য়ে ওঠে—শুধু তার বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়বোধ ও হৃদয়বৃত্তি নয়, তার নির্জ্ঞান মন, তার আত্মায় অধিষ্ঠিত নরক ও স্বর্গ, তার পূর্বপুরুষের ধূসর স্মৃতিপুঞ্জ। স্পষ্ট দিবালোকে যুক্তিনির্ভর জীব ও প্রজা হিশেবে যা-কিছু কর্ম করি আমরা—সন্তানপালন, রাষ্ট্রচালনা, শিক্ষাদান, বিচার-বিতরণ, তার বিধিবদ্ধতার খাপে-খাপে প্রায় যে-কোনো ভাষাকেই মানিয়ে নেয়া যায়, এবং সুবিধে বুঝে একটা ফেলে আর-একটাকে গ্রহণ করলেও আপত্তি ওঠে না। যদি মানবিক ভাষার বদলে চিহ্ন ব্যবহার করলে গণিত অথবা বিজ্ঞানের বেশি সুবিধে হয়, নিশ্চয়ই তা-ই করতে হবে। উদ্দেশ্য যেখানে সুনির্ণীত, যেখানে আমরা জ্ঞান দিতে চাই, কিছু প্রমাণ করতে চাই, চাই

বিরোধী মতকে পরাস্ত করতে অথবা দেশপ্রেমের মতো কোনো সমষ্টিগত আবেগ জাগাতে, সেখানে ভাষা জিনিশটাকে নেহাৎই একটা উপায় হিশেবে স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু এ ছাড়াও অন্য একটা জীবন আছে মানুষের, তা না-থাকলে সে পূর্ণ মানব হ'তো না। সে-জীবন গোধূলির, আধো অন্ধকারের, স্বপ্নের। এই বিজ্ঞানপোষিত বিশ শতকেও স্বপ্নে আমরা ছেলেমানুষ বা আদিম মানুষে রূপান্তরিত হই, সেখানে আমাদের দিনের আলোর সব শিক্ষা ধ্বংসে পড়ে, ত্রাস আশা উদ্যম কোনো যুক্তি মানে না—স্বল্পালোকিত সুড়ঙ্গের মধ্যে হাৎড়ে-হাৎড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয় আমাদের। সেই অচিন্তিত চলার কোনো চিহ্ন যদি খুঁজে পাই আমরা, সে-চিহ্ন একটিমাত্র হ'তে পারে: আমাদের মাতৃভাষা। সেই আদিম ও আবিল অন্ধকার থেকে যদি কোনো স্বচ্ছ মণি আমরা ছেঁকে তুলতে চাই, চাই কোনো স্মৃতি, আবিষ্কার বা অভিজ্ঞানকে ছিনিয়ে আনতে, সে-কাজ সম্ভব হ'তে পারে একমাত্র সেই ভাষাতে, যা আমাদের অচেতনের অন্তরঙ্গ, এবং যার মধ্যে পরতে-পরতে জড়িত হ'য়ে আছে আমাদের সমস্ত পূর্বপুরুষের বহুযুগব্যাপী জীবনসূত্র। এবং এই কাজই কবি ক'রে থাকেন: সচেতন জীবনের সঙ্গে অচেতনের ঘটকালি করেন তিনি; আমাদের বন্য বিশৃঙ্খল স্বপ্নসত্তাকে চিন্ময় রূপ দান করেন, চৈতন্যকে পূর্ণতা দেন স্বপ্নযামিনীর সংস্পর্শে এনে। মানুষের এই একটি কাজ, যা ভাষা বিনা সম্ভব হয় না, এবং বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ ভাষায় ভিন্ন সম্ভব হয় না। অতএব এই কাজটিকে পরীক্ষা না-ক'রা পর্যন্ত আমরা জানতে পারি না, ভাষা বলতে সত্যি কী বোঝায়, মানবজীবন ও মনুষ্যত্বের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কী। ভাষা ও সাহিত্য অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর-সম্পৃক্ত; একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির আলোচনা অসম্ভব। কিন্তু ভাষা-কমিশনের বিবৃতিটি নানা বিষয়ে আলোচনা ক'রেও ঠিক এই প্রসঙ্গের সীমান্তে এসে থেমে গেছে। 'বিদ্যালয়ে আমাদের লক্ষ্য ভাষা নয়, শিক্ষা; সরকারি কর্মের ক্ষেত্রে আমাদের যা লক্ষ্য তা ভাষা নয়, সুশাসন, আদালতে আমাদের লক্ষ্য ভাষা নয়, সুবিচার।' কিন্তু এর পরে কবিতার কথা উল্লেখ করতে হ'লে বলতে হ'তো, 'কবিতায় আমাদের লক্ষ্য ভাষা নয়, কবিতা'—যার অর্থ দাঁড়াতো, 'কবিতায় আমাদের

লক্ষ্য ভাষা ভিন্ন আর-কিছু নয়।' কিন্তু এ-কথা কমিশনের অধিকাংশ সদস্য বলতে পারতেন না ও বলতে পারেননি, কেননা তাহ'লে মহোদয়গণের সকল যুক্তি ভেঙে পড়তো। যদিও তাঁদের আলোচনার বিষয় ভাষা, সৃষ্টিশীল সাহিত্য বিষয়ে আদ্যন্ত একটি গভীর নীরবতা বজায় রেখেছেন তাঁরা। ভালোই করেছেন; আমাদের পক্ষে বোঝা আরো সহজ হয়েছে যে তাঁদের সচেতন উদ্দেশ্য, মুখবন্ধের উদ্ধৃতি থেকে আরম্ভ করে সর্বশেষ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত, পদে-পদে ভ্রান্তিপ্রচার।

আইন, শিক্ষা, শাসন প্রভৃতিকে যথাবিহিত সম্মান জানাবার পর আমরা যখন সাহিত্যের আহ্বান শুনতে পাই, তখনই ভাষা বিষয়ে অন্য একটি ধারণায় আমাদের অন্তস্তল উদ্ভাসিত হ'তে থাকে; এই একটি ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে আমরা উপলব্ধি করি যে ভাষা কোনো উপায়মাত্র নয়, ভাষাই উৎস; চিন্তা থেকে ভাষা নির্গত হয় না, ভাষাই চিন্তাকে জন্ম দেয়। স্বপ্নে আমরা যা দেখি সেই ছবিগুলোকে বলা যায় বিশ্বপুরাণের চিত্রকল্প, মানবাত্মার আবেগসমষ্টির আদিরূপ; সেই ক্ষণিক, চঞ্চল ও অসংলগ্ন চিত্রসমূহ তাদের অব্যবহিত আবেগ-সঞ্চার পরিহার ক'রে যখন ভাষার মধ্যে স্থিরতা, স্থায়িত্ব ও স্বচ্ছতা পেলো, তখনই চিন্তা নামক কাজটি সম্ভব হ'লো মানুষের পক্ষে। তার আগে চিন্তা ছিলো না, ছিলো শুধু আবেগের আঘাত আর ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি। বাঘ যখন ক্ষুধার আবেগে আকুল শুধু তখনই সে হরিণটাকে লক্ষ্য করে, অন্য সময়ে হরিণের কোনো অস্তিত্বই নেই তার কাছে। কিন্তু মানুষ যখন হরিণকে আহার অথবা আদর করতে না চায় তখনও হরিণের সত্তা তার কাছে সুস্পষ্ট, কেননা 'হরিণ' নামক শব্দটাকে সে পেয়েছে। ঐ শব্দ আছে ব'লেই, হরিণ বিষয়ে কোনো ব্যক্তিগত আবেগের অধীন না-হ'য়েও, তাকে ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব না-ক'রেও, ঐ জন্তুকে মনে-মনে ধারণা করতে পারে সে, অর্থাৎ তার বিষয়ে চিন্তা করতে পারে। যদি স্বপ্নের চিত্রভাষা ছাড়া আর-কিছু না থাকতো, তাহ'লেও পুরাণের অস্তিত্ব থাকতো না তা নয় কিন্তু ইতিহাস সম্ভব হ'তো না। যদি মানুষ তার স্খলমান মুহূর্তগুলির অব্যবহিত প্রভাবের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতো, তাহ'লেও ভ্রূণাবস্থায় রূপকথা সম্ভব হ'তো না তা নয়, কিন্তু বিজ্ঞান হ'তো না।

তাঁরই নাম কবি, যিনি আবেগের দৈহিক অভিঘাত থেকে যাত্রা ক'রে সেই দৈহিক অভিঘাত থেকে মুক্তি দেন মানুষকে, ইন্দ্রিয়গত সংবেদনকে রূপান্তরিত করেন সেই আধ্যাত্মিক সামগ্রীতে, যাকে আমরা অভিজ্ঞতা ব'লে থাকি। আমাদের এই আদিকবি একেবারে কাব্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের জনক: তাঁর চিত্তে আবেগ থেকে জ্ঞান নিষ্কাশিত হ'য়ে জ্ঞান আবার সঞ্জীবিত হয়েছে আবেগে; বিশ্বপুরাণ থেকে মানবেতিহাস বিশ্লিষ্ট হবার পর ইতিহাস আবার পুরাণের স্রোতে মিশ্রিত হ'য়ে নতুন ক'রে প্রাণ পেয়েছে। এবং তাঁর ও ভাষার জন্ম একই লগ্নে; তাঁর সত্তা একান্তরূপে ভাষানির্ভর। মানুষের ভাষা আছে, এতেই প্রমাণ হয় যে তার সারাৎসার কবির। মানুষ যদি কবি না হ'তো তাহ'লে তার ভাষার প্রয়োজন হ'তো না।

এইজন্যে জর্মান দার্শনিক হামান্ বলেছিলেন যে 'কবিতাই মানবজাতির মাতৃভাষা।' য়োহান্ গেয়র্গ হামান্, যাঁর প্রভাবের বশবর্তী হ'য়ে প্রথমে হের্ডার ও পরে য়াকবি আধুনিক ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিস্থাপন করেন, তাঁর এই বাক্যের সমর্থন আছে পৃথিবীর বহু পুরাণে ও ধর্মগ্রন্থে। ইহুদির অতি-সরল সৃষ্টি-কাহিনীতে চিন্তনীয় অংশ সেখানে আরম্ভ হ'লো, যেখানে ভগবান, ছয় দিনে বিশ্বনির্মাণ ও সপ্তম দিনে বিশ্রাম করার পর, যাবতীয় জন্তু ও প্রাণীকে আদমের সামনে উপস্থিত করলেন নামকরণের জন্য। প্রত্যেক প্রাণীর একটি ক'রে নাম চাই, এবং সে-নাম আদমকেই দিতে হবে। ভগবানের এই নির্দেশেই বোঝা যায় যে আদমের পতন অনিবার্য, এবং সে-পতন ভগবানেরই অভিপ্রেত ছিলো। কেননা যে-মানুষ নামকরণ করে সে অমরকাননের অজ্ঞান অবস্থা ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গেছে, হ'য়ে উঠেছে একাধারে কবি ও বিজ্ঞানী। জ্ঞানের ও আনন্দের আকাঙ্ক্ষা, মানুষের এই দুই বৃত্তি সমভাবে সজাগ, একটিকে বাদ দিয়ে তার অন্যটি সম্পূর্ণ হয় না। 'হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম/কী তোমার নাম/হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে/নামেতে কী হবে।/আর কিছু নয়,/হাসিতে তোমার পরিচয়'—লেখক যদিও রবীন্দ্রনাথ, তবু এই কথাকে পূর্ণ মানবের উক্তি ব'লে মানতে পারি না আমরা; কোনো অচেনা ফুল দেখলে আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রথমেই জিগেস করি, 'এর নাম কী?', এবং রবীন্দ্রনাথও

তা-ই করেছিলেন। সেই নামের সংজ্ঞার্থ উদ্ভিদবিজ্ঞানীর পক্ষে এক প্রকার, কবির পক্ষে অন্য প্রকার; কিন্তু নাম জিনিশটা দু-জনেরই চাই, তা না-পাওয়া পর্যন্ত ঐ ফুল মানুষের পক্ষে আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যবহার্য হয় না। মানুষের ভাষাকে শেষ পর্যন্ত বলা যেতে পারে নামের সমষ্টি; হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে এই জগৎ নাম ও রূপের দ্বারা গঠিত। আর এ-বিষয়েও বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে মতভেদ নেই যে শুধু পরমেশ্বরের নাম আবৃত্তি ক'রে মানুষ ত্রাণ পেতে পারে।

'প্রারম্ভে ছিলো বাক্', এই ব'লে সন্ত ইয়ন তাঁর যীশুজীবনী আরম্ভ করেছেন। রনাল্ড নক্স -কৃত বাইবেলের নূতন অনুবাদে কথাটা ঈষৎ ভিন্নভাবে বলা আছে—'কালের যখন আরম্ভ তখনই বাক্ ছিলো; ঈশ্বরের সহচর ছিলো বাক্; সেই বাক্ই ঈশ্বর। তিনি (বাক্) ছিলেন, কালের প্রারম্ভে, ঈশ্বরের সহচর হ'য়ে। তাঁরই মধ্য দিয়ে সর্বভূত উদ্ভূত হ'লো; যা-কিছু হয়েছে তাঁর বিহনে কিছুই হয়নি। তাঁরই মধ্যে ছিলো প্রাণ, সেই প্রাণ মানবের আলোক-স্বরূপ।' এবং, সন্ত ইয়নের মতে, যীশুর মধ্যে 'the word was made flesh', যীশু এই বাক্-এরই অবতার। উপনিষদ্‌সমূহে ব্রহ্মের নামান্তর 'অক্ষর', এবং সংস্কৃতে ঐ শব্দের অর্থ একাধারে 'অপরিবর্তনীয়' বা 'ধ্বংসহীন', এবং 'শব্দ' বা 'বর্ণমালার চিহ্ন'। বাক্ ও ব্রহ্মকে এক ব'লে ভাবা হয়েছে এখানে, এক ব'লে বিশ্বাস করা হয়েছে। 'অক্ষর' বলতে ওঙ্কারকেও বোঝায়, যে-ওঙ্কার জীবাত্মারূপ বাণের ধনুস্বরূপ (মুণ্ডকোপনিষদ্ : ২।২।৪), আত্মা থেকে অভিন্ন (মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ : ৮), ধ্যানের অবলম্বন (মুণ্ডকোপনিষদ্ : ২।২।৬) এবং সর্ববেদের প্রধান ও স্বয়ং পরমেশ্বর (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ : ১।৪।১)। অক্ষরকে না-জানলে বেদজ্ঞান বৃথা, কেননা পরমাকাশরূপ অক্ষরেই (ব্রহ্মেই) ঋগাদি বেদ ও সর্বদেবতা আশ্রিত আছেন (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ : ৪।৮)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, সর্বজীবের প্রাণের উৎসই বাক্; পশু, মানব ও দেবগণের মধ্যে সকলেই বাঙ্-নির্ভর, বাক্ ধ্বংসহীন, সনাতনের আদিসন্তান, বেদাদির মাতা ও বিশ্বের নাভিস্বরূপ। প্রাচীন পারসিকের ধর্মগ্রন্থ—যেখানে শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্বকে সৃষ্টির মূলসূত্র ব'লে কল্পনা করা হয়েছে—তার সৃষ্টিকাহিনী অনুসারে ভগবানের পরম শক্তি বাক্, বাক্ পার্থিব সৃষ্টির পূর্বজ ও শয়তানের শক্তির বিরুদ্ধে রক্ষা-

কবচ। বহু আদিম জাতির পুরাণেও এই বিশ্বাস পাওয়া যায় যে বাক্ ও সৃষ্টি-কর্তা অভিন্ন এবং বাক্ থেকেই সৃষ্টি উৎসারিত হয়েছে।

বাক্ থেকে সৃষ্টি উৎসারিত হয়েছে, জীবনের বহু ক্ষেত্রে এর কোনো নিদর্শন আমরা পাই না, বরং উল্টো পক্ষেই অনেক সাক্ষী সংগ্রহ করা যেতে পারে। কথাটা আজকের দিনে উচ্চার্য হ'তো না, যদি না, হর্বার্ট স্পেন্সারের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ ক'রে, মানবজাতি নির্ভুলভাবে জানিয়ে দিতো যে কবিতা না-হ'লে তার চলে না। যন্ত্র এবং উপযোগবাদের এই ব্যাপ্তির দিনেও কবিতার সত্তা যে অনাক্রমণীয়, এতেই বোঝা যায় যে মানুষের আদি পুরাণসমূহ ভুল করেনি। বাক্ থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, কবিতাই এ-কথার তর্কাতীত প্রতিষ্ঠাভূমি। আমরা যখন কবিতা পাঠ করি, বা স্মরণ করি, তখনই বুঝি ভাষার মূল্য তার নিজেরই মধ্যে, তার অভিধানগত অর্থের মধ্যে সে-মূল্যকে ধরানো যায় না; বাহনমাত্র নয় সে, নিজেই দেবতা। কবি যখন কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন তিনি তখনই বোঝেন যে সৃষ্টির উৎসস্থলই ভাষা, তাঁর রচিত কাব্যটি যতটা তাঁর ঠিক ততটাই তাঁর ভাষার সৃষ্টি; যে ভাষা তাঁর হাতে একটি যন্ত্র হওয়া দূরে থাক, তিনি বরং তখনকার মতো ভাষার একটি নিমিত্তে পরিণত হন, এবং নিমিত্ত হিশেবে তিনি কতদূর পর্যন্ত বাধ্য, মনোযোগী ও তন্ময় হ'তে পারেন তারই উপর তাঁর কৃতার্থতা নির্ভর করে। এবং ভাষার উচ্চতম ও সত্য রূপও এখানেই আমরা দেখতে পাই—কবিতায় বা সৃষ্টিশীল সাহিত্যে।

৩

ভাষা-কমিশন যে-ঔপনিষদিক বচন উদ্ধৃত করেছেন এবার সেটিতে ফিরে আসা যাক। 'যদি বাক্ না থাকতো তবে ধর্ম বা অধর্ম বিজ্ঞাপিত হ'তো না, সত্য বা অসত্য, শুভ বা অশুভ, মনোজ্ঞ বা অমনোজ্ঞ—কিছুই বিজ্ঞাপিত হ'তো না।' এই উক্তির প্রকৃত অর্থ এই নয় যে ভাষা একটি উপায়মাত্র—কেননা শিশুও জানে যে ভাষা বিনাও মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞের তফাৎ বোঝা যায়; এর আসল অভিপ্রায় এ-বিষয়ে আমাদের সতর্ক ক'রে দেয়া যে ভাষা বস্তুটি উভমুখী। সত্য ও মিথ্যা, ভালো ও মন্দ, ধর্ম বা অধর্ম, প্রীতিকর ও কষ্টকর—ভাষা

একাধারে ও নির্বিচারে সবই জানাতে পারে, এই সব বিপরীতযুগলের নিরপেক্ষ প্রকাশক সে। ভাই ভাইকে গুলি ক'রে মারার পর আদালতে নির্দোষ ব'লে প্রমাণিত হয়, তা উকিলের ভাষারই সাহায্যে; যুদ্ধের সময় প্রত্যেক দেশের প্রচারকর্তারা শত্রুপক্ষকে পিশাচরূপে প্রতিপন্ন করেন, তারও মূলে আছে ভাষা। এবং কোনো সরকারি কমিশন, পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ভাষা ব্যবহার ক'রেই, এমন কোনো প্রস্তাবকে সারা দেশের পক্ষে হিতকর ব'লে ঘোষণা করতে পারেন, যাতে স্বল্পসংখ্যকের স্ফীতি ঘটিয়ে অধিকাংশকে বিনষ্ট করা হবে। ব্যবহারের অসাধুতা সঙ্গে-সঙ্গেই ধরা পড়ে, ভাষার অসাধুতা সূক্ষ্ম ব'লেই আরো বেশি ভয়াবহ। বাণিজ্যে, সংসারকর্মে, রাষ্ট্রচালনায় এই ভাষাগত অসাধুতা ব্যাপক-ভাবে দেখা যায়—শুধু আজকের দিনে নয়, ইতিহাসের যুগে-যুগে। যে-বস্তু এত বেশি বিকারপ্রবণ তাকে উপাস্য বলি কেমন ক'রে?

হয়তো এই অর্থেই হোল্ডার্লিন বলেছিলেন যে 'ভাষা মানুষের সবচেয়ে বিপজ্জনক সম্পত্তি'। বুদ্ধিমানের হাতে ভাষার বিকৃতি সহজেই ঘ'টে থাকে; এবং যাঁর যত বেশি বুদ্ধি তিনি ভাষাকে তত বেশি বিকৃত করতে পারেন। 'গালিভার্স ট্রাভেলস'-এর শেষ অধ্যায়ে সুইফট যে-অশ্বরূপী আদর্শ জীবের কল্পনা করেছিলেন তাদের পরিমিত ভাষায় 'মতামতে'র প্রতিশব্দ নেই, কেননা সেই পরম যুক্তিবাদী অশ্বসমাজ একান্তভাবে প্রমিতির প্রবক্তা, তাদের মধ্যে কখনো কোনো মতভেদ ঘটে না। আঠারো-শতকী আদর্শ-অনুযায়ী মানুষ একটি যুক্তিময় যন্ত্র হয়নি ব'লে আক্ষেপ করবো না আমরা, কেননা আমরা সকলেই জানি যে মানুষ যেমন কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদি রিপুর বশবর্তী, তেমনি তার মধ্যে প্রেম ভক্তি ত্যাগ ও সৃষ্টিশীলতার মতো মহৎ বৃত্তিও বিদ্যমান, এবং এই প্রবৃত্তি ও বৃত্তিসমূহ অন্যোন্যনির্ভর। একদিকে কামুক হিংসুক লোভী প্রভৃতি না-হ'লে অন্যদিকে সে সন্ত, বীর বা ঋষিও হ'তে পারতো না; সুইফট-এর 'উইনিম'-সমাজে সকলেই নৈতিক অর্থে ও নীরসভাবে ভালো, কিন্তু মহৎ কেউ নয়। মানুষ যেখানে জান্তব সেখানে সে অযৌক্তিক, আর যেখানে সে দেবতার মতো সেখানে সে অতিযৌক্তিক: তার নিম্নতম ও উচ্চতম স্তর সমানভাবে যুক্তিবহির্ভূত। এবং সাধারণত এই দুই

স্তরের অস্তিত্ব যুগপৎ ও অবিচ্ছেদী ব'লে মানবসমাজে কোনো বিশুদ্ধ যুক্তি সম্ভব হয় না; দার্শনিক দূরকল্পনায় তার ধারণা থাকলেও, কার্যত সব যুক্তির মধ্যেই প্রবেশ করে কোনো প্রবৃত্তি বা বৃত্তি, কোনো স্বার্থপর কামনা বা কোনো উন্নত আদর্শপ্রসূত আবেগ, এবং ঐ দুই বস্তুর একটি থেকে অন্যটিকে চিনে নেয়া যে সব সময় সহজ হয় না তার কারণই মানুষের ভাষার উভমুখী প্রকৃতি। যে-কোনো প্রশ্ন উঠুক, সভ্য মানুষ তার দুই দিকেই প্রায় একই রকম প্রভাবশালী তর্ক করতে পারে; নিজে যা বিশ্বাস করে না তার সমর্থন ক'রে ডিবেটিং ক্লাবে বাহবা পায় কলেজের ছাত্র; যখন যে-সরকার প্রতিষ্ঠা পান তাঁদেরই পছন্দমতো মতপ্রচারে রাজপুরুষের যুক্তির অভাব ঘটে না। শয়তান শাস্ত্র আওড়ায়; জুলিয়স সীজর বীর না অত্যাচারী, সে-বিষয়ে জনতার ধারণা ব্রুটাস বা মার্ক অ্যান্টনির বক্তৃতা অনুসারে বদলে যায়। যাকে আমরা যুক্তি বলি তার সাহায্যে অনেক সময়ই সত্যকে জানা যায় না; যে-ভাষা যুক্তির বাহন, সেই ভাষাই নানা বিভ্রমের সৃষ্টি করে। ভাষা যেখানে বাহন বা উপায়মাত্র, সেখানে তার বিকারপ্রবণতা অচিকিৎস্য।

কিন্তু এমন কোনো ক্ষেত্র কি নেই, ভাষা যেখানে মিথ্যাচারী হ'তে পারে না, আর তা যদি না থাকে তাহ'লে ভাষার নিজস্ব মূল্যই বা কোথায়। এই প্রশ্নের উত্তরে হোল্ডার্লিনেরই আর-একটি কথা উদ্ধৃত করবো: 'মানুষের সবচেয়ে অনপকারী কর্ম কবিতা।' 'অনপকারী'—কথাটাকে খুব কমিয়ে, অত্যন্ত মৃদুভাবে বলা হয়েছে; এর আসল অর্থ বুঝতে হ'লে কবিতার সঙ্গে ভাষার সম্বন্ধের কথা ভাবতে হবে। কবিতা সবচেয়ে অনপকারী কর্ম এই অর্থে যে কবিতায়—সৃষ্টিশীল সাহিত্যে—এবং একমাত্র সেখানেই—ভাষা হ'য়ে ওঠে অবিকার, নিষ্কলুষেয়, অমোঘভাবে সত্য। সাহিত্যের মহত্তম মুহূর্তগুলিতে সত্যের বদলে অসত্য, ধর্মের বদলে অধর্ম, মনোজ্ঞের বদলে অমনোজ্ঞের প্রকাশিত হবার উপায় নেই; কিন্তু আইন, বাণিজ্য বা রাষ্ট্রচালনা যেখানে সবচেয়ে উন্নত সেখানেও ভাষার মিথ্যাচার সম্ভব হ'তে পারে এবং হ'য়ে থাকে। কেননা আমাদের বোঝা ব্যাপারটা বুদ্ধির কাজ, আর উপলব্ধি স্বজ্ঞার; বুদ্ধি যদি আপন গুণেই নির্ভরযোগ্য হ'তো তাহ'লে মানবসমাজে ভুল বোঝা ব'লে কিছু

থাকতো না; বুদ্ধির এই অপলাপী স্বভাব শোধন ক'রে নিতে হ'লে স্বজ্ঞার সঙ্গে তার যোগসাধন চাই। স্বজ্ঞার উপলব্ধিতে কখনো ভুল হয় না কিন্তু প্রকাশের ক্ষমতা তার নেই; সে যখন বুদ্ধিকে তার সেবকরূপে গ্রহণ করে তখনই ভাষা হ'য়ে ওঠে সত্য, আর কবিতা সেই সত্য ভাষারই নামান্তর। এই ভাষা, মানুষের সমগ্র অন্তরাত্মা যাতে দীপ্যমান, তা তার মাতৃভাষা ভিন্ন আর কিছু হ'তে পারে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা উপযোগ বুঝে ভাষা বদলাতে পারি, যেমন পারি সুবিধেমতো বিভিন্ন বেশ' ধারণ করতে, কিন্তু ভাষা যেখানে অবিকার ও সত্য সেই সাহিত্যের প্রসঙ্গে ভাষা বলতে শুধু মাতৃভাষাকেই বুঝতে হবে। মাতৃভাষা আমাদের চিন্তার জননী, আমাদের আত্মিক জীবনের পরিচালিকা। এবং সেই ভাষা 'কখনোই সারবস্তু নয়, শুধু যন্ত্র', আর তা নিয়ে 'হৃদয়াবেগ বা উত্তেজনা'র প্রয়োজন করে না, এ-কথা যাঁরা বলেন ভাষা বিষয়ে তাঁদের কোনো পরামর্শ বিষয়ে শ্রদ্ধাবান হওয়া অসম্ভব।

৪

কিন্তু—কেউ-কেউ আপত্তি তুলতে পারেন—হিন্দি ভারতের সরকারি ভাষা হ'লে অন্যান্য সাহিত্যের ক্ষতি হবে কেন? যেমন লাটিন-প্লাবিত য়োরোপে ভিন্ন-ভিন্ন মাতৃভাষায় কাব্য রচিত হয়েছিলো, উনিশ-শতকী রুশ মনীষীরা ফরাশির আধিপত্য সত্ত্বেও খাঁটি রুশীয় সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, এবং ইংরেজ-শাসিত ভারতের কোনো-কোনো অংশে মাতৃভাষা ও তার সাহিত্যের নবজন্ম ঘটেছিলো, তেমনি নিখিলভারতের সরকারি কাজে হিন্দি ব্যবহৃত হ'লেও ভিন্ন-ভিন্ন সাহিত্যের বিকাশ হবার বাধা কী? মাতৃভাষা যদি আত্মিক ব্যাপারই হয় তার উন্নতিসাধন তো আমাদেরই হাতে আছে, রাষ্ট্র সেখানে কী করতে পারে? একই রকম যুক্তি অনুসারে ইংরেজ আমলে কেউ-কেউ বলতেন যে পরাধীনতা একটা কথার কথা মাত্র, তার অবসান ঘটাবার চেষ্টাও অনর্থক; কেননা পরাধীন অবস্থাতেও আমরা আকাশের নীলিমা দেখে খুশি হ'তে পারি এবং যোগাসনে মোক্ষলাভেরও বাধা হয় না। আর আজকের দিনে, এই যুক্তি অনুসারেই, অনেকে ব'লে

থাকেন যে অন্তরের স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নিতে পারে না, অতএব একনায়কত্বে দোষ নেই। ভাষা বিষয়ে আসল কথাটা এই যে কোনো পরভাষার আধিপত্য—সেই পরভাষা মাতৃভাষার তুলনায় অনেক উন্নত হ'লেও—মানুষ বেশিদিন সহ্য করতে পারে না: এত যে বলশালী সংস্কৃত ভাষা তাকেও হার মানতে হ'লো বিভিন্ন অপরিণত কথ্য ভাষার কাছে; লাটিন ভাষার আদিভূমি ইটালিতে মধ্যযুগীয় য়োরোপের প্রথম 'ভার্নাকুলর'-সাহিত্যের প্রোজ্জ্বল অভ্যুদয় ঘটলো; ইংরেজি সাহিত্যের গরীয়ান এলিজাবেথীয় যুগ, আর গ্যেটের যুগে জর্মান সাহিত্যের উত্থান—এ-দুয়েরই পটভূমিতে আছে বাইবেলের জেমসীয় ও লুথারীয় অনুবাদ—অর্থাৎ ধর্মের ক্ষেত্রে লাটিন থেকে মুক্তিপ্রাপ্তি; এবং উনিশ শতকে রুশ সাহিত্যের আকস্মিক ও আশ্চর্য আবির্ভাবের একটি কারণ এই যে রাশিয়া, আদিচার্চের অধীন ও লাটিনবর্জিত দেশ ব'লে, প্রথম থেকেই মাতৃভাষাকে ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করেছে। আর উনিশ-শতকী বাংলাদেশে—ইংরেজি শিক্ষা সত্ত্বেও, বা তারই ফলে—স্বীয় ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে যুগান্তকারী জাগরণ ঘটলো, যার পরিণতি 'স্বদেশী' আন্দোলনে। বাংলার সেই নবজন্মক্ষণেই আধুনিক ভারতের ভিত্তি স্থাপিত হয়, এ-কথা ভারতবর্ষীয় সকলেই জানেন যদিও আজ অনেকে স্বীকার করতে চান না।

ভারতে ইংরেজি ভাষার অবস্থা বিষয়ে আর-একটু বলা দরকার। প্রথমেই স্মর্তব্য যে ইংরেজি শাসকেরা তাঁদের ভাষাকে জোর ক'রে আমাদের উপর চাপাননি; এ-দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য উদ্যোগী ও সচেষ্ট হয়েছিলেন আমাদেরই রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত মহাপুরুষগণ। কেন সচেষ্ট হয়েছিলেন? যেহেতু তাঁরা বুঝেছিলেন যে ভারতের শ্বেতাঙ্গ শাসকগণ আধুনিক জগৎ ও মানসতার প্রতিভূ, এবং তাঁদের ভাষাকে বাহনরূপে ব্যবহার ক'রে আমরা মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কালে বদলি হ'তে পারি। সেকালে দেশের যে-সব অংশে পাশ্চাত্য চিন্তার অনুপ্রেরণা প্রত্যাখ্যাত হয়, বাদশাহি স্মৃতিমন্থর সেই উত্তরভারতে মধ্যযুগের অবসান ঘটতে বিলম্ব হ'লো, কিংবা এখনো সম্পূর্ণভাবে ঘটেনি—এবং একই কারণে হিন্দি ভাষায় ও সাহিত্যে আধুনিক জীবন স্বাভাবিকভবে বিম্বিত হ'তে পারছে না। কিন্তু যেখানে

পশ্চিমের দিকে পুরোপুরি দরজা খুলে গেলো—যেমন বাংলাদেশে—সেখানেও ইংরেজি ভাষা গৃহীত হ'লো একটি মূল্যবান যন্ত্র বা উপায় হিশেবে, তার বেশি নয়; মধুসূদনের ব্যর্থ প্রয়াসের পরে প্রায় সকলেই বুঝে নিলেন যে ইংরেজিতে আমরা কাব্য রচনা করতে পারি না, আত্মাকে প্রকাশ করতে পারি না, যে বিশ্বমানসে স্থান পেতে হ'লে মাতৃভাষারই চর্চা করা আমাদের কর্তব্য। এবং সেই মাতৃভাষার চর্চায় ইংরেজি কখনো আমাদের প্রতিবন্ধক হয়নি, উল্টে প্রেরণা দিয়েছে, এবং এখনো দিচ্ছে। গত দেড়শো বছরে, অন্তত বাংলাদেশে, ইংরেজি যেটুকু প্রসারলাভ করেছে, তার তুলনায় বহুগুণ বেশি বিস্তার ও মর্যাদাবৃদ্ধি ঘটেছে মাতৃভাষার। স্যর আশুতোষ যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যে এম. এ উপাধির প্রবর্তন করেন তখন ব্রিটিশ রাজ পূর্ণপ্রতাপে অধিষ্ঠিত; যখন রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের অভিভাষণ বাংলাভাষায় রচনা করেন তখনও ইংরেজের ভারত-ত্যাগ কল্পনামাত্র; এবং যখন বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে ইংরেজির বদলে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠিত হ'লো, বা সরকারি কার্যের উপযোগী বাংলা পরিভাষা রচনার জন্য প্রথম সমিতি গঠিত হ'লো, তখন পর্যন্ত ইংরেজ আমলের অবসান ঘটেনি। ইংরেজি ভাষা, ইংরেজের রাজত্বকালেই, একে-একে বহু ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু আজকের দিনের স্বাধীন ভারতের ভাগ্যাকাশে হিন্দি যে-ভাবে দেখা দিয়েছে তা কমদমত্ত ও ব্যভিচারী বললে ভুল হয় না। দাবি তার প্রকাণ্ড, উদ্ধত তার উচ্চাশা। আমাদের সংবিধানপত্রে ভারতের সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃত হয়েছে হিন্দি, সেই স্বীকৃতিও প্রামাণিক কিনা সন্দেহ করা যেতে পারে, কেননা এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো লোকসভায় নয়, অতি সংকীর্ণ মতাধিক্যের জোরে বিধান-সভায়। তৎসত্ত্বেও, শুধু সরকারি ভাষা নিয়ে কথা হ'লে এই স্বীকৃতিকে গ্রহণ করা অনেকের পক্ষে হয়তো একেবারে অসম্ভব হ'তো না। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী দশ বছর ধ'রে হিন্দি সর্বভারতে প্রচারিত হয়েছে—সরকারি ভাষা হিশেবে নয়, তাকে বলা হয়েছে রাষ্ট্রভাষা বা 'জাতীয় ভাষা'—the national language। সেই সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রধান ভাষাগুলির জন্য অন্য একটি বিশেষণ উদ্ভাবিত হয়েছে: 'regional' অর্থাৎ 'আঞ্চলিক' বা

'দৈশিক'। এই দুটো শব্দকেই আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখান করছি। যে-ভাষা কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মাতৃভাষা, তাকেই 'আঞ্চলিক' বলা যেতে পারে; আর সে-অর্থে তামিল, বাংলা, কানাড়া, মলয়ালি যতটা 'আঞ্চলিক', হিন্দিও ঠিক ততটাই তা-ই; এবং ফরাশি, জর্মান, জাপানি, রুশ প্রভৃতি ভাষা যতটা আঞ্চলিক, বাংলা, তেলুগু, মরাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষাও ঠিক তা-ই। অতএব এই বিশেষণের কোনো অর্থই হয় না; এর ব্যাপক ব্যবহার—যা সরকারি ভাষা-কমিশনের বিবৃতিতেও বিরাজমান—তার উদ্দেশ্যই হ'লো হিন্দি ভিন্ন অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মর্যাদাহানি। 'রাষ্ট্রভাষা' কথাটার দুটো অর্থ হ'তে পারে: রাষ্ট্রিক কর্মের জন্য ব্যবহৃত ভাষা বা সরকারি ভাষা, এবং 'জাতীয় ভাষা'—অর্থাৎ যে-ভাষা দেশের সমগ্র প্রজাগণের মাতৃভাষা। প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে প্রশ্ন ওঠে: কোন সরকারের কথা ভাবা হচ্ছে? পশ্চিম বাংলা, মান্দ্রাজ না নয়া দিল্লি? আসাম, উড়িষ্যা, অন্ধ্র বা পশ্চিম বাংলার সরকার হিন্দি ভাষায় তাঁদের কাজকর্ম চালাবেন, এ-রকম কল্পনা সম্ভব হয় শুধু হিটলারের মতো মতিগতি হ'লে। এ-রকম কল্পনা কোথাও দেখা দিয়েছে কিনা সেটা এই আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রকাশ পাবে; এখানে ব'লে নেয়া দরকার যে হিন্দি-প্রচারকদের অত্যুগ্র উৎসাহ—যাতে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি অবিরল ইন্ধন জুগিয়ে আসছেন—'রাষ্ট্রভাষা'র দ্বিতীয় অর্থ চালাবার জন্যই বদ্ধপরিকর; হিন্দির সঙ্গে যাঁদের স্বার্থ জড়িত বা যাঁদের স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা নেই, এমন অনেকে ধ'রে নিয়েছেন যে ভারতের 'জাতীয়' অর্থাৎ সার্বভৌম ভাষার নামই হিন্দি। এই কথাটা শুধু ভুল নয়, অসত্য; শুধু অসত্য নয়; মিথ্যা। যে-অর্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'জাতীয়' ভাষা ইংরেজি, সে-অর্থে কোনো-একটি স্বাভাবিক সার্বভৌম ভাষা ভারতের এখনো নেই, কখনোই ছিলো না। ইতিহাসের কোনো অধ্যায়েই নিখিলভারত এক ভাষায় কথা বলেনি; এই বৈচিত্র্যই তার ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য, তার ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণশক্তি; এবং এই বৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রনায়করাও প্রতিশ্রুত আছেন। যদি 'জাতীয়' কথাটার ব্যবহার করতেই হয় তাহ'লে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে সংবিধানপত্রে গৃহীত চোদ্দটি

ভাষাই আমাদের 'জাতীয় ভাষা'। এই চোদ্দটি ভাষার মধ্য থেকে হঠাৎ একটিকে ভিত্তিহীন সার্বভৌমতার সিংহাসনে বসিয়ে, অন্য বারোটি জীবিত, সমকক্ষ ও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অনেক বেশি উন্নত ভাষাকে 'আঞ্চলিক'রূপ অবাস্তব ও অপমানজনক বিশেষণের আড়ালে প্রচ্ছন্ন রাখার এই যে দুশ্চেষ্টা, এ সম্ভব হ'তে পারে শুধু সেই যুক্তির বলে, যে-যুক্তিতে ইংরেজ একদা বিনা বিচারে বহু ভারতীয়কে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবরুদ্ধ রেখেছিলেন। ইংরেজের যুক্তি ছিলো 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার'; হিন্দি প্রচারকদের যুক্তি হ'লো 'সর্বভারতীয় ঐক্য'। নিজগুণে উভয় বস্তুই বাঞ্ছনীয় ও শ্রদ্ধেয়, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু সেদিন ইংরেজ যেমন আইন ও শৃঙ্খলার নামেই সুবিচারকে হত্যা করেছিলো, তেমনি হিন্দি-প্রচারকরাও আজ উদ্যত হয়েছেন ভারতীয় ঐক্যের নামেই সর্বভারতীয় ঐক্য, সংবিধানে প্রতিশ্রুত মৌলিক অধিকার ও ভারতের সদ্যোজাত গণতন্ত্রকে একই সঙ্গে বিধ্বস্ত করতে।

৫

ভাষা-কমিশন গঠিত হয়েছিলো একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে: ভারতের সরকারি ভাষা কী হ'তে পারে সে-বিষয়ে ভারত-সরকারকে পরামর্শ দেবেন তাঁরা। কিন্তু এই কমিশন কার্যত তাঁদের অধিকার লঙ্ঘন ক'রে গিয়েছেন; সর্বভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়েও আলোচনায় তাঁরা কার্পণ্য করেননি। এবং যেহেতু শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সাধারণত সাহিত্যের পাঠক ও লেখক হ'য়ে থাকেন, আমাদের প্রসঙ্গের পক্ষে এই অংশই প্রয়োজনীয়। শিক্ষার বাহন পরভাষা হওয়া অনুচিত, এই সূত্র অবলম্বন ক'রে কমিশনের অধিকাংশ সভ্য ইংরেজির বিরুদ্ধে প্রভূত বাক্যব্যয় করেছেন; এবং শিক্ষার বাহন হিশেবে ইংরেজির অপসারণ বিষয়ে আমরা তাঁদের সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে একমত। এর পরের প্রশ্ন: শিক্ষার বাহন কী হবে—এর আংশিক মীমাংসা ইতিপূর্বেই হ'য়ে গেছে; ভারতের অধিকাংশ বিদ্যালয়েই আজ শিক্ষার বাহন সেই-সেই রাজ্যের মাতৃভাষা; ইংরেজি এখনো বাহনরূপে স্বীকৃত আছে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়িক উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থায়, তাও সর্বত্র ও সর্বতোভাবে নয়। এখানে মাতৃভাষার দাবি এতই অপ্রতিরোধ্য যে

কমিশনের সদস্যেরাও তা ঠেলতে পারেননি, অন্তত মৌখিকভাবে তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন; এবং প্রসঙ্গত ভারতীয় মাতৃভাষাসমূহের (তাঁদের মতে 'আঞ্চলিক' ভাষা) উদ্দেশে যে-সব সহৃদয় মন্তব্য করেছেন, তাঁদের মূল বক্তব্য মনে রাখলে সেগুলোকে মনে হয় কুম্ভীরের অশ্রুপাতের মতোই করুণাশীল। শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এই মর্মে স্বীকারোক্তির পর তাঁরা বলছেন যে নিখিলভারতের সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের চোদ্দ বছর বয়ঃক্রম পর্যন্ত হিন্দি ভাষা শেখানোই চাই। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে বাহন কী হবে সে-বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ তাঁরা দিচ্ছেন না; কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মাতৃভাষা, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে হিন্দি, এমনকি কোন-কোনো ক্ষেত্রে ইংরেজি থাকতে পারে, এই তাঁদের পরামর্শ। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এ-বিষয়ে তাঁদের নিজ-নিজ বুদ্ধি-অনুসারে মনস্থির করুন, এতেও তাঁদের মৌখিক আপত্তি নেই। কথাটা শুনতে মন্দ না, কিন্তু এর পরেই তাঁদের আসল অভিপ্রায় অব্যর্থভাবে বিদ্ধ করে আমাদের, যখন তাঁরা বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়িক স্বারাজ্যই শেষ কথা নয়, রাষ্ট্রভাষা-প্রয়োগের নীতিকে শেষ পর্যন্ত সবার উপরে স্থান দিতে হবেই ('...the principle of "autonomy of Universities" can, in the final analysis, have only a qualified bearing and the national language policy must ultimately prevail'.)। এ-কথার অর্থ কী, তা বুঝতে একটুও দেরি হয় না। যদি কমিশনের অনুমোদন-সমূহকে ভবিষ্যতের পূর্বস্বাদ ব'লে ধ'রে নেয়া যায়, যদি ভারত-সরকারের ভাষা-সংক্রান্ত নীতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন না ঘটে, তাহ'লে সরকারি তরফ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে হিন্দি বিষয়ে কী-রকম পরামর্শ, নির্দেশ, প্রলোভন বা তর্জনবাক্য পৌঁছতে থাকবে, তা ধারণা করতে হ'লে দৈবজ্ঞ হবার প্রয়োজন করে না। এবং যে-ভাষা হবে লোকসভার, আইনপ্রণয়নের, সুপ্রীম কোর্টের ও সর্বভারতীয় সরকারি পরীক্ষাসমূহের অনন্য বাহন, যে-ভাষায় হাইকোর্টের বিচারপতিরা রায় দিতে বাধ্য থাকবেন, যে-ভাষা প্রাদেশিক সরকারের পরীক্ষা-গুলিতে ব্যবহৃত হ'তে পারবে, এবং যে-ভাষায় নিম্নতর আদালতেও ওকালতি করার বাধা থাকবে না—সেই ভাষাকে অহিন্দিভাষী সর্বভারতের বিশ্ববিদ্যালয়-

গুলির কণ্ঠনালীতে প্রেরণ করা খুব বেশি কঠিন হবে না, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সহ্য না হোক, গিলতেই হবে; মরতে হ'লেও গিলতে হবে। যদি তার ফলে কালক্রমে ভারতের অহিন্দিভাষী বিশালতর অংশে শিক্ষা, স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটে, তাহ'লেও 'রাষ্ট্রভাষা'কে সবার উপরে স্থান দিতে হবে—'the national language policy must prevail'। ভাষা-কমিশনের অধিকাংশ সদস্যের যেগুলি বিশেষ অনুমোদন—বিদ্যালয়ে হিন্দি শিক্ষার আবশ্যিকতা যার অন্যতম—তার সার অর্থ এই যে হিন্দি-না-জানা ভারতীয় প্রজা আর ভারতীয় প্রজা বা নাগরিক ব'লেই গণ্য হ'তে পারবে না। উচ্চশিক্ষার বাহন হিশেবে মাতৃভাষা ও ইংরেজির সম্ভাবনা স্বীকার ক'রে নিয়েও সদস্যেরা বহু যুক্তিসহকারে বুঝিয়েছেন যে সর্বভারতে উচ্চশিক্ষার অনন্য বাহন যদি হিন্দি হয়, তাহ'লেই ভারতীয় ঐক্য বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি—অতএব সেই পন্থাই সবচেয়ে প্রশস্ত। প্রসঙ্গত আর-একটি কথা তাঁরা বলেছেন, যা প'ড়ে তাঁদের ভয়াবহ অভিসন্ধি বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। ভারতের সব 'আঞ্চলিক' ভাষা থেকে শব্দ-সংকলন ক'রে হিন্দিকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলা হোক, তাহ'লে হিন্দিও সর্বপ্রকার কাজের পক্ষে উপযোগী হ'য়ে উঠবে, এবং কালক্রমে ভারতের সবগুলি আত্মীয় ভাষা পরস্পরে মিশ্রিত হ'য়ে একটিমাত্র হিন্দিতে পরিণত হ'তে পারবে—যে-ভাষা হবে সত্যিকার অর্থে সার্বভৌম বা ন্যাশনাল, এবং ভারতীয় ঐক্যের স্থায়ী ভিত্তি। অর্থাৎ, এই অধিকাংশ সদস্যের ইচ্ছা, ভারতের অন্যান্য প্রধান ভাষাগুলি অশিক্ষিতের উপভাষায় পরিণত হোক, হ'য়ে যাক কালক্রমে অচলিত ও লুপ্তপ্রায়, ত্রয়োদশ-ভুজধারী হ'য়ে বিরাজ করুক একমাত্র হিন্দি। এবং তাঁদের সব অনুমোদনের পিছনে, প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে, এই উদ্দেশ্যই কাজ করছে। বলা বাহুল্য, এই দেশপ্রেমী পরিকল্পনার মধ্যে সংস্কৃতের স্থান হ'তে পারে না, কেননা শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দির এক বিরাট প্রতিযোগী হবে সংস্কৃত। বাংলা অসমিয়া উড়িয়া আর থাকবে না, থাকবে না গুজরাটি বা মরাঠি, পাঞ্জাবি আর উর্দু তো ইতিমধ্যেই হিন্দির মধ্যে গৃহীত হয়েছে, তামিল তেলুগু কানাড়া মলয়ালি আবদ্ধ হবে ঠাকুমা-দিদিমার প্রবচনে—এমনকি সংস্কৃতের

শেষ স্থান হবে জাদুঘরের শ্মশানভূমিতে। এক পক্ষের এই আত্মত্যাগ ও অন্য পক্ষের এই পরস্বাপহরণের হেতু কী? না, ভারতীয় ঐক্য রক্ষা করা চাই। ঐক্যের নামে এই রকম ভাষামেধ-যজ্ঞের ষড়যন্ত্র অন্য-কোনো জাতির ভাগ্যে ইতিপূর্বে ঘটেছে কিনা জানি না।

আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি না; সদস্যগণের সুখস্বপ্নকে বাস্তবের ভাষায় অনুবাদ করছি। যদি তাঁদের অনুমোদনগুলি কার্যে পরিণত হয়, আর তার পরে এক শতক বা অর্ধ শতক ধ'রেও ভাষাবিষয়ে একই ব্যবস্থা টিঁকে থাকে, তাহ'লে ভারতের অন্যান্য প্রধান ভাষার, এবং সেই সব ভাষাশ্রয়ী সাহিত্য ও সংস্কৃতির, ক্রমিক অবক্ষয় অনিবার্য। এক শতক বা অর্ধ শতক জাতির জীবনে অত্যল্পকাল এ-কথা এখন আর সত্য নেই; আধুনিক সংঘপ্রকরণ ও যন্ত্রবিদ্যা তথাকথিত প্রগতির বেগ অত্যন্ত দ্রুত ক'রে দিয়েছে। আমরা যেন না ভুলি যে আজকের দিনে রাষ্ট্রের শক্তি অপরিমেয়; অতীতের কোনো অধ্যায়ে, ইতিহাসের নৃশংসতম অত্যাচারী সম্রাটের যুগেও, রাষ্ট্র এমন পরাক্রান্ত ছিলো না। ছিলো না, তার কারণ এমন কোনো যন্ত্র বা ব্যবস্থা তখন আবিষ্কৃত হয়নি, যার দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, দিনের পর দিন, কর্মের ও বিশ্রামের প্রতিটি মুহূর্তে সমগ্র প্রজাবৃন্দের মনের উপর রাষ্ট্র তার অভিপ্রেত প্রভাব বিস্তার করতে পারে। উপরন্তু, গণতান্ত্রিক দেশ হ'য়েও, ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রে একনায়কত্বের কোনো-কোনো লক্ষণ অঙ্গীকৃত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্রসমূহের তুলনায়, এখানে স্বাধীন উদ্যমের ক্ষেত্র অনেক সংকীর্ণ। আমাদের বাণিজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, পঞ্চবার্ষিকী সংকল্পের অনুগামী। আমাদের শিক্ষাতন্ত্র সম্পূর্ণ আত্মবশ নয়, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধনীর বদান্যতায় পুষ্ট হ'তে পারে না, তাদের জীবিকার প্রধান বা অনন্য নির্ভর রাজকোষ। আমাদের রেডিওতে ইংলণ্ডের মতো স্বাবলম্বিতা বা মার্কিনদেশের মতো স্বাধীনতা নেই; তা একান্তভাবে রাষ্ট্র-কর্তৃক অধিকৃত। আমাদের সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা আইনত বহুদূর পর্যন্ত আছে তা সত্য, কিন্তু সে-স্বাধীনতা তাঁরা যে সব সময় ব্যবহার করতে চান বা করতে পারেন এমন প্রমাণ আমরা এখনো পাইনি; কোনো নেপথ্যসংকেতে তাঁদের কোনো মূলনীতি বা কর্মসূচির রাতারাতি বদল হ'তে আমরা দেখিনি তা নয়।

আর যেখানে প্রত্যক্ষভাবে কর্তৃত্ব চলে না, সেখানেও পরোক্ষভাবে প্রভাব-বিস্তারে আমাদের রাষ্ট্র ক্রমশই অধিকতর সচেষ্ট হচ্ছেন। সাহিত্য, নাট্য ও ললিতকলার আকাদমি এর উদাহরণ, গ্রন্থ ও চিত্রের জন্য পুরস্কারঘোষণা এর উদাহরণ, রেডিও-কর্তৃক অনুষ্ঠিত 'সাহিত্য-সমারোহ' এর উদাহরণ, আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয়িক যুব-উৎসবও এর উদাহরণ। সাহিত্য ও শিল্পকলার পরিপোষণের জন্য আমাদের রাষ্ট্র যে অকস্মাৎ ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রজার অর্থ ব্যয় ক'রে বড়ো-বড়ো কার্যালয় স্থাপন করেছেন, এই ব্যাপারটাকে, একজন সাহিত্যিক হিশেবে, আমি সুলক্ষণ ব'লে মনে করতে পারি না: আমার মতে আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষে শিল্পীদের বিষয়ে উদারতম আচরণ হ'লো উপেক্ষা—একটি পরিচ্ছন্ন ও নিরভিমান উপেক্ষা। সেকালে রাজাদের পোষকতায় সৎসাহিত্যের সৃষ্টি হ'তে পেরেছিলো, এই নজির এখানে একেবারেই অচল; কেননা সেকালে রাজা ছিলেন একজনমাত্র ব্যক্তি; তাঁর শক্তি ছিলো, আধুনিক মানে, অতিশয় সংকীর্ণ, এবং কখনো-কখনো তিনি সজ্জনও হ'তেন। তার উপর, বিক্রমাদিত্য থেকে ফ্রেডেরিক দি গ্রেট পর্যন্ত, কবিদের পোষণ ক'রে তাঁরা ব্যক্তিগত অহমিকারই তৃপ্তিসাধন করেছেন, অন্তরালে কোনো রাষ্ট্রিক উদ্দেশ্য তাঁদের ছিলো না। ফলত, কবিরা তাঁদের মৌখিক চাটুকারিতা করলেও—ভলতেয়ার ফ্রেডেরিককে তাও করেননি—স্বকর্মে স্বাতন্ত্র্যরক্ষা ক'রে চলতে পারতেন। কিন্তু একালের নৈর্ব্যক্তিক, যান্ত্রিক, অতিকায় ও সার্বিক-শক্তিশালী রাষ্ট্র যখন শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষণের ভার নেয়, তার অর্থ দাঁড়ায় সেই স্বাধীনতার সংকোচন বা বিলুপ্তি, যে-স্বাধীনতা, শুধু শিল্পীর নয়, দেশ, রাষ্ট্র, সমাজ ও সভ্যতার সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। শিল্পীর জীবিকার জন্য সুখদায়ক ব্যবস্থা ক'রে রাষ্ট্র তার জন্য যে-মূল্য আদায় ক'রে নেয় সেই মূল্যই পরম ও একমাত্র; তা ধ্বংস হ'লে শিল্পীর পক্ষে আরাম, সম্মান বা নিরাপত্তার কোনো অর্থ আর থাকে না, সমাজ হ'য়ে ওঠে কারাগারের মতোই সুশৃঙ্খল, নিয়মাধীন ও দুঃসহ। স্বাধীনতাই এই মূল্য, চিন্তার স্বাধীনতা, 'মানবো না' বলার স্বাধীনতা, দল ছেড়ে একলা হবার স্বাধীনতা। এরই ফলে যুগে-যুগে সমাজের নাড়ি নতুন ছন্দে সাড়া দেয়, সভ্যতার স্রোত ব'য়ে চলতে

পারে। এই মূল্য যেখানে দলিত, যেখানে শিল্পীকে খাইয়ে-পরিয়ে মোটা ক'রে তুলে তার স্বাধীনতা হরণ করা হয়, সেখানে শিল্পের নামে কী-ধরনের প্রভুরঞ্জন জড়বস্তু নির্গত হ'তে থাকে, তার উদাহরণ আজ বহুদিন ধ'রে সোহ্বিয়েট দেশ পৃথিবীর সামনে উপস্থিত রাখছে।

সমাজের মধ্যে যে-অংশ স্বভাবত সজাগ ও স্বনিষ্ঠ, সেই শিল্পীদেরও ক্রীড়নকে পরিণত করার শক্তি যখন আধুনিক রাষ্ট্র ধারণ করে, তখন তার পক্ষে এক দেশের বারোটি বা তেরোটি ভাষার বিলোপ ঘটিয়ে মাত্র একটিকে স্ফীত ক'রে তোলাও সম্ভবপরতার পরপারে নয়। এই কথাটি খুব স্পষ্ট ক'রে বুঝে নিতে হবে আমাদের: আজ ভাষা-কমিশন কাগজে-কলমে যে-সুখস্বপ্ন দেখছেন, আগামী পঞ্চাশ বছর, এমনকি পঁচিশ বছরের মধ্যেও তাকে বাস্তবে পরিণত করার ক্ষমতা আছে রাষ্ট্রের, সত্যি-সত্যিই 'রাষ্ট্রভাষা'র প্রচণ্ড দাবিতে অন্য প্রত্যেকটি ভাষার অস্তিত্ব সুদ্ধ বিপন্ন হ'তে পারে, যদি না এখনই, এই মুহূর্তে আমাদের ভস্মাচ্ছাদিত শুভবুদ্ধি জ্বালাতে পারে একটি প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ, দাঁড় করাতে পারে একটি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রতিরোধ। 'কেন্দ্রিক ভাষা হিন্দি হয় তো হোক না, রাজ্যের মধ্যে মাতৃভাষা তো রইলোই', 'সরকারি কাজে ক-জন লোক আর যোগ দেবে, আর সেই ক-জনকে হিন্দি শিখতে হ'লে ক্ষতি কী', 'আমরা বাঙালিরা হিন্দির চাপে বাংলার চর্চা ভুলে যাবো? পাগল!'—এই ধরনের চিন্তা বা চিন্তাহীনতার মূলে কত বড়ো আত্মপ্রতারণা বিরাজ করছে, একটুখানি বিশ্লেষণেই তা ধরা পড়ে। যদি—কমিশনের দুটি মাত্র অনুমোদন বেছে নেয়া যাক—যদি ভারতের সরকারি সিংহাসনে হিন্দিকে অনন্যভাবে বসানো হয়, আর প্রত্যেক ভারতীয় প্রজাকে বাধ্য করা হয় শৈশব থেকে বা শৈশবকালে হিন্দি শিখতে, তাহ'লে অন্যান্য ভাষা প্রথমে যদি বা চামরধারিণী বা করঙ্ক-বাহিকার মর্যাদা পায়, শেষ পর্যন্ত তাদের স'রে যেতে হবে নেপথ্যে, ভারতীয় পটভূমি ছেড়ে অপরিচয়ের ধূসরতায়। ভারতবাসী তাদের ভাষা বলতে হিন্দিকেই বুঝবে, সারা জগৎ ভারতীয় ভাষা বলতে শুধু হিন্দিকেই বুঝবে। আর তা ঘটতে খুব বেশি দেরিও হবে না, কেননা ইতিমধ্যেই—স্বাধীনতার পর মাত্র এই দশ বছরের প্রচারের ফলে—সোহ্বিয়েট রাশিয়া হিন্দিকেই মেনে

নিয়েছে ভারত-ভাষার নামান্তর ব'লে, চীনও তা-ই, পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে হিন্দির চর্চা বর্ধমান, এবং আমরা নিজেরা—এমনকি বাঙালিরাও—মাতৃভাষাকে 'আঞ্চলিক' ও হিন্দিকে 'জাতীয়' ভাষারূপে অক্লেশে উল্লেখ ক'রে থাকি। হিন্দি ভারতের একমাত্র সরকারি ভাষা—শুধু এই সূত্রটি, গৃহীত হ'লে অন্য সব স্বতই ঘটতে থাকবে; আইনত আবশ্যিক না-হ'লেও ছাত্রগণ নিজের গরজেই হিন্দি শিখবেন—যাঁরা রাজনৈতিক বা রাজপুরুষ, বাণিজ্য বা জ্ঞানজীবী হবার উচ্চাশা রাখেন শুধু তাঁরাই নন, কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে থাকার উপরে অল্প একটু আকাঙ্ক্ষা করলেও হিন্দি ভিন্ন এগোনো যাবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সরকারি কাজে যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগ দেবেন, এমন লোকের সংখ্যা অচিরেই নগণ্য ছেড়ে অগণ্যে পৌঁছবে; পঞ্চবার্ষিকী সংকল্পের পারম্পর্যের ফলে রাষ্ট্রের সূক্ষ্ম কুটিল শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়বে লৌকিক জীবনের স্তরে-স্তরে, জীবিকার এমন ক্ষেত্র কমই থাকবে যাতে সরকারি প্রভাব কোনো-না-কোনো ভাবে প্রবিষ্ট হবে না। আর এ-কথাও ভুলে থাকা অসম্ভব—কেননা এখনই তার বহু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে—যে একবার 'রাষ্ট্রভাষা' বা 'জাতীয় ভাষা'রূপে প্রতিষ্ঠা পেলে হিন্দি হ'য়ে উঠবে কৌলীন্যের ধ্বজা, ফ্যাশানের আশ্রয়, স্নবারির একটি প্রধান সরঞ্জাম; শুধু চাকরিতে উন্নতির জন্য নয়, জাতে উঠতে হ'লেও প্রয়োজন হবে তার; এমন সুধীজন যাঁরা অবশিষ্ট থাকবেন যাঁদের দায়ে প'ড়ে শিখতে হবে না, তাঁরাও অনেকে গায়ে প'ড়ে হিন্দি শিখবেন। এবং যাঁরা রাষ্ট্রপোষিত কৌলীন্যের বাইরে নিজ-নিজ বিনীত কর্ম নিয়ে জীবন কাটাবেন, সেই বিরাট জনসাধারণের মনেও হিন্দির একটি বিশেষ স্থান অবধারিত হবে: জাতীয় পতাকা বা জাতীয় সংগীতের মতো 'জাতীয় ভাষা'ও হ'য়ে উঠবে একটি প্রতীক, চিন্তাহীন ভক্তি ও আত্মনিবেদনের অধিকারী; গ্রামের চাষি, ঘরের বৌ, মফস্বলের ছোটো দোকানদার—এমন কেউ থাকবেন না যিনি এক বর্ণ হিন্দি না-জেনেও, বা হিন্দির দ্বারা কোনো সুবিধা না-পেয়েও, ঐ ভাষাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা না করবেন। সব ভাষাকেই শ্রদ্ধা করা ভালো; কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তার সঙ্গে থাকবে নিজ-নিজ মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা, এবং সেই অবস্থাটা মারাত্মক। এই যে মনস্তত্ত্বগত প্রভাব, এর শক্তি হিশেব ক'রে

বোঝা যায় না; আইনের দ্বারা হিন্দির অধিকার যতই বেঁধে দেয়া হোক, সংবিধানে অন্যান্য ভাষাকে যে-কোনো ভাবেই স্বীকার করা হোক না—'হিন্দি ভারতের জাতীয় বা রাষ্ট্রভাষা', শুধু এই সূত্রটি সর্বসাধারণের মনে জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করবে। এরও প্রমাণ ইতিমধ্যেই আমরা পাচ্ছি না, তা নয়; পশ্চিম বাংলার বহু বেসরকারি বিদ্যালয়ে হিন্দি এখনই আবশ্যিকভাবে পড়ানো হচ্ছে, যদিও সে-বিষয়ে সরকারের কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। স্কুল-কর্তৃপক্ষের যুক্তি বোধহয় এই: 'কিছুদিন পরে তো শিখতেই হবে, এখনই আরম্ভ করা ভালো।' আজ যেটা প্রস্তাব, সেটা যদি দু-দিন পরে তথ্য হ'য়ে ওঠে তাহ'লে এই যুক্তি আরো কত বিরাট আকারে সর্বভারতে ব্যাপ্ত হবে, সে-কথাও কি বুঝিয়ে বলা দরকার? সর্বসাধারণ কোনো কথাই তলিয়ে ভেবে দ্যাখে না—সেটা আশা করাও সম্ভব নয়—'জাতীয় ভাষা'র প্রতীকী মূল্যের জন্যই তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে তারা। তাছাড়া উন্নতি জিনিশটা সকলেরই কাম্য, ব্যক্তিগত ও বংশগতভাবে এক ধাপ উপরে উঠতে না চায় এমন লোক সর্বত্রই বিরল; এবং হিন্দি না-জানলে উন্নতি যদি অসম্ভব হয় তাহ'লে, কাগজে-কলমে তার 'চাপ' যতই মৃদু হোক না, অহিন্দিভাষী ভারতীয় প্রজা মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করতে ইচ্ছুক অথবা বাধ্য হবে।

এখানে ইংরেজির কথা আর-একবার বিবেচ্য: কেন, যদি ইংরেজ আমলে ইংরেজির প্রভাবে মাতৃভাষাকে আমরা উপেক্ষা না-ক'রে থাকি, হিন্দির জন্যেই বা মাতৃভাষাকে ভুলতে হবে? এর উত্তরে বহু কথা বলা যেতে পারে, আমি শুধু একটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। আজকের দিনে হিন্দি যেমন সর্বভারতে সর্বসাধারণের সমগ্র জীবনকে অধিকার করতে চাচ্ছে, এই রকম বিরাট দাবি ইংরেজি ভাষার কখনোই ছিলো না, তা সম্ভবও ছিলো না তার পক্ষে। ইংরেজ রাজত্ব ছিলো বৈদেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী; দেশের জনসাধারণের সঙ্গে ক্ষীণ ছিলো তার সংযোগ; কলকাতা-দিল্লির ঘটনাবলি বিষয়ে সম্পূর্ণ অচেতন থেকে কোটি-কোটি গ্রামীন মানুষ বংশপরম্পরায় তাদের অভ্যস্ত জীবন যাপন ক'রে গেছে। কিন্তু আজকের দিনে রাষ্ট্রের প্রভাব সর্বত্র পরিকীর্ণ, এবং সেই প্রভাব থেকে সর্বসাধারণের হৃদয়াবেগও মুক্ত নয়, কেননা তার পিছনে আছে স্বাধীনতা-

লাভের গৌরব, স্বাজাত্যবোধের অভিমান। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রের প্রভাব যত ব্যাপক, 'রাষ্ট্রভাষা'র প্রভাবও ঠিক তা-ই হবে। ইংরেজির যা ছিলো না—আর এখনও নেই—হিন্দির আছে সেই স্বদেশীয়তার স্বাক্ষর; সেটা তার মস্ত সুবিধে, আর সেই জন্যই সে এত বেশি বিপজ্জনক। হিন্দিকে আত্মনিবেদনের চরম অর্থ যে মাতৃভাষার প্রতি প্রতারণা—এই কথাটা অধিকাংশের মনে ধরা দেবে না, এবং অধিকাংশকে বোঝানো কঠিন হবে। প্রশংসনীয় দেশপ্রেমের প্ররোচনায় হিন্দিকে গ্রহণ করবো আমরা, নিজে না-জেনে ও না-বুঝে ক্রমশ মাতৃভাষাকে ভুলতে থাকবো। ভুলতে থাকবো, তার কারণ এই মনোভাব তৈরি হ'তে দেরি হবে না (এখনই কিছুটা তৈরি হয়েছে) যে হিন্দি যেহেতু ভারতীয় ভাষা, এবং আমরা সকলেই ভারতীয়, তাই হিন্দিকে আমাদেরই স্বভাষা বললে ভুল হয় না। অন্য দিক থেকেও মাতৃভাষার বিনাশের আশঙ্কা ভয়াবহরূপে বাস্তব—বিশেষত উত্তরভারতের পক্ষে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে বাংলা আর হিন্দি খুব কাছাকাছি ভাষা ব'লেই, বাঙালি শিশুকে হিন্দি শেখানো হ'লে সে বাংলা নামে যে-ভাষাটি শিখবে সেটি আর ঠিক বাংলা থাকবে না। এই দুই ভাষায় বহু সামান্য শব্দ আছে, কিন্তু তাদের বানানে ও উচ্চারণে মিল নেই: একই সঙ্গে 'দশ' আর 'দস', 'কাহিনী' আর 'কহানী' শেখানো হ'তে থাকলে শিশুর শুদ্ধাশুদ্ধ-জ্ঞান বিপর্যস্ত হবে। ফলত সে খুব সম্ভব বাংলা বা হিন্দি কোনোটাই ঠিকমতো শিখবে না, দুয়ের মিশ্রণে তৈরি ক'রে নেবে এক হিন্দি-ঘেঁষা বাংলা অথবা বাংলা-ঘেঁষা হিন্দি। এবং এই দুর্বিপাকের সম্মুখীন হবে উত্তর ভারতের প্রত্যেকটি ভাষা, দক্ষিণী ভাষাগুলিও এই সংকট পুরোপুরি এড়াতে পারবে না। আর যেহেতু ভাষা-কমিশনের পরামর্শ অনুসারে সর্বভারতের সকল প্রজাকে হিন্দি শিখতে হবেই, কিন্তু হিন্দিভাষীকে অন্য কোনো ভাষা না-শিখলেও চলবে, তাই এই চোদ্দমিশেলি নবব্যঞ্জনের প্রধান উপাদান হবে হিন্দি, অন্যান্য ভাষা হিন্দির গড়ন এড়াতে পারবে না, কিংবা অন্য সব ভাষা ক্রমশ ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে পুষ্ট ক'রে তুলবে একটিমাত্র ভারতীয় ভাষাকে, যা ঠিক এখনকার হিন্দিও হয়তো আর থাকবে না, কিন্তু যাকে হিন্দি ব'লেই

নির্ভুলভাবে চেনা যাবে—বাংলা অথবা মরাঠি অথবা তেলুগু ব'লে কখনোই ভুল হবে না। অর্থাৎ, ভাষা-কমিশনের উন্মত্ত উচ্চাশা পূর্ণ হবে তখন, হিন্দির মধ্যে অন্য সব ভারতীয় ভাষার বিলুপ্তি ঘটবে।

স্বাভাবিক 'জাতীয়' ভাষা তাকেই বলে, যে-ভাষা একটি দেশের সমগ্র বা বহুলভাবে অধিকাংশ প্রজাবৃন্দের মাতৃভাষা। এই অর্থে ভারতবাসীর কোনো সামান্য বা 'জাতীয়' ভাষা অতীতের কোনো অধ্যায়েই ছিলো না। তা নিয়ে কোনো আক্ষেপও ছিলো না কারো মনে, কেননা কোনো পূর্বযুগে নেশন অর্থে জাতি ছিলুম না আমরা। 'নেশন' শব্দের কোনো প্রতিশব্দও নেই ভারতীয় ভাষায়, ন্যাশনাল অর্থে 'জাতীয়' কথাটা এখন পর্যন্ত কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক শোনায়। অন্য অনেক কিছুর মতো, নেশনত্বের ধারণাও আমরা পশ্চিম থেকে আহরণ করেছিলাম, এবং আজকের দিনে, স্বাধীনতার পরে, বৈশ্বিক ন্যাশনালিজম-এর অবেলায়, আমরা কিছুটা করুণভাবে বদ্ধপরিকর হয়েছি পুরোপুরি ও পাকাপাকি একটি নেশন হ'য়ে উঠতে। যেহেতু ভারতবাসীরা এক জাতি বা নেশন, সেহেতু ভারতে একটি 'ন্যাশনাল' ভাষাও চাই, এই যুক্তির যান্ত্রিক উপযোগে অনেকেই সম্মোহিত হ'য়ে আছেন। তাঁরা, পুরোপুরি হিন্দিকে সমর্থন না-ক'রেও, প্রায়ই ব'লে থাকেন, 'অতীতে ছিলো না ব'লে ভবিষ্যতেও কি একটি সামান্য ভাষা হ'তে পারবে না আমাদের? তা হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়?'—কিন্তু কোনো কিছুকে বাঞ্ছনীয় ব'লে স্বীকার করলে তার জন্য সচেষ্ট হওয়া নিশ্চয়ই আমাদের কর্তব্য, এবং সামান্য বা 'জাতীয়' ভাষাকে বাঞ্ছনীয় বলার অর্থই হ'লো হিন্দির একাধিপত্যে সানন্দ সম্মতিদান। আসল প্রশ্নটা এই: কোনটা বেশি বাঞ্ছনীয়—একটি 'জাতীয়' ভাষাকে নির্মাণ ক'রে নেয়া, না কি আমাদের নিজ-নিজ মাতৃভাষার স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ? কোনটা আমাদের মনুষ্যত্বের পক্ষে বেশি জরুরি—নিজ-নিজ মাতৃভাষার সমৃদ্ধি, না কি এমন একটি ভাষা যা এই মহাদেশতুল্য ভারতভূমিতে সকলেরই ব্যবহার্য হবে? সংলগ্ন আর-একটি প্রশ্নও উত্থাপন করতে হয়; ভারতীয় চিত্তের পুষ্টি ও প্রকাশের পক্ষে কোনটা বেশি অনুকূল: বৈচিত্র্য না একীকরণ, স্বরসংগতি না ঐকতান? এবং এ-দুয়ের

মধ্যে যেটি কাম্যতর, অন্যটি যদি স্পষ্টত তার বিরোধী হয়, তাহ'লে আমাদের কর্তব্য কী?

খুব সম্ভব আগামী পঁচিশ বা পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই একটি 'জাতীয়' ভাষার অধিকারী হ'তে পারি আমরা, যদি ভাষা-কমিশনের মূল প্রস্তাবগুলিতে সম্মত হই। সেই প্রস্তাবগুলি—শুধু মেনে নিলে নয়, প্রয়োগের জন্য একযোগে সচেষ্ট হ'লে, তবেই তা সম্ভব হ'তে পারে, নচেৎ কোনোমতেই নয়। যদি 'জাতীয়' ভাষাই কাম্যতর মনে হয়, তাহ'লে মাতৃভাষার প্রতি ওষ্ঠপ্রীতি পরিহার ক'রে হিন্দিকেই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে হবে আমাদের। মাতৃভাষার বিকাশ ও 'জাতীয়' ভাষার উত্থান—এ দুই ভারতভূমিতে যুগপৎ সম্ভবপর, কেউ যেন এমন মোহকে ভ্রমক্রমেও প্রশ্রয় না দেন। ভারতবর্ষে একটি 'জাতীয়' ভাষা বা সামান্য ভাষা তৈরি হ'য়ে উঠতে পারে শুধু এই শর্তে যে অন্য প্রত্যেকটি ভাষার গতিপথ রুদ্ধ ক'রে দেয়া হবে, এবং সেই অবরোধে সহায়তা করবেন তাঁরাই, যাঁদের বলা যেতে পারে সেই-সেই ভাষারই সন্তান। সে-দুর্দিন যদি কখনো আসে, যদি জাতীয়তাবাদের ফুটন্ত কটাহে ভারতবাসীরা তাঁদের প্রাণরস পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হন, তাহ'লে দুটির মধ্যে একটি সম্ভাবনাকে নিশ্চিত ব'লে ধ'রে নেয়া যায়। এক হ'তে পারে—বাঙালি, মরাঠি, তামিল প্রভৃতি অভিজ্ঞান ভুলে গিয়ে আমরা সকলেই 'ভারতীয়' নামক এক অর্ধ-কাল্পনিক ধারণার মধ্যে নিবিষ্ট হবো; আমরা যে মূলত মানুষ, সেই মহাসত্যকে অস্বীকার ক'রে হ'য়ে উঠবো শুধুমাত্র প্রজা, একটি প্রয়োজনীয় জীব—কিংবা জীব পর্যন্ত নয়, বৃহদাকার রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি আণুবীক্ষণিক অংশ মাত্র। কিংবা, যেহেতু তামিল, মরাঠি, বাঙালি প্রভৃতি অভিজ্ঞান এক-একটি সপ্রাণ পদার্থে, যার পিছনে আছে বহুযুগের বিশেষ-বিশেষ সাধনার ধারা, সেইজন্য এমন সম্ভাবনাও প্রবল যে কিছুদিন পরে, আপন-আপন ভাষা ও সংস্কৃতির অবমাননা ও অবক্ষয় লক্ষ্য ক'রে, অহিন্দিভাষী সমগ্র ভারতে বিচ্ছেদপ্রবণ বিদ্রোহ জেগে উঠবে। দুয়ের মধ্যে প্রথমটি মনুষ্যত্বের প্রতিকূল, দ্বিতীয়টি আমাদের রাষ্ট্রিক ঐক্যের পক্ষে মারাত্মক। প্রথমটির অর্থ ভারতবর্ষের আবহমান ইতিহাসের প্রত্যাখ্যান, দ্বিতীয়টির অর্থ ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন ক'রে তোলা। যে-বৈচিত্র্য-

বিন্যাসে ভারতবর্ষীয় প্রতিভার মৌলিক বৈশিষ্ট্য তারই মূলোচ্ছেদ হবে প্রথমটিতে, আর দ্বিতীয়টি ঘটলে আমাদের স্বাধীনতাই রক্ষা পাবে কিনা সন্দেহ। এ-দুয়ের মধ্যে কোনোটাকেই কাম্য বলা যায় না। অতএব এই সমস্যার সমাধানে আপোশ অথবা বিলম্বের অনুমোদন করলে কিছুই লাভ হবে না; সবচেয়ে ভালো এখনই এমন কোনো ব্যবস্থা করা, যাতে আমরা নিজেদের বাঙালি ব'লে অনুভব করতে পারি, ভারতীয় ব'লে জানতে পারি, আর সর্বোপরি ভুলে না যাই যে আমরা মানুষ এবং ব্যক্তি, রাষ্ট্রের কলে তৈরি মানুষ নয়।

তিনটি কবিতা

বিচিত্র

মৃণালকান্তি

কে ঘোরে মনের পথে,
—দিব্যকান্তি ঈশ্বরের দূত।
বিকেলের ধূসর আলোয়
দেখি এক কালি-মাখা ভূত।

অদৃশ্য শত্রু

নিঃসঙ্গ কালের হাতে ক্লান্তিহীন ঘোরে
পাণ্ডুবর্ণ একখানি মুহূর্তের মালা।
দিনের উজ্জ্বল ছবি ঢাকে ধূলি-ঝড়ে;
ছেঁড়ে ফুল, সংসারের ভাঙে ডালপালা।
রৌদ্রের নির্যাস করে কী নেশায় পান
শেষ ঘুমে চোখ মুদে স্বপ্নের মৌমাছি।
মৌ ঝরে চাক ভেঙে, শুদ্ধ হয় গান।
কার ছায়া সারাক্ষণ ফেরে কাছাকাছি—
বোনে সে জরার বীজ, তার কালো হাত
নিঃশব্দ ক্ষয়ের মূর্তি আঁকে দিন-রাত।

উৎসর্গ

মেঘছায়া তুমি অথবা বহ্নিদহন
তোমাতে করেছি আত্ম-সমর্পণ।
নিশীথ নীরব ব্যথা-পুঞ্জিত ক্ষণে
প্রহর কাটাই একা তারা গুনে-গুনে।

গোধূলিবেলার বিষাদবাহিত ঝড়ে,
মৌন মানস ভেবে স্মৃতি-নির্ঝরে।
একটি ধ্যানের নীরবে কে নেয় শরণ,
কার নাম জপে অক্ষমালায় মন।
উদাসীন তুমি, প্রাণের ভস্মে কত
ঢেকে রাখি এই রক্ত-ঝরানো ক্ষত।
বিফল পূজায় কাকে চাই বারে-বারে,
জ্বলি নিশিদিন বেদনার অঙ্গারে।
এবং অমর আশায় আলোয় জ্বলি,
নিঃশেষে দেই এ-হৃদয় অঞ্জলি।

প্রাচীন গ্রন্থের মতো

আবুল ফজল শাহাবুদ্দীন

জীর্ণপত্র, কীটদষ্ট, প্রাচীন গ্রন্থের মতো
এই এক অবস্থা আমার। শরীরে আদিম গন্ধ, উদ্‌ভ্রান্ত
প'ড়ে থাকি এক কোণে; গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত
গত হয় প্রথামতো—অতঃপর কখনো-বা দূরে
নির্জন শস্যের পীত
নদী দুরন্ত কল্লোলে কাঁপে,
চঞ্চল। (জানি না কিছুই), আর নিরবধি
প্রাচীন গ্রন্থের মতো আমি এক অন্ধকার নদী।

এখানে বিদ্যুৎ নেই, বর্ষণে নামে না সুর :
এবং নিশান্তে শস্যহীন অতি দূর
প্রান্তরে যেমন জ্বলে এলোমেলো জোনাকির মেলা
তেমনি এখানে আমি নিষ্ঠুর দুঃস্বপ্নে ভরা
নিঃসঙ্গ, একেলা।
কোনোদিন যদি
ম্লান হ'য়ে আসে এই যন্ত্রনার নদী
পুরোনো সুগন্ধি ভরা; তাহ'লে কী হবে বলো? চারদিকে ইতস্তত
অন্ধকার তখনো কি গাঢ় হবে
এইসব কীটদষ্ট প্রাচীন গ্রন্থের মতো?

স্মৃতি

—J'ai plus de souvenirs.. que mille ans

মুকুল ঘোষাল

১

যে-সময়গুলি কুড়িয়ে নিয়েছি সোনালি আঁচলে রোদে
আমরা দুজনে ডালিমছায়ায় খেয়ালের মেঠো ফুলে
—যেদিন সকালে তোমার চুলের উড়ন্ত অবরোধে
হঠাৎ দেখি যে আমার আকাশ জড়িয়ে ফেলেছি ভুলে,

তাদের স্পর্শ মুঠোমুঠো আজো চেয়ারে টেবিলে খাটে
আধো আলোছায়ে চুপিসারে চলা স্মৃতির সিঁড়ির ধাপে ;
ভাঙা চুড়ি, চুমো, চুলের কাঁটায়, শহরে সবুজ মাঠে
শালিকের বুকে স্বপ্নের মতো আজো দুরুদুরু কাঁপে।

২

আঁকাবাঁকা পথে পাহাড়ে ওঠার শ্রান্তিতে লাল গালে
যে-ক'গাছি চুল উড়ে এসেছিলো, তাদের সরাতে গিয়ে
স্বর্গের নদী হঠাৎ উতলা—এলোমেলো তারি তালে
আমার সাগরে রক্তিম ঢেউ উঠেছিলো ছলকিয়ে—

তখন সহসা বাঁক নিয়ে পথে দিগন্তে দেখি ধু-ধু
পাহাড়ের তটে জাফ্রানি বন বন্য হাসির ঝোঁকে
প্রথম জাদুর প্রচুর গন্ধে ঢেলেছে পাগল মধু
প্রগল্‌ভতার ফোয়ারায় ভিজে চেনারের দুটি চোখে!

৩

৩

হয়তো-বা ভুল, কিছু বা মন্দ, কিছু শুধু পাগলামি
পৃষ্ঠ চাপানো গাধার মতন ভণ্ড যুগের ভার,
সুতরাং শেষে মাথা হেঁট ক'রে নিয়মের অনুগামী
ফিরে আসি ঘরে—রক্তে শুধুই টনটনে হাহাকার।

চুলোয় যাকগে—ছেঁড়া এ-কাঁথায় মিথ্যা সে-সব স্মৃতি
—উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ
আমার ডোবায় শুধু কাদাজল, শ্যাওলা, ব্যাঙের ছাতি,
সুখে টেনে রাখি মিনমিনে হাসি, দুঃখ সেও তো তুচ্ছ।

৪

বহুদিন পরে চোখে প'ড়ে গেলো সহসা তোমার ছবি—
বরফের ঝড়ে সূর্যের স্মৃতি স্বপ্নের তলে ফোটে,
(কিন্তু হয়তো তুমিও হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছো সবি)
অসহায় বুক সময়ের পায়ে মরে শুধু মাথা কুটে—

চুপিচুপি তবু ব'লে রাখি আজ রাত্রির কানে-কানে :
(তোমারি মতন ওড়া চুল তারও ঠোঁটে মোর যায় ছুঁয়ে)
—যদিও সেদিন ছোটো। সে-হাসির কিছুই বুঝিনি মানে,
এত জলেতেও তবু তার দাগ আজো তো যায়নি ধুয়ে।

ছায়াসীতা

রণেন্দ্রনাথ দেব

অবচেতনের নিষিদ্ধ দেশ হতে
চোরের মতন এ কার গুপ্ত পাণি
মধ্যরাত্রে আমাকে আচম্বিতে
কোন বিস্মৃত বনে নিয়ে চলে টানি ?

কবে ফুটেছিল সে-বনে কৃষ্ণচূড়া
রক্তাশোকের মত্ত আমন্ত্রণ ;
পূর্ণচাঁদের উদ্দাম আলো-ঝড়ে
শোণিত-কণায় অসহ্য আলোড়ন ;

হয়তো সে-কথা এখনো স্মরণে তার—
কিন্তু সে-জন দুয়ার বন্ধ ক'রে
সন্ধ্যার দীপ সভয়ে নিবিয়ে দিয়ে
দেশবিভাগের যুক্তিতে গেছে স'রে।

রাধাপদ্মের লতাটিও পাতা-ঝরা
আর কোনোদিন ফুটবে না করবী তো,
অতীতের ঘ্রাণ সে-ডালে খুঁজতে গেলে
প্রেতচ্ছায়ায় শুধু হবো শিহরিত।

স্মৃতির পাত্রে বিষাক্ত রস জমে,
তবু কেন টানো, হে দূর ধলেশ্বরী ?
যদিও বা পালে লাগে বিপরীত হাওয়া
কালের উজানে যেতে পারে কোন্ তরী ?

তৃষ্ণা

পরমেশ ধর

আছেন অনেক উর্ধ্বে আকাশের প্রায় কাছাকাছি
তারা তিন জন :
স্বামী, স্ত্রী, ও ছোট্ট ছেলে।
শ্বাসরোধী পথের গর্জন
সেখানে নির্জীব শান্তি করে না ব্যাহত।
উঁচু থেকে লিফটে নামেন দ্রুত
পরিচিত পথের কিনারে।
উর্ধ্বমুখী কংক্রীটের শীর্ষে এক খাঁচার ভিতরে
ভিড়, বন্যাত্রাণ, চাঁদা ভিখিরি ও মাছি ;
ইত্যাদি পেছনে ফেলে বাঁচেন নিশ্চিন্ত সুখে
আকাশের প্রায় কাছাকাছি।
সূর্যের স্বাধীন আলো, নির্জন রাত্রির
দক্ষিণের বায়ু
হয়তো বাড়ায় পরমায়ু।

—তবু থাকে কালো কাদা, নীচে ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে মাটি,
যে তৃষ্ণা সর্বদা বুকে সে ফোটায়
প্যারাপেটে টবের দোপাটি,
বারান্দায় গুটিকয় বৃষ্টিস্নাত শুভ্র বেলফুল।

—মাটি ছেড়ে শ খানেক ফিটের উর্ধ্বেও প্রাণ
সেই মৌন তৃষ্ণায় আকুল।

নায়িকা

রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী

ঝর্না কি বিচিত্র পাখি কিংবা তরুলতা
কিছুই তুলনা নয় ; আকাঙ্ক্ষিত তার শুভ্র বুক
ঠাণ্ডা ঘরে সুরক্ষিত সুশীতল মৃত ফল যেন,
নতজানু স্তাবকেরা তবু কেন তাকে ঘিরে বলে এত কথা ?

হবে না কখনো জানি যুদ্ধ কিংবা দিগ্বিজয়ে যেতে,
অগ্নিস্রাবী ড্রাগনের পরাভব তার শর্ত নয়,
অতল সমুদ্র থেকে মুক্তো তুলে দরকার নেই সাজাবার,
প্রেম, মৃত্যু, কি নক্ষত্র কিছুই লাগে না তাকে পেতে—
দয়া অশ্রু অলৌকিক বেদনার আগে
যে-মেয়ের—ফুল নয়, পেট্রলের গন্ধ ভালো লাগে।

উত্তরাধিকার

শ্রীহরি ভট্টাচার্য

চল্লিশ বসন্তের উত্তরাধিকার
এই শীত। বিগত বসন্তের দাক্ষিণ্যে উষর।
প্রত্যাশা ও প্রত্যয়ের ভগ্নস্তূপ।
হে বসন্ত, তোমার আসার পথে,
তোমার পায়ের দাগ গুনে
শীত অদূরেই।

তবু দীপ জ্বলে—তার আলোকচ্ছটায়
নিভৃত আশারা সব সমাধির তলে
নিশ্চিন্তে ঘুমায়।
জানি না সে কিসের আলোক,
পূর্ব স্মৃতি, পরজন্ম, কিংবা কোনো
ঈশ্বরে বিশ্বাস।
মনে হয় কোথাও করুণা
স্তরে-স্তরে জ'মে আছে ;
যতই কঠিন মাটি হাত দিয়ে ছানি,
তবু হাত ধুয়ে নিতে
আছে এক অমৃতের মতো গাঢ় লবণাক্ত জল।

সম্পাদক মশায়

রণজিৎ সিংহ

সম্পাদক মশায়,
ফেরবার আশায় পিঠে ডাকটিকিট বেঁধে
একটি কবিতা চললো আপনার দপ্তরে।

নাক উঁচিয়ে আপনি যখন
শব্দ উপমা ছন্দ ব্যঞ্জনা
—এই সবের সার্থক প্রয়োগ বিচারে ব্যস্ত,
আপনি তো জানলেন না,

এদিকে আমরা দুজন ততক্ষণে
মিলেছি সবচেয়ে সেই উঁচু চুড়োয়!
(প্রজ্ঞার বোঝা ঠেলে
যেখানে যাওয়ার কথায় আপনার ভিরমি লাগে।)
চোখ ভ'রে দেখার আর মানা নেই আমাদের—
সেই আনন্দ লাগলো সব-কিছুতে
দুলে-দুলে নেচে উঠলো বসতি আর বনবাদাড়।

আরো শুনুন,
ও একটা মূর্তি গড়লো
যার প্রতিটি রোমকূপে বিস্ময়
পেশীর খাঁজে-খাঁজে উল্লাস
চিতোনো দুই কাঁধে চাড় লাগাবার রোখ।

সম্পাদক মশায়,
জানি কবিতাটি ফেরত আসবে—ঠাস পণ্ডিত আপনি ;
ওই তো লগি হাতে চলেছেন তল মাপতে
আর নেহাৎই কবির ভাগ্য যদি জোর
খুঁজছেন একতিল স্পেস,
তবু নথিপত্র দলিল দস্তাবেজে
মুখ-গুঁজে-থাকা আপনাকে
কী ক'রে বোঝাই এ-কথা—

বাহুতে-বাহুতে আমরা বেঁধেছি
অনন্ত কালের উৎসব।

তিন শূন্য

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

শূন্য থেকে ছিনিয়ে আসা
চার দেয়ালে ঘেরা,
হঠাৎ খুশি, কখনো চোখে জল
(ও-পথে যাক প্রবীণ পথিকেরা)
এ পথে শুধু তোমাকে সম্বল।

এই যে আমি বুক বেঁধেছি, যার
দেহের দহে ভালো লাগার ঋণ,
মেঘের স্নেহে ও-হাত হাতে পাবার
পুরোনো মন, বৃষ্টি-ঝরা দিন···

আজকে ফিরে স্মৃতিকে শুধু জানা।

কেন যে তবু সুখী হাওয়ার টানে
যখনি দেখি আকাশে কোনো মুখ,
জানলা ভাঙে, কপাট ভাঙে—আনে
দস্যু সুখ অবুঝ আগন্তুক ;

শূন্য নেয় ফিরিয়ে তার সীমার কৌতুক ॥

বাসর

তন্ময় দত্ত

রুধিরস্ফীত শিরায় রাখে তীব্র তার নখ,
হিংস্র চুলে অরণ্যের ভয়াল মর্মর,
তীব্র কামে সাপের মতো জ্বলন্ত দুই চোখ,
ফুল্ল দুই অধরে কাঁপে আবদ্ধ বর্বর
দন্তে-চাপা রুদ্ধঘন মন্ত্রমিত স্বর,
সর্বনাশী চূর্ণ করে বিজীর্ণ নির্মোক।

নিবিড় দাঁতে গণ্ডে আঁকি দংশনের ক্ষত,
পাণ্ডু করি রক্তঅধর প্রবল চুম্বনে,
দুগ্ধনীল শঙ্খ হানে স্তব্ধ ধ্বনি শত,
বৃন্তমুখে রক্তমণি জ্বলন্ত রঞ্জনে।
অন্ধতম আদিমতম অবোধ্য গুঞ্জনে
দুমড়ে দোলে মাতাল কেশারণ্য ইতস্তত।

মিতভাষণ

শান্তিকুমার ঘোষ

"গাছের যৌবন পেলে আমার আনন্দ, প্রিয়, হরিদ্রার ফুলে
দিতাম অঞ্জলি ভ'রে কত না শতাব্দী কাল রৌদ্র জল ঝড়ে।"

"তবুও বিদায় নিতে। পলাতক ঋতুগুলি শুভ্র নীল রাঙা হ'য়ে আসে
তেমনি অম্লান ফের ; বসন্ত অমর প্রাণ—মরণে তা শেষ হয় না যে।"

"আদিম হরিৎ প্রেম পাণ্ডুর, নিয়ত ভয়—আসন্ন ছায়ার।
বিলম্বিত সন্ধ্যা করো—দিনের ভাস্কর্য-রূপ এখনি. না যেন হয় শেষ :
নিরক্ষরেখায় সূর্য সমুদ্রে ডোবালে
অন্ধকার দ্রুততর নামবে দু-পারে।"

"তখনি জুড়াবে চোখ,—স্নেহের আঁধার শুচি, অনন্তসম্ভবা :
রাত্রির ঐশ্বর্য-জ্বলা আকাশে-আকাশে॥"

উষ্ণ বাতাস

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জেগে উঠে দেখলেম, ঝিলের আলো কাঁপছে দেয়ালে
চুনিপান্নার চকমকির মতো, রোদ কেবলি
লুটোপুটি খেয়ে গড়িয়ে পড়ছে মায়াবী
হাসিতে ; আর, গোল এক ভোমরা,—কালো
রেশমের মতো তার শরীর, পাখনা তার
তেলতেলে কাগজের মতো যেন,—জানলার ঝিলিমিলির
ধারে একটানা ধ্বনিবিহারে তন্ময়।

কী যেন মনে পড়তে চায়, অথচ মনে পড়ে না, শত
আগ্রহেও না, চেষ্টাতেও না, রুদ্ধ আগল স্মৃতির
দুয়ারের। পলাতক আলো, ঝিলিমিলির ধারে
হাওয়া, ভোমরার সরব চলাফেরা, তবু
কী যেন মনে পড়তে চায়, মনে পড়তে চায়…

কুমারী ছায়া ঢেকে রেখেছে তার গোপন শরীর, অলংকৃত সোনালি স্তনচূড়া, কাচের মতো নির্বিকার শব্দহীনতার ভিতরে তার অন্ধকার শরীরের অসম্ভব আভা। গ্রীষ্মের মর্মর নিয়েছে বোবা পাখিরা। ছপছপ শব্দ ক'রে চলেছে ময়ূরপঙ্খী, মৃত প্রেমের প্রণালী আর হারিয়ে-যাওয়া স্বরভির উপনদী পেরিয়ে কোথায় কে জানে।

কাঠকুড়ুনি মেয়ে বনের শেষে গান গাইছে সোনালি ঝড়ের
মতো গভীর গলায়, গোরুর গলার ঘুন্টি বাজছে
ঠুংঠুং, পাহাড়ের শরীরের শীতল নিরুত্তাপ ছোঁয়া

নিয়ে ফিরে আসছে প্রতিধ্বনিরা, আর
দূর ফসলের খেতে চিৎকার করছে হাওয়া—

তার বালিকাবেলার গরিব স্তনযুগল, আর ঘন শরীর, তার কুমারী ছায়া আর আকাশের উপকথা ফুলে, ফেঁপে ভ'রে উঠলো। খঞ্জনকে গঞ্জনা দিলে তার চোখ, আর নৃত্য মায়াবিনী। হিরের ঝলমলানোর শীতল প্রতিফলনে জাদুকরী এক সুখ কাঁপতে থাকলো, কাঁপতে থাকলো, কাঁপতে থাকলো…

কী যেন
মনে পড়তে চায়, কী যেন মনে পড়তে চায়,
অথচ

তিনটি লিরিক

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

একটি পাখিকে

তোমার কাছে আমার আশা অপার।
কিন্তু তুমি উড়াল দিলে ডানায়—
পালালে, যেই কাঁপন লাগে ডালে,
ভালোবাসা, তোমায় সবি মানায়।

নাকি কোথাও উড়ছো দূরে হাওয়ায়—
অন্ধকারে অতনু অঙ্গারে
অস্তমেঘ জড়িয়ে নিলো খোঁপায়,
তোমার স্বর হারালো নিঃসাড়ে।

তোমার নই, তবু আমার আশা—
শুশ্রূষায় প্রতীক্ষিত বাঁচা,
এড়িয়ে যাও, কিন্তু যাবে কোথায়—
ভালোবাসা, সারা আকাশ খাঁচা॥

অনুভব

কখনো তোমার নির্জনে ফিরে-যাওয়া
কখনো ভিড়ের বাহুভর দ্রুতযানে,
টাল সামলাতে এত পারো, বিনা ডাকে
পেছনে তাকাও অবিকল অভিমানে।

যদিও আমার ঘরে-যাওয়া, ঘর-ছাড়া,
দুটি ইচ্ছের স্বতন্ত্র সুতো-বাঁধা—

তোমাকে যখন দেখি, হৃদয়ের সাড়া
অলক্ষ্যে করে সম্ভব রাখি-বাঁধা।

তুমি যাও, যেন শ্রাবণদুপুর ঝরে,
নিজেকে ঘিরেই, ফিরে এসে, কানামাছি,
একলা, অথবা ভিড়-ঠেলা যাতায়াতে
এত কাছে হাঁটো, মনে হয় ছুঁয়ে আছি॥

বৃথা

সব নয়, কিছু মনে থাকে।
কেউ যদি বধির ব্যথায়,
যে মুখর, সে যে কথা রাখে,
দোলাচলে হৃদয় শুকায়।

ফেউ হাওয়া কাকে ডেকে আনে
দর্পণ ভয়ে আলুথালু,
ভেঙে যায়—যাক, ভালোবাসা
বৃষ্টিফলায় স্পর্শালু;

তুমি শুধু প্রেম চেয়েছিলে।
তবু, ছাখো, মেঘ-পারাপারে
একটি কি দুটি ফোঁটা ঝরে,
কাকে বলো, তুমি সব দিলে!

সূর্য উঠবে ভোরের মফস্বলে

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোরে ঘুম থেকে উঠি
কপালে কে দিলো যেন হিম-হিম হাত—
হেমন্ত-প্রভাত?
একটি পুষ্পিত দিন ঘাসের গালিচা পেতে হাসে
ঝিরিঝিরি জানলার পাশে।

আঙিনার অঙ্কশায়ী শান-বাঁধা রক
বলে—গ্যাখো, দূরে হাঁটে কুয়াশার ধোঁয়া—
তাকে ছুঁয়ে খাড়া হ'লো গাছেদেরও শরীরের রোঁয়া;
পুকুরটা চক্কর দিয়ে গেলো একা এক বক।

রক থেকে নেমে সোজা মাঠে গেলো মন;
'চুপ, চুপ, শব্দ কোরো না—ঘাসের কার্পেটে দাও পা।'
—পাশ থেকে অশরীরী কে হঠাৎ বলে।
মিনতিতে নম্র হয় চারিদিকে ভোরের নির্জন,
শিশিরের বিন্দু ঘাসে টলে

পা দুটো গলিয়ে নিয়ে অভ্যস্ত চটিতে
(কিন্তু ছি, ছি, চটি কেন প্রকৃতির পূজার বেদীতে?)
র‍্যাপার জড়ানো দেহ টেনে নিয়ে চলি মৃদু আমেজের শীতে
খোলা আকাশের তলে, হিম মাঠে, ভিজে-ভিজে ঘাসে
আঙিনা যেখানে চার-দিক-ছোঁয়া প্রান্তর হ'তে ভালোবাসে!
না-ডাকতে উঁকি দিলো কতো গত প্রবাসের দিন—
—'এই যে এলাম গ্যাখো মনে চিহ্ন দিয়ে রাখো
ধ্যানস্থিত হেমন্তের এইখানে ভোরে-ভেজা প্রকৃতির পাশে—'

কচি-কচি আলো-আলো হাসা-ভাসা দিন
চেনার চমক দিয়ে বুকে ফিরে আসে
এ যাবৎ ছিলে যারা বিস্মৃতিবিলীন।
পায়ে চটি নিয়ে তবু দাঁড়ালাম ঘাসে-খুশি নরম মাটিতে
কোথা থেকে ওঠে যেন এবার-তাহ'লে-যাই,
এবার-তাহ'লে-যাই স্বর—
ধ্বনিরেশ প্রাণে মেশে বিধুনিত হয় দূর রোদসী বিধুর।
ভোর বলে—'তুমি থাকো; আমি আর রবো নাকো।'
স্মৃতির হাওয়াও বলে—'আমি তবে যাই।'
শিশির-আরশি-ফোঁটা ব'লে ওঠে—'চেয়ে গ্যাখো, আমি আর নাই।'
ঘাস সেও ব'লে ওঠে—'তোমার চটির তলে আমিও গেলাম।
এ হেন কৃপণ মন—কী বা তুমি দিতে পারো নিসর্গের দাম!
আকাশেরও সঙ্গী নও, সঙ্গী নও শিশিরের, অথবা ঘাসের,
আত্মীয় নও তুমি নরম মাটির—
কে গো, তুমি, কোথাকার—
পার হ'য়ে যাবে কোথা, কতো পথ উজান-ভাঁটির!'

...ভোর হেসে চ'লে গেলো, শিশির উদ্বায়ী হ'লো,
আবর্তে ঘুরে মরি নাগরিক ধোঁকার টাটির।

ভোর, ঘাস, শিশিরেরা সমস্বরে বলে—'ওহে,
তুমি মেকি, তুমি মেকি, তুমি নও খাঁটি।'
মন-বেনে সব মেনে
বুঝি বেশ দিনে-দিনে হ'য়ে গেছে একেবারে মাটি!

সূর্য উঠে ততোক্ষণে আলো-মদে ভ'রে দেয়
আনীল ফেনিল দূর আকাশের বাটি

সমুদ্র কোথায়, এ যে···

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

মনে করো, মেঘ জমলো পৃথিবীর উত্তর আকাশে।
দূরের ঘূর্ণায়মান চিল গেলো মুছে, এবং বাতাস
ক্রমশ করুণ আর ঠাণ্ডা আর মৃত্যুর মতন
স্পর্শ রেখে গেলো দূর গাছপালার ভিড়ে।
আর মাঠ, শস্যহীন মাঠ
বিষণ্ণ দৃশ্যের বিম্বে বুক আলো ক'রে সংগোপনে
ভেবে দেখলো, এই শস্যক্ষেত্র যদি আমার কবর,
যদি দিন নিরুত্তাপ, রাত্রি এক ভয়ের কাহিনী;
তবে কেন এই নগ্ন দেহ ঘিরে প্রতি সূর্যোদয়,
প্রতিটি সূর্যাস্তে কেন শিশিরের অশ্রুনিবেদন ?

মনে করো, মেঘে-মেঘে ভ'রে উঠলো বিলুপ্ত মেদিনী;
বিশাল শূন্যের মহাদেশে
শুধু বাতাসের ব্যঙ্গ, আর তার দীর্ঘ অভিযান।
যেখানে শায়িত ছিলো শস্যহীন মাঠ—
সেখানে এখন একা পৃথিবীর পূর্ণিমার আলো;
কিন্তু ছায়া নেই, ছাখো, কায়া নেই; নিষ্ঠুর শূন্যতা।
সমুদ্র কোথায়, এ যে সমাধির শিলা!
একদিন তুমি ছিলে ঐ ভাঙা বাড়ির ছায়ায়;
আজ এই মাঠে, এই শস্যহীন মাঠে।
মনে করো, মেঘ জমলো, ঝড় ব'য়ে গেলো; তারপর···তারপর···

বৃষ্টি ? না, না, বৃষ্টি নয়। বন্ধু, বৃষ্টি নয়।
সমুদ্র কোথায়, এ যে সমাধির শিলা।

শিলায় নিহিত তার হৃৎপিণ্ড, ঝড়ের গর্জন;
না, না, গান নয়, কান্না নয়,
আনন্দিত তরঙ্গের কলরোল নয়।
একদিন তুমি ছিলে ঐ ভাঙা বাড়ির ছায়ায়···
আজ এই মাঠে, এই শস্যহীন মাঠে···
তোমার আকাশ নেই, তোমার বাতাসে নেই নক্ষত্রের বীণা;
তোমার পায়ের নিচে মাটি ছিলো, মাটি নেই; মাঠ,
মাঠ নেই; শুধু নীল শূন্যের নিক্বণ:
তোমার স্থিতির মতো শুধু এক ব্যর্থ অন্ধকার।

মনে করো, মনে করো, মেঘ জমলো; ঝড়, ঝড় এলো;
তারপর···
একদিন তুমি ছিলে, তুমি ছিলে···
আজ এই মাঠে, এই শস্যহীন মাঠে···
কিন্তু তুমি ছিলে, তুমি ছিলে একদিন···
মনে করো···

সমুদ্র কোথায়, এ যে সমাধির শিলা।

দুটি কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী

য়োহান্ সেবাষ্টিয়ান্ বাখ

কানের আতঙ্ক পার, রেডিয়ো-মার্কিন শব্দঝড়ে
স্বদিগন্তে, কোথা পাব, আছে কি ঈথর গানে-আঁকা,
বদলিয়ে বেতার-চাবি খুঁজি যত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে

একেবারে মর্মে ঢুকে বিবিধ বিক্রেতা এসে লড়ে,
লাল-ভীতি, কিংবা প্রীতি ডলারে সবুজ স্তরে রাখা
মুহূর্তে মুহূর্তে পণ্য ছড়ায় বাক্যের মেলে পাখা :

স্বেচ্ছা বিহ্বলদশা এই কিলোয়াট-মন্ত্র ঘরে নিয়ে।
এমন সময় চোখ, অভ্যাসের বশে দ্রুত চেখে
দেখে জানলার ধারে অবিচল চলে বন্ধু নদী

মার্কিনের ধারা তার স্থিরগামী স্বচ্ছ নিরবধি,
অগণ্য বুকের স্রোতে তন্ময় শহর ফেলে রেখে
সাগরসঙ্গমা গতি, সখ্যে মেলে লঘু নীল শিরে

এম্-আই-টির কারুশীর্ষ, চোখে মুক্তি নিয়ে আসি ফিরে,
ভাবি বন্ধ ক'রে যন্ত্র কানের তালাকে খুলি যদি—
হঠাৎ কম্পিত এ কী দূরের প্রসাদ কার পাই

হাত রেখে রেডিয়োতে, চোখ বুজি, কান ভুলে যাই,
মূর্ছনায় অফুরন্ত বাখ্-এর কন্‌চের্টো বেজে ওঠে
বেহালা ভায়োল বাঁশি মৃদঙ্গ পিয়ানো স্বর্গতটে

শব্দজ্যোতিচ্ছটা ঠেকে, মন্ত্রসিদ্ধ স্বরধন্য বাখ্
ফিরিয়ে এনেছ সেই শব্দাতীত বিধৃত অবাক্
গার্গীর অক্ষর প্রাপ্তি ; সৃষ্টির আদিম প্রশাসনে

দ্রব হল পরবাস, পরমায়ু নিত্যের নিবিড়
জর্মানির যুগ্মতায় ফিরে পেল সেই কেন্দ্রনীড়
অনন্তা ভারতী যেথা সৌরব্রতা মৌন ধ্যানাসনে,

সম্মুখে অচলশ্রেণী, ধৌত ধ্রুব হিমাদ্রি ভাষণে
মর্মর ন্যগ্রোধসারি ; আর্ষ নেত্র ; উন্মুক্ত সংসার
দিব্য পৃথিবীর সাক্ষ্য একাক্ষরে করেছে উদ্ধার—

যার প্রশাসনে গার্গী, মাস অর্ধমাস ঋতুদল
যার প্রশাসনে, গার্গী, জেনেছিলে শ্বেতগিরি জল
প্রাচ্য প্রতীচ্যের ধারে স্যন্দমান নামে অদৃষ্টের

সৃষ্টির প্রবাহে ; সেই অলোহিত, অচ্ছায়, অতম
সর্বগত, অনাকাশ, সূক্ষ্মাতীত, অবিনাশী ঋক্ ;
তুমিও সংগীতদ্রষ্টা, বাখ্, তুমি অনাদি খৃষ্টের

দর্শনে জেনেছ একই, কোথায় ভিন্নতা, অনুপম
উপমা তাঁরাই যাঁরা ধ্বনিবিৎ এই মর্তঘরে
ধূলায় গেছেন রেখে কারুসূত্রে, শ্লোকে, ভূ-স্বার্গিক

পরাকীর্তি, শোকজয়ী। আশ্চর্য, বাঙালি শ্রোতা একা
উদ্‌ভ্রান্ত রেডিয়ো-লগ্নে নির্বাসিত ভিড়ের অন্তরে
ব্রাণ্ডেন্‌বুর্গের ছন্দে প্রার্থিতের পাই ক্ষণদেখা ॥

গ্র্যাণ্ড ক্যানালে

গণ্ডোলা দোলে এখনো ভেনিসে
জলছবি-ভাসা স্বপ্নশহরে,
চলে অলিগলি স্বচ্ছ কাহিনী
ছল-ছায়া আঁকা পুরোনো সময়ে ;
ঘুরে-ঘুরে গানে, গীটার-ধ্বনিতে
নব রূপকথা,
ভেনেৎসিয়ান্ নিয়াপোলিতান্
ছিপছিপে দেহে দাঁড়ে বাঁকা তালে।
তরল সন্ধ্যা, দ্রব ব্যাকুলতা,
পথিক-পথিকা ফেলে নিঃশ্বাস,
পারে না চাইতে দুজনার দিকে ;
রাত্রি-মাধুরী সংজ্ঞার বেশি
এখনো ভেনিসে॥

সারি-সারি রাতে গণ্ডোলা মিশে
এখনো ভেনিসে
রচে উৎসব মদির প্রহরে
রঙীন ফানুষে জ্বালে মায়া-দীপ ;
নানা হোটেলের ঘাটের বাহিনী
চলে প্রত্যেকে আক্রুতা ব'য়ে
একই তিথি মেনে মোহ-রজনীর ;
আরিভাতো গান গুঞ্জিত ওঠে
তারা-থরথর ইতালি-হাওয়ায়।
চারু আভা-তলে ঢাকে তীব্রতা
ধনিক সৌধ, নকল বিলাসে
ডুবে যায় পাশে। পূর্ণ নিমিখে
মিলে-যাওয়া হিয়া শেষ-অন্বেষী :
এখনো ভেনিসে॥

'ল্য ফ্ল্যর দ্যু মাল' থেকে

শার্ল বোদলেয়ার

প্রতিকারহীন

১

পুরুষ, আকৃতি, সত্তা সে যা-ই হোক
নভতল থেকে বিচ্যুত, ছুটে চলে
ধাতুপঙ্কিল স্টিক্সের ধারাজলে
যেথায় কখনো পশে না সূর্যালোক ;

এক দেবদূত, বিকৃতির প্রেমে লুব্ধ
এ-বিশাল দুঃস্বপ্নের তল খোঁজে,
সাঁতারু যেমন ঢেউয়ের সঙ্গে যোঝে
তেমনি বিকট কষ্টে চালায় যুদ্ধ

দুঃসাহসের প্রভাবে ভ্রাম্যমাণ !
বিরুদ্ধে তার, যেন পাগলের সংঘ,
নেচে, গান গেয়ে, অমার অন্তরঙ্গ,
ধায় ঘূর্নির দুর্মদ অভিযান ;

সে এক দুঃখী, ডাইনি-মন্ত্রে ম'জে
হাৎড়ে বেড়ায়, সাপের বিবরে বন্দী,
যদিও পলাতে নানামতো করে ফন্দি
চাবি, বাতি আর রশ্মি বৃথাই খোঁজে ;

অভিশপ্ত সে, চিরতমসার সঙ্গী,
নামে পূতিবাস-উচ্ছ্বাসী গহ্বরে,
যা তার পিছল গভীরে ব্যক্ত করে
এক বৃতিহীন অসীম সোপানপংক্তি,

যেথা জঘন্য জন্তুরা নেয় পিছু—
ক্লিন্ন গাত্র, চক্ষে আগুন জেলে
রাত্রিকে আরো কবন্ধ ক'রে তোলে,
নিজেদের ছাড়া দেখায় না আর-কিছু।

সে এক তরণী, স্ফটিকের ফাঁদে পড়া,
অসহায় মেরুসীমান্তে সংবিদ্ধ,
খোঁজে, কোনখানে সে-কালান্তক ছিদ্র
যা দিয়ে এমন পরিণামে দিলো ধরা;

—নির্ভুল ছবি, নিখুঁত প্রতীক এরা
প্রতিকারহীন নিষ্ঠুর নিয়তির,
ভাবতে শেখায় শয়তান মহাবীর,
যা করে তাতেই ওস্তাদি তার সেরা।

২

অমল, গভীর সংলাপে দেয় সাড়া
যে-হৃদয় তার আপন মুকুর হ'লো।
সত্যের কূপ, স্বচ্ছ এবং কালো,
কম্পিত যেথা পিঙ্গল এক তারা,

আলোর স্তম্ভ নারকী কৃপায় ধন্য,
ব্যঙ্গশিখায় পিশাচের ব্যঞ্জনা,
এক গৌরব, অনন্য সান্ত্বনা,
—পাপকর্মের অবিকল চৈতন্য!

স্মারক লিপি

এমন মানুষ কে আছে, বুকের তলে
না পোষে হলদে সাপের তীব্র ফণা
মসনদে ব'সে অনবরত যে বলে :
"আমি রাজি", আর উত্তরে "পারবো না!"

কিন্নর, পরি, অপ্সরীদের স্তব্ধ
নয়নে তোমার নয়ন করো নিবদ্ধ,
বিষদাঁত বলে : "মন দাও কর্তব্যে!"

গাছে ঢালো জল, সন্তানে দাও জন্ম,
গড়ো কবিতায়, মর্মরে কারুকর্ম,
সে বলে : "হয়তো আজকেই তুমি মরবে!"

মানুষ যতই ভাবুক, করুক চেষ্টা,
মেলে না জীবনে এমন কোনো মুহূর্ত
মানতে যখন না হয়—দারুণ ধূর্ত
এই অসহ্য সর্পই উপদেষ্টা।

সিন্ধু ও মানব

স্বাধীন মানব, র'বে চিরকাল সিন্ধুর প্রেমিক!
তোমার দর্পণ সিন্ধু; অন্তহীন আন্দোলনে তার
প্রতিবিম্ব ছাখো তুমি তরঙ্গিত আপন আত্মার,
তার তিক্ত, তলহীন পাতালের তুমিও শরিক।

ঝাঁপ দিতে ভালোবাসো আবক্ষ আপন রূপায়ণে ;
তার চোখে, বাহুতে তোমার অঙ্গ আলিঙ্গনে মাতে,
হৃৎপিণ্ড আপন ছন্দ ভুলে গিয়ে, নিজেকে মেলাতে
চায় মাঝে-মাঝে তার দুঃশাসন বর্বর স্বননে।

উভয়ে অপরিমাণ, অন্ধকার, সতর্ক তোমরা ;
মানব, কেউ কি তল খুঁজে পায় তোমার গহ্বরে ?
হে সিন্ধু, কেউ কি জানে কত রত্ন তোমার অন্তরে ?
উভয়ে অস্থয়াপন্ন, দাও নিজ রহস্যে পাহারা !

আর ইতিমধ্যে হয় অপগত অযুত বৎসর,
নির্দয়, শোচনাহীন, তবু দ্বন্দ্ব চালাও দু-জনে,
এত সুখ তোমাদের হত্যাকাণ্ডে এবং মরণে,
চিরন্তন দুই মল্ল, ক্ষমাহীন দুই সহোদর !

সৌন্দর্য

ছাখো, কী সুন্দর আমি, মরগণ ! যেন স্বপ্ন পাষাণে প্রণীত,
এই স্তন, সকলেরই ঘুরে-ঘুরে সর্বনাশ যাতে
তা পারে কবির চিত্তে সে-প্রেমের সংক্রাম জোগাতে
যা নিতান্ত চিরন্তন, মৌন জড়পদার্থের মতো।

দুর্বোধ স্ফিঙ্কসের মতো, নীলিমার পালঙ্কে আসীনা,
মেলাই তুহিন প্রাণে মরালের দীপ্ত ধবলতা,
পাছে রেখা ভ্রস্ত হয়, ঘৃণা করি সব চঞ্চলতা,
কখনো ফেলি না অশ্রু, উপরন্তু কখনো হাসি না।

কবিরা যখন ছাখে গরীয়ান আমার ভঙ্গিমা,
ভাস্বর মূর্তির কাছে (মনে হয়) আমি যা শিখেছি,
কঠিন চিন্তায়, পাঠে দগ্ধ করে জীবনের সীমা ;

কেননা, এ-সব নম্র প্রেমিকেরে ভোলাতে, রেখেছি
সব সুন্দরের উৎস, স্বচ্ছ এক বিশুদ্ধ দর্পণ :
দুটি চোখ, আমার বিশাল চোখে শাশ্বতের জ্যোতির তর্পণ !

কোন কথা আজ বলবি রাতে

রে নিঃসঙ্গ, কোন কথা আজ বলবি রাতে,
কী বলবি তুই, হৃদয়, পূর্ববেদনাহত,
প্রেয়সী, শ্রেয়সী রূপসীকে—যার দৃষ্টিপাতে
তুই আনন্দে ফুটলি আবার ফুলের মতো ?

—আমাদের সব গর্ব লাগাবো পূজায় তার :
তার বিধানের মতো মধুময় কী আর আছে ?
তার তনুতটে ঝরে স্বর্গের গন্ধভার,
জ্যোতির্বসন লাভ করি তার চোখের কাছে।

থাকি নিশীথের নির্জনতায় লুপ্ত,
চলি রাজপথে জনতায় প্রক্ষিপ্ত,
তার প্রতিভাস মশালের মতো ছড়ায় জ্যোতি ;

"সুন্দর আমি," সে বলে, "আমারই জন্য
শুধু সুন্দরে ভালোবেসে হবে ধন্য ;
আমি দেবদূত, কর্ত্রী, ম্যাডোনা, সরস্বতী !"

সপ্রাণ মশাল

ঐ দুটি দীপ্ত চোখ আমার সম্মুখে ছুটে চলে,
চতুর দেবদূতের হাতে গড়া নির্ভুল চুম্বক ;
স্বর্গীয় যমজ, তবু আমাকেও মানে ভাই ব'লে,
আমার দৃষ্টির 'পরে দোলে দুই প্রোজ্জ্বল হীরক্ ।

তাদের নির্দেশে আমি সুন্দরের নিত্য অনুগামী,
পাপের বাগুরা থেকে করে তারা আমাকে আড়াল ;
আমার সেবক তারা, তাদের দাসানুদাস আমি ;
আমার সত্তায় বাধ্য রাখে সেই সপ্রাণ মশাল।

মায়াময় দুই চোখ, দিবালোকে প্রদীপের মতো
রশ্মি জ্বলে তোমাদের ; সূর্য হোক লোহিতবরন,
সাধ্য নেই, অলৌকিক সে-বহ্নিরে করে প্রতিহত ;

সে-রশ্মি মৃত্যুর দূত, তোমাদের গানে জাগরণ ;
যা শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায় আত্মার প্রভাতে,
হে যুগ্ম তারকা, যাকে কোনো সূর্য পারে না নেবাতে !

রক্তের ফোয়ারা

কথনো আমার দুর্বারবেগ রক্তধারা,
মনে হয়, ছোটে চাপা কান্নায় আত্মহারা
ফোয়ারার মতো ;—শুনি প্লাবনের দীর্ঘতান,
কিন্তু কোথায় জখম, মেলে না সে-সন্ধান ।

রণভূমি যেন, তেমনি পেরিয়ে চলে নগর,
ফুটপাত পায় দ্বীপের পুঞ্জে রূপান্তর,
সর্বভূতের তৃষ্ণায় আনে নির্বাপণ,
রাঙায় প্রকৃতি দীপ্ত লালের প্রস্রবণ ।

অনেক সেধেছি মদেরে—আমায় হানে যে-ভয়
তাকে একদিন চুপি-চুপি করো সুপ্তিদান—
সুরায় আরো যে স্বচ্ছ নয়ন, তীক্ষ্ণ কান !

ভেবেছি, প্রণয় সকল-ভোলানো নিদ্রাময় ;
কিন্তু কামেও সূচিশয্যায় অনুক্ষণ
ক্রূর বেশ্যার পিপাসায় ঢালি নিঃসরণ ।

পাতকিনী

গাভীর পালের মতো বালুতটে শুয়ে আছে তারা,
চিন্তালীন, চক্ষু চলে সমুদ্রের দিগন্তরেখাতে,
কম্পনের তিক্ত স্বাদ, আলস্যের সুখে মাতোয়ারা,
পা খোঁজে পায়েরে, আর ব্যগ্র হাত ঠেকে যায় হাতে ।

কেউ-কেউ, দীর্ঘায়িত বিশ্বাসের আবেগে উতলা,
বনের গভীরে, যেথা কলশব্দে নির্ঝরিণী ঝরে,
শৈশবের ভয়ে ভরা প্রণয়ের লেখে বর্ণমালা
তরুণ, শ্যামলকান্তি তরুগাত্রে, ক্ষোদিত অক্ষরে ;

অন্যেরা, অত্বর পায়ে সঙ্কলিত, যেন বোনে-বোনে,
পিশাচের শিলাময় বাসস্থানে বেড়ায় গম্ভীর,
যেথা দেখা দিয়েছিলো, যেন তপ্ত লাভার প্লাবনে,
নগ্ন, দৃপ্ত স্তনভারে প্রলোভন সেণ্ট আণ্টনির ;

নিঃশব্দ শূন্যতাময়, পেগানের প্রাচীন গুহায়
ধূপতির ধূমালোকে কেউ-কেউ তীব্র জ্বরে কাঁপে,
বিক্ষেপের আলোড়নে যাচে এক সক্ষম সহায়—
হে ব্যাকাস, ঘুম দাও আমাদের আদিম সন্তাপে!

আরো আছে—আকণ্ঠ গুণ্ঠন টেনে সন্ন্যাসিনী সাজে
গম্ভীর কাননে যারা, জনহীন স্তম্ভিত নিশায়
লুকিয়ে ভীষণ কশা আলম্বিত বসনের ভাঁজে
ফেনিল প্রমোদপুঞ্জে যন্ত্রণার ক্রন্দন মেশায়।

রাক্ষসী, পিশাচ-নারী, হে কুমারী-শহীদের দল,
উদার আত্মার বেগে বাস্তবেরে তুচ্ছ ক'রে যারা
তাপসী, অর্ধেক ছাগ, অসীমেরে খোঁজো অবিরল—
কখনো চীৎকার তুলে, কখনো কান্নায় আত্মহারা,

তোমরা, যাদের পিছে আনরক ছুটেছি আমিও,
অভাগী ভগিনী সব, নাও প্রেম, করুণা আমার—
হতাশায়, পিপাসায় নিরন্তর যারা দহনীয়,
অথচ হৃদয়ে রাখে থরে-থরে প্রেমের সম্ভার।

বিয়াত্রিচে

পোড়ো মাঠ প'ড়ে আছে, অশিসার, হরিৎবিহীন,
শুনিয়ে বিলাপ শুধু প্রকৃতিকে, চলেছি সেদিন;
ধীরে-ধীরে শান দিয়ে হৃদয়ের বিষণ্ণ ছোরায়
সে-চিন্তাগুলিকে, যারা নিরুদ্দেশে উন্মন বেড়ায়;—
তখন ভরদুপুর, চেয়ে দেখি, কালান্তক বেগে
আমার মাথার 'পরে, মস্ত এক ঝোড়ো কালো মেঘে

ভর দিয়ে নেমে এলো দলে-দলে পিশাচ, প্রমথ
কুট, ক্রূর, কৌতূহলী এক পাল বামনের মতো।
তাকিয়ে আমার দিকে ঠাণ্ডা চোখে করে গবেষণা,
যেমন ইতরগুলো পাগলের বাড়ায় যন্ত্রণা
তেমনি পাকিয়ে চোখ, পরস্পরে দিয়ে হাতছানি,
আমাকে শুনিয়ে, হেসে, এইমতো করে কানাকানি:

—"এই ব্যঙ্গচিত্র, একে মন দিয়ে সবাই দেখিস,
হ্যামলেটের ছায়া, তার ভঙ্গিমার নকলনবিশ,
উদাস, অস্থির চোখ, এলো চুল বাতাসে বেয়াড়া।
কী আছে করুণ আর এর চেয়ে, এই ছন্নছাড়া
আধপেটা অভিনেতা, উঞ্ছজীবী, অক্ষম বেকার
যা তার খেয়াল, তাকে শিল্প ভেবে জ'পে যায় তার
দুঃখে ভরা গানগুলি গাংফড়িং, জলের প্রপাতে,
ঈগলে, ফুলের দলে—এমনকি সে-গান রটাতে
চায় তার দুর্দশার জনয়িতা আমাদেরই কানে—
ধিক্কারে চীৎকৃত যারা রাজপথে তার অপমানে!"

আর-কিছু নয়, শুধু যদি আমি পরম গৌরবে
নিতাম ফিরায়ে মুখ, উন্মুখর পিশাচেরা তবে
আমার কঠিন তেজে হার মেনে চ'লে যেতো ফিরে।
—কিন্তু দেখি, সঙ্গে চলে, অন্তরঙ্গ সে-অশ্লীল ভিড়ে
—নির্বিকার সূর্য তবু, এ-পাপেও কম্পিত হ'লো না!—
আমার হৃদয়রাজ্ঞী, নেই য়ার দৃষ্টির তুলনা,
আমার গম্ভীর দুঃখে হাসিমুখে সেও ব্যঙ্গ করে,
ওদেরে উৎসাহ দেয়, মাঝে-মাঝে, পিচ্ছিল আদরে।

অনুবাদ: বুদ্ধদেব বসু

সমালোচনা

চিঠিপত্র : ৬, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, চার টাকা।

পঞ্চম খণ্ডের পর বারো বছরের ব্যবধানে 'চিঠিপত্রে'র ষষ্ঠ খণ্ড বেরোলো। বইখানা হাতে পেয়েছিলুম জুন মাসে, পেয়েই প'ড়ে ফেলেছিলুম। ঠিক তখন রিভিয়ু লিখলে যা হ'তো, আজ ছ-মাস পরে তা হবে না। হয়তো সেটা এক হিশেবে ভালোই;—খুঁটিনাটি বাদ প'ড়ে যাবে, প্রবেশ পাবে না কোনো তর্ক, শুধু বইখানার যে-প্রভাব মনের মধ্যে তখন পেয়েছিলাম তারই আভাস দিতে পারবো। সমালোচনার উদ্দেশ্য নিয়ে নীল পেনসিলে যে-সব দাগ দিয়েছিলাম সেগুলোর দিকেও দৃক্‌পাত ক'রে কাজ নেই।

ষষ্ঠ খণ্ডের পত্রাবলীর প্রাপক ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। চিঠির সংখ্যা ৩৬, তার পরে আছে অবলা বসুকে লেখা সাতখানা চিঠি। পাইকা অক্ষরে ছাপা মূল গ্রন্থের এখানেই শেষ; কিন্তু 'পরিশিষ্ট' অংশে যা স্থান পেয়েছে তারও মূল্য কম নয়, এবং আয়তন পুরো বইয়ের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশে বা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে যে-সব কবিতা বা (ইংরেজি ও বাংলা) প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেগুলি 'পরিশিষ্টে' একত্র করা হয়েছে, আর আছে ত্রিপুরার মহারাজ ও অন্যান্য সুধীজনকে লেখা একই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পত্র, রবীন্দ্রনাথকে লেখা রমেশ দত্ত ও ভগিনী নিবেদিতার পত্র, এবং সর্বশেষে শতাধিক-পৃষ্ঠাব্যাপী 'গ্রন্থপরিচয়', প্রচুর টীকা, পাদটীকা, মন্তব্য ও উদ্ধৃতি, যার সাহায্যে পত্রোল্লিখিত ব্যক্তি ও ঘটনাগুলিকে শনাক্ত করা যায়, এবং দু-জন মহৎ বাঙালির সম্বন্ধের ইতিহাস সজীব ও সর্বাঙ্গ হ'য়ে ওঠে। মনে পড়ছে 'চিঠিপত্রে'র একটি পূর্বতন খণ্ড বিষয়ে লিখতে গিয়ে আমি এইরকম টীকার জন্য দাবি জানিয়েছিলুম; সেইজন্য প্রথমেই টীকার অংশকে অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন জানাই। এবং এই আশাও এখানে লিখে রাখি যে ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য খণ্ডগুলিতেও যেন যথাযোগ্য টীকার অভাব না ঘটে, কিন্তু তার জন্য আবার যেন এক যুগ দেরি না হয়।

রবীন্দ্রনাথের ছত্রিশখানা চিঠি থেকে একটি তথ্য স্পষ্ট বেরিয়ে আসছে; সেটি এই যে যৌবনকালে তাঁর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের বন্ধুতা ছিলো দু-দিক থেকেই একেবারে খাঁটি। এই বন্ধুতার ভিত্তি ঠিক পারস্পরিক গুণগ্রাহিতায় নয়; দু-জন সমবয়সী মানুষ, একই দেশে একই সময়ে যাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড়ো কোনো সংকল্প নিয়েছেন এবং নানা বিরোধিতার মধ্যে কাজ ক'রে যাচ্ছেন নিজ-নিজ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য, তাঁরা পরস্পরের প্রতি যে আত্মীয়তা ও সাধর্ম্য অনুভব করেন, তারই ভিত্তিতে এঁদের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রণয় গ'ড়ে উঠেছিলো। যে-সময়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, হতাশার মধ্যে ব'সে-ব'সে 'প্রত্যহ একটি ক'রে' 'নৈবেদ্যে'র কবিতা লিখে 'অন্তর্যামীকে নিবেদন ক'রে' দিচ্ছেন, সেই একই সময়ে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার সূত্রপাত, এবং সেটাই এই পত্রাবলীর আরম্ভকাল। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রথম অনুরক্ত পাঠক জগদীশচন্দ্র, কিন্তু তাই ব'লে তিনি সত্যিকার কাব্যরসিক ছিলেন এ-কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ নেই; তাঁর মনে নাড়া দিয়েছিলো বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম ও ঈশ্বরভক্তি, যার শেষেরটিকে তিনি সম্ভবত ব্রাহ্ম মানসের সঙ্গে এক ক'রে দেখেছিলেন। জগদীশচন্দ্রেরও অন্যতম প্রথম অনুরাগী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানী ছিলেন না, বন্ধুর গবেষণাকে যাচাই ক'রে নেবার সাধ্য ছিলো না তাঁর—তিনি শুধু আশা রেখেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন, অন্ধভাবে বিশ্বাস ও আশা করেছিলেন যে জগতের বিজ্ঞানীসমাজে আধুনিক ভারতকে উত্তীর্ণ ক'রে দিতে পারবেন তাঁর বন্ধু বঙ্গসন্তান জগদীশচন্দ্র। এই বিশ্বাসের মধ্যে মস্ত বড়ো অংশ ছিলো দেশপ্রেমের—কিন্তু দেশপ্রেমের কথা যদি নাও তুলি তবু মানতেই হয় যে এইরকম অন্ধ বিশ্বাস ও সমর্থন পেয়েই প্রতিভাবান বড়ো হ'য়ে ওঠে, বড়ো কাজ করার শক্তি ও ধৈর্য খুঁজে পায়। রবীন্দ্রনাথ যে তা নিঃসংশয় ও নিঃশর্তভাবে অর্পণ করতে পেরেছিলেন, তা লক্ষ্য ক'রে তাঁরই চরিত্রের মহত্ত্বে আমরা মুগ্ধ হই। যেভাবে তিনি অনবরত জগদীশচন্দ্রকে বল ও উৎসাহ জুগিয়ে এসেছেন এবং অর্থ সংগ্রহ ক'রে দিয়েছেন নিজের সম্বল ও ত্রিপুরারাজের ভাণ্ডার থেকে, যেভাবে স্বদেশে ও বিদেশে তাঁর প্রচারের জন্য পরিশ্রম করেছেন, তার

তুলনা বাংলাদেশের অরাজনৈতিক ইতিহাসে খুব বেশি পাওয়া যাবে না। বিদ্যাসাগর মধুসূদনের জন্য যা করেছিলেন তারই পাশে এই বন্ধুতাকে আমরা স্থান দিতে পারি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের—ও সমগ্র দেশের—আশা ও বিশ্বাস কি সফল হয়েছিলো? এই প্রশ্নের সদুত্তর আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা দেবেন; আমরা শুধু, আলোচ্য গ্রন্থেরই সাক্ষ্য থেকে, এটুকু বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়েছিলেন। এই পত্রধারার শেষাংশে উৎসাহ ম্লান হ'য়ে আসছে, শেষের ক-টিতে পারিবারিক খবর ছাড়া বেশি কিছু নেই। যদি বার্ধক্য বা অনবকাশ এর কারণ ব'লে ধ'রে নেয়া যায়, তবু জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ যে-নিবন্ধ লিখেছিলেন তার হতাশাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। যৌবনের কথা স্মরণ ক'রে তিনি বলছেন:

> প্রাণপদার্থ থাকে জড়ের গুপ্ত কুঠুরিতে গা ঢাকা দিয়ে। এই বার্তাকে জগদীশ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পাকা করে গেঁথে দেবেন, এই প্রত্যাশা তখন আমার মনের মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়ে দিয়েছিল—কেননা ছেলেবেলা থেকেই আমি এই ঋষিবাক্যের সঙ্গে পরিচিত—"যদিদং কিঞ্চ জগৎ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং", "এই যা কিছু জগৎ, যা কিছু চলছে, তা প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পমান।" সেই কম্পনের কথা আজও বিজ্ঞানে বলছে। কিন্তু সেই স্পন্দন যে প্রাণ-স্পন্দনের সঙ্গে এক, এ কথা বিজ্ঞানের প্রমাণভাণ্ডারের মধ্যে জমা হয় নি। সেদিন মনে হয়েছিল আর বুঝি দেরি নেই। (১২৫ পৃ)

মনে হয়েছিলো হবে, কিন্তু হয়নি—এ-কথা আর কত স্পষ্ট ক'রে বলা যায়?

সে যা-ই হোক, সাহিত্যিকের ও সাধারণ পাঠকের কাছে এ-বইয়ের প্রধান নায়ক জগদীশচন্দ্র নন, রবীন্দ্রনাথ। এটি প'ড়ে ওঠার প্রথম লাভ রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নিবিড়তর পরিচয়, আর দ্বিতীয়—হয়তো মহত্তর—লাভ এই যে মাঝে-মাঝে তাঁর গদ্যের লীলায় নতুন ক'রে আমরা নন্দিত হই। মানতেই হয় যে মূল পত্রাবলীর মধ্যে অধিকাংশই নীরস, আর তা শুধু সাধুভাষায় রচিত ব'লেই নয়; কোনো-এক রহস্যময় কারণে এই পত্রগুচ্ছ যেন সুবুদ্ধি ও সদ্বিবেচনা থেকেই জন্মেছে, প্রাণের স্পর্শ তেমন ক'রে লাগেনি। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের হালকা চাল, যা 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'

থেকে 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' পর্যন্ত সম্মোহিত ক'রে রাখে আমাদের—সেই কৌতুকে কটাক্ষে ভাবুকতায় মেশা সাবলীলতার চিহ্ন নেই এখানে, সমস্তটাই যেন কর্তব্যপরায়ণতায় গম্ভীর হ'য়ে আছে। যাঁকে লেখা হয় তাঁরও প্রভাব চিঠি এড়াতে পারে না; যেমন 'ছিন্নপত্রে'র লেখক কোনো-এক কালে 'মাতঃ' সম্বোধন ক'রে এক ধার্মিক মহিলাকে কঠোর সাধুভাষায় উপদেশপূর্ণ পত্রাবলী লিখেছিলেন, তেমনি হয়তো তাঁর বিজ্ঞানী বন্ধুর কাছে তাঁর ব্যক্তিত্বের বর্ণিল ও খেয়ালি দিক তিনি প্রকাশ করতে চাননি বা প্রকাশ করার উৎসাহ পাননি। অতএব মূল পত্রাবলীর মূল্য রবীন্দ্রনাথের—ও জগদীশচন্দ্রের—জীবনীর উপাদান হিশেবে, সাহিত্যের স্বাদ না-ই বা আশা করলাম। তবে 'পরিশিষ্টে'র অংশে কিছু-কিছু উদ্ধৃতি আছে, যাতে আমাদের রসের পিপাসা তৃপ্ত হয়, এবং আমাদের রবীন্দ্রনাথকে ঠিক চিনতে পারি। একটি তুলে দেবার লোভ সামলানো গেলো না। দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর মীরা দেবীকে কবি লিখেছিলেন—

> যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধ'রে বার বার বলেচি, আর তো আমার কোনো কর্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার কল্যাণ হোক্। সেখানে আমাদের সেবা পৌঁছয় না, কিন্তু ভালোবাসা হয়তো পৌঁছয়—নইলে ভালোবাসা এখনো টিঁকে থাকে কেন? শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইল...২৯ আগস্ট ১৯৩২।

কী আর বলবো, প'ড়ে পুণ্যস্নান হয়।

এবার বিশ্বভারতীকে নিবেদন করি, 'চিঠিপত্রে'র আগামী খণ্ডগুলির প্রকাশ বিষয়ে তাঁরা যেন শম্বুক-গতি পরিহার করেন। এটা অনুরোধ নয়, দাবি। এর স্বার্থপর কারণ এই যে বর্তমান লেখকের বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ হ'লো, বোধহয় সেইজন্যই মাতৃভাষায় (বা অন্য ভাষায়) পাঠযোগ্য নতুন পুস্তক তাঁর পক্ষে বিরল হ'য়ে আসছে; এবং মৃত্যুর আগে রবীন্দ্রনাথের এ-যাবৎ

অপ্রকাশিত পত্রাবলী পাঠ করা তাঁর একটি অন্তরতম আকাঙ্ক্ষা। আর পরার্থপর কারণ এই যে রাষ্ট্রিক অভিঘাতে বাংলা ভাষার বিপন্ন হবার যে-আশঙ্কা আজ দেখা যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে একটি পরম শক্তিশালী বর্ম হবে এই ভাষায় আরো, আরো সদ্‌গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ এখনো যা দান করতে পারেন তাকে সিন্দুকের ও মুদ্রাযন্ত্রের গহ্বর থেকে বের ক'রে আনতেই হবে—এদিকে তাঁর শতবার্ষিকীও আসন্ন, তাই গয়ংগচ্ছের কোনো মার্জনাই আর নেই।

সর্বশেষে বিশ্বভারতীর সঙ্গে একটি বিষয়ে কলহ না-ক'রে পারছি না। তাঁরা তাঁদের সাম্প্রতিক পুস্তকাদিতে মূল্য উল্লেখ করেন রোমান হরফে (মূল্য 4·00, 2·50 টাকা), এই অনাচারে আমি বিক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। যদি কখনো সারা ভারত রোমান হরফ গ্রহণ করে সে-কথা আলাদা, কিন্তু কিছুর মধ্যে কিছু না—হঠাৎ বাংলা হরফের মধ্যে এই কুশ্রী ছন্দপতন কেন? কোচিন রাজ্যে গিয়ে অবাক হয়েছিলাম এই দেখে যে মলয়ালি ভাষার পুস্তকের পৃষ্ঠাঙ্কগুলি রোমান হরফে মুদ্রিত, পরে শুনলাম সে-ভাষার নিজস্ব কোনো সংখ্যা-চিহ্ন নেই। কিন্তু বাংলা ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি তো বহাল-তবিয়তে বেঁচে-ব'র্তে আছে, এবং আছে 'দেড়', 'আড়াই', 'সাড়ে', 'পৌনে', 'সওয়া'—এই সব আশ্চর্য শব্দসম্ভার, যার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় আছে ব'লে জানি না। ফরাশির মতো সুসভ্য ভাষায় ষাটের পরে সংখ্যার কোনো নতুন নাম নেই; সত্তরকে ওরা বলে ষাট-দশ, নব্বুইকে চারি-কুড়ি-দশ, অনেকটা আমাদের পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মতো। ইংরেজিতেও কুড়ির পর থেকেই কুড়ি-এক, কুড়ি-দুই ইত্যাদি শুরু হ'য়ে যায়। কিন্তু বাঙালির আশ্চর্য প্রতিভা সৃষ্টি করেছে কুড়ির পরে একুশ, পঞ্চাশের পর একান্ন, একশোর আগে নিরেনব্বুই—এমনি সব সুন্দর শব্দমালা। আজ ভারতে দশমিক মুদ্রার প্রচলন হয়েছে ব'লে এই শব্দগুলিকে আমরা ত্যাগ করতে পারি না। তার প্রয়োজনও নেই: 2·50র বদলে আড়াই টাকা লিখলে ভারত-সরকারের কোনো আইন অমান্য করা হয় না। পঁচিশ নয়া পয়সাকে সিকি ও পঞ্চাশকে আধুলি বললে গণিত ও বাংলা ভাষা উভয়েরই মর্যাদারক্ষা হয়—মার্কিনদেশের ভাষাতেও ঐ-রকমভাবেই ব'লে থাকে। মূল্য-নির্দেশে রোমক লিপি অন্য কোনো বাঙালি প্রকাশক গ্রহণ করেননি;

বিশ্বভারতী এটা গায়ে প'ড়ে বা গায়ের জোরে চালাচ্ছেন; তাই তাঁদের কাছ থেকে এই আঘাত আরো বেশি দুঃসহ ব'লে মনে হয়। এটি তাঁরা অবিলম্বে প্রত্যাহার করবেন আশা করি।

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ, অমল হোম। এম. সি. সরকার, ২·৭৫।

'পরম পুরুষ'-এর পর 'পুরুষোত্তম' শুনলে ঈষৎ সন্ত্রস্ত হ'তে হয়—মনে হয় বুঝি এক বিগ্রহের প্রতিযোগীরূপে অন্য বিগ্রহ দাঁড় করাবার চেষ্টা হচ্ছে। আশ্বাসের কথা এই যে বিশেষণটি শ্রী অমল হোম-এর রচনা নয়, এটি কবির প্রতি প্রয়োগ করেছিলেন তাঁরই সমকালীন সুহৃদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। এর ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে আমরা এতই বড়ো মনে করি যে তাঁর নামের আগে কোনো বিশেষণই ভালো লাগে না।

বিভিন্ন সময়ে লেখা কয়েকটি বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ এই পুস্তকে একত্র হয়েছে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে যোগসূত্র বা ধারাবাহিকতা নেই; বইটি কোনো কেন্দ্র খুঁজে পায়নি; নানা মন্তব্য ও তথ্যের সংগ্রহে সমাপ্ত হয়েছে। তবে সবগুলোর মধ্য দিয়েই দুটি অভিপ্রায় আমরা লক্ষ্য করতে পারি: একটি 'মানুষ' রবীন্দ্রনাথের পরিচয় প্রদান, অন্যটি তাঁর সমালোচকদের সমালোচনা। 'কেরানী রবীন্দ্রনাথ' অনেক আগেই পড়েছিলাম; তথাকথিত মার্ক্সিস্ট সমালোচকদের উত্তরে শ্রীযুক্ত হোম দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের জীবন, কেরানির জীবন বিষয়েও অভিজ্ঞ ছিলেন। এই চেষ্টার সাধুতা আমি স্বীকার করি, এর সার্থকতায় আমি সন্দিহান। রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রজীবনে অনভিজ্ঞ ব'লে যখন অভিযোগ করা হয় (এখনো হয় কি?) তার যথার্থ উত্তর, আমার মনে হয়, তাঁকে অভিজ্ঞ ব'লে প্রমাণ করা নয়, উল্টে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা: 'বেশ, ধ'রে নেয়া গেলো দরিদ্রের জীবন তিনি জানতেন না—কিন্তু তাতে কী?' আসল কথাটা এই (এবং এটা বার-বার বলা হ'লেও ক্ষতি নেই) যে সাহিত্যের মূল্য তার বিষয়ে নয়, তার নিজেরই মধ্যে। বিষয় যা-ই হোক, রচনাটা শিল্পের মর্যাদা পেতে পারে কিনা সেটাই আলোচ্য। আর সব কথাই অবান্তর। শ্রীযুক্ত হোম 'প্রেমের অভিষেক' কবিতার বর্জিত অংশ উদ্ধৃত ক'রে তাঁর

নিজের অনভিপ্রেতভাবে প্রমাণ করেছেন কেরানির কথা লিখেও কবিতা কত খারাপ হ'তে পারে। আমাদের ভাগ্যে ঐ আক্ষরিক বর্ণনার অংশ বর্জিত হয়েছিলো, নয়তো একটি ভালো কবিতা ছারখার হ'য়ে যেতো।

'মানুষ রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে শ্রীযুক্ত হোম যা বলেছেন তা এতদিনে বাংলাদেশে অনেকেরই জানা হ'য়ে গেছে—যে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে বহু দুঃখশোক পেয়েছিলেন। কিন্তু এখানেও সেই একই প্রশ্ন আমি তুলতে চাই: যদি তা না-ই পেতেন তাহ'লে কী হ'তো? তাহ'লে কি কবিহিশেবে তিনি খর্ব হতেন, না কি ব্যক্তি হিশেবে হতেন কম ভাস্বর, কম সমৃদ্ধ? অনেকে অনেক দুঃখ পায় কিন্তু কবি অথবা মহৎ মানুষ হয় না; এবং এমন কবিও বিরল নন যিনি ব্যক্তিগত জীবনে উল্লেখযোগ্য দুঃখ পাননি। তত্ত্ব হিশেবে এটা মানা যেতে পারে যে দুঃখ না-পেলে মানুষের ব্যক্তিত্ব পূর্ণবিকশিত হয় না, কিন্তু তার আগে এটা ব'লে নিতে হয় যে পূর্ণবিকাশের দিকে প্রবণতা কোনো-কোনো মানুষের থাকে, অনেকেরই থাকে না। সে-প্রবণতা যাঁর আছে তিনি, গ্যেটের মতো, আপতিক সুখে জীবন কাটিয়েও নিজের দুঃখ নিজে সৃষ্টি ক'রে নেবেন; যাঁর নেই তাঁকে ভাগ্য বহু দুঃখ দিলেও সব দুঃখই নিষ্ফল হবে। অতএব দুঃখ পাবার প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্রনাথকে অবতীর্ণ করার প্রয়োজন নেই; 'অভিজ্ঞতা' শব্দটিও সাবধানে ব্যবহার্য। জীবনে আমাদের যা-কিছু ঘটে সেটাই তো অভিজ্ঞতা নয়; ঘটনাকে আমরা নিজের মধ্যে রূপান্তরিত করতে পারলে তবেই সেটা অভিজ্ঞতা হ'য়ে ওঠে। এই রূপান্তর যে মায়াবলে ঘ'টে থাকে তাকেই মানুষ সৃষ্টি-প্রতিভা নাম দিয়েছে। কবির কাজ জগৎকে বদলানো নয়, নিজেকে বদলানো—তাঁর জীবন ভিন্ন তাঁর উপাদান নেই, এবং সে-জীবন শেষ পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে এক হ'য়ে যায়। যে-দুঃখ বাইরে থেকে আসে, যা আমাদের হাতের বাইরে, নির্বাচনের বাইরে, তার উপর কোনো নীতিতত্ত্ব দাঁড় করানো সম্ভব নয়। আমরা তথ্য হিশেবে জানি যে রবীন্দ্রনাথের বহু শ্রেষ্ঠ রচনায় (বিশেষত গানে) তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখের স্মৃতি প্রবেশ করেছে; কিন্তু যদি তিনি বহু আত্মীয়বিয়োগের ব্যথা না পেতেন, তাহ'লেও তিনি অমর কাব্য লিখতেন, এই সত্যকে মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারি না। বীণা ছিলো তাঁর অন্তরে,

যে-কোনো হাওয়ায় বেজে উঠতোই। ঝরা পাতাই পুড়ুক, আর দামি রেশমই পুড়ুক, আগুন একই রকম লাল।

বইয়ের শেষ—ও সবচেয়ে সম্প্রতি-রচিত—প্রবন্ধের নাম 'সাম্প্রতিক রবীন্দ্র-সমালোচনা'। এখানে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য—নামটা প্রকাশ করতে দোষ নেই—শ্রী শিবনারায়ণ রায়ের কতিপয় মন্তব্য। শিবনারায়ণ প্রশ্ন তুলে-ছিলেন, বিশ্বসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান কত উঁচুতে, নাট্যকার হিশেবে ইউরিপিডিস, শেক্সপীয়র, মলিয়ের বা ইবসেনের তিনি সমতুল্য কিনা, ঔপন্যাসিক হিশেবে ডস্টয়েভস্কি, টলস্টয় বা টমাস মান্-এর, এবং তাঁর কাব্যেও সেই 'অতলস্পর্শী অভিজ্ঞতা' আছে কিনা, যা আছে র‍্যাঁবো, রিলকে বা ইয়েটস-এর শ্রেষ্ঠ রচনায়। এ-সব প্রশ্নের সোজাসুজি জবাব দেবার চেষ্টা না-ক'রে শ্রীযুক্ত হোম নানা য়োরোপীয় লেখক থেকে উদ্ধৃতির শরণ নিয়েছেন। ফলত এক-রকমের হার মেনে নেয়া হয়েছে। উক্ত লেখকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা হ'তে পারে না এ-কথা শিবনারায়ণ প্রমাণ করতে পারেননি, তবু তাঁর কথার যদি সদুত্তর দিতে হয় তাহ'লে কোনো ভিক্টরীয় ইংরেজ লেখকের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তা পারা যাবে না; তা করতে হবে যাকে বলে সম্মুখযুদ্ধে অর্থাৎ রবীন্দ্র-কাব্যের 'অতলস্পর্শিতা' প্রমাণ ক'রে। সেই কাজটি শ্রমসাপেক্ষ ও সময়সাপেক্ষ; বাংলাদেশে কোনো-একদিন তা সাধিত হবে আশা করা যাক। ফাদার পিয়ের ফালঁর প্রত্যুত্তরে (শ্রীযুক্ত হোমের শেষ অস্ত্র) সারবত্তা আছে; এবং আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে রবীন্দ্রনাথকে 'রবিঠাকুর' বলা আজকের দিনে রীতিমতো অশিষ্টাচার। এ-কথাও তিনি ঠিক বলেছেন যে 'শান্তি ও সমন্বয়'কে অবাস্তব ব'লে ভাবাটা হাস্যকর, কিন্তু শিবনারায়ণ যদি যৌবনসুলভ দর্পবশত কিছু হাস্যকর কথা ব'লে থাকেন, প্রবীণ শ্রীযুক্ত হোমও তাঁর সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়েছেন এ-কথা ইঙ্গিত ক'রে য়ে ইয়েটসের মহত্ত্বের উৎস 'গীতাঞ্জলি'। রবীন্দ্রনাথের পাশে ইয়েটস 'দাঁড়াতে পারেন না' এ-কথা লিখতে গিয়েও তাঁর কলম কেঁপে যাওয়া উচিত ছিলো। এ-মুহূর্তে আমি কোনো তর্কের মধ্যে যেতে চাই না, কিন্তু এ-কথা মানতেই হয় যে, সব অত্যুক্তি ও অবিচার সত্ত্বেও, শিবনারায়ণের সাহিত্যচেতনা আধুনিক, এবং যদিও তিনি শেক্সপীয়রের সঙ্গে এক

আসনে মলিয়েরও ইবসেনকে বসিয়েছেন, তবু অন্তত তিনি এমন কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য লেখকের নাম করেছেন যাঁদের আবেদন এ-যুগের মানুষের কাছে সুতীব্র, আধুনিক বিশ্বমানস যাঁদের মধ্যে গভীরভাবে বিম্বিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুবিচারের আগ্রহে এঁদের খর্ব করার চেষ্টা কখনো কোনো রবীন্দ্র-ভক্ত যেন না করেন।

এবার আসি এ-বইয়ের সবচেয়ে দামি অংশে। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পরে রবীন্দ্রনাথ 'স্যর' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন, সেই পুরোনো ঘটনার বিস্তারিত ইতিহাস, বহু উল্লেখ ও উদ্ধৃতি সহযোগে, লিপিবদ্ধ করেছেন ব'লে শ্রীযুক্ত হোমকে ধন্যবাদ জানাই। এই আমরা প্রথম জানলাম যে ১৯১৯ এর ডিসেম্বরে, ঐ হত্যাকাণ্ডের অনতিপরে এবং তারই ঘটনাস্থল অমৃতসরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাতে উপাধিত্যাগের জন্য রবীন্দ্রনাথকে সৌজন্য-সম্মত অভিনন্দন জানাবার প্রস্তাব কিছুতেই পাশ করানো যায়নি। পাশ করানো দূরে থাক, বহু চেষ্টা ক'রেও উত্থাপন করানো যায়নি—যদিও সভাপতি ছিলেন মোতিলাল নেহরু এবং উপস্থিত ছিলেন বাংলার ও ভারতের বহু স্বনামধন্য লোকনায়ক। এই বিবরণ প'ড়ে বেদনার সঙ্গে নতুন ক'রে বোঝা গেলো রাজনীতি ব্যাপারটা কত নোংরা—আর সে-নোংরামি থেকে দেশপ্রেমিক মহাত্মারাও দূরে থাকতে পারেন না। শ্রীযুক্ত হোমের ভাণ্ডারে সম্ভবত আরো অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জমা আছে; সেগুলি তিনি অবিলম্বে প্রকাশ করুন, এই অনুরোধ জানাই। আর-একটি অনুরোধ, ভবিষ্যতে তাঁর গ্রন্থকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে প্রশংসাপত্রে মুড়ে না দেন।

নিরিবিলি, নরেন্দ্রনাথ মিত্র। ক্যালকাটা বুক ক্লাব, দু-টাকা।

শ্রী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের পাঠকসংখ্যা আজ বিপুল, কিন্তু এ-বইখানা প'ড়ে (বা দেখে) আজকের দিনের কম পাঠকেরই সন্দেহ হবে যে এর প্রণেতা ও তাঁদের প্রিয় কথাশিল্পী একই ব্যক্তি। মলিন চেহারা, মুদ্রণে যত্ন নেই, অখ্যাত লেখকেরও উপন্যাসে যে-রূপসজ্জা নিয়ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, খ্যাতিমানের কবিতার বইয়ে তা জুটলো না। বহিরঙ্গ ছেড়ে ভিতরে ঢুকেও পাঠকের মনে

হবে যে রচনাগুলি কোনো তরুণ কবির প্রথম অঞ্জলি; অন্তত, যিনি গল্পে-উপন্যাসে এত পাকা কথা ও বাঁকা কথা বলতে পারেন তিনিই যে এই সরল, হ্রস্ব ও কৈশোরের বিষাদে-ছোঁয়া কবিতাগুলি লিখেছেন তা অনুমান করা সহজ হবে না কারো পক্ষে। তবে, কোনো তীক্ষ্ণধী পাঠক হয়তো ভূমিকার কয়েকটি পংক্তি থেকেই গল্পশিল্পীকে চিনে ফেলতে পারবেন।

কিন্তু আমাদের এই কাল্পনিক পাঠকের অনুমানই ঠিক: সত্যই এ-বইটি এক তরুণ কবির প্রথম নিবেদন, 'দশ থেকে কুড়ি বছর' আগেকার লেখা। স্বকাল পেরিয়ে বেরিয়েছে, এবং লেখক (ভূমিকার কয়েক লাইন প'ড়ে বোঝা যায়) নিজেও তা জানেন। নরেন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে গল্পের পাশাপাশি কবিতাও লিখতেন; আমি কয়েকবার 'কবিতা'য় তাঁর রচনাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম; কবি হিশেবে পরিণতির সম্ভাবনা, সেকালের অন্যান্য উদ্যোক্তাদের তুলনায়, তাঁর মধ্যে কম ছিলো বলা যায় না। কিন্তু, দেশে-বিদেশে বহু লেখকেরই যেমন ঘ'টে থাকে, যুগের ও জীবিকার পক্ষে অধিক উপযোগী গল্পশিল্পই কালক্রমে তাঁর সমগ্র শক্তিকে গ্রাস ক'রে নিলে। রচনাগুলির বিষয়ে মন্তব্য করতে সংকোচ বোধ করছি। এদের মধ্য দিয়ে যে কবি-মন উঁকি দিচ্ছে তার বলিষ্ঠ ও পরিণত প্রকাশ তাঁর কথাসাহিত্যে দেখেছি আমরা। তাঁর সেই সংশয়হীন সার্থকতার পাশে এই বইটি তাঁর তারুণ্যের একটি স্মারক ও সাক্ষী হ'য়ে রইলো। আমাকে একবার চাঁইবাসায় এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনি কি এখনো কবিতা লেখেন?' 'এখনো'—মানে, যৌবন গত হবার পরেও? উত্তরচল্লিশেও আমার এই ছেলেমানুষির অবসান ঘটেনি জেনে আমার প্রশ্নকর্তার মুখে করুণা ও অবজ্ঞা মেশানো হাসি ফুটেছিলো। উনিশ শতকী ইংরেজ গল্পলেখক পীকক্ও বলেছিলেন যে বুড়ো বয়সে ঝুমঝুমি নিয়ে খেলা করা যেমন হাস্যকর, সভ্যতার অগ্রসর যুগে মানুষের পক্ষে কাব্য-চর্চাও তেমনি। কিন্তু সেই ছেলেমানুষের মাধুর্য ও তার অবসানের শোচনীয়তা বিষয়ে আলোচ্য লেখকেরই একটি চতুর মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করি:

যৌবন

পাপড়ি-মেলা শ্বেতপদ্ম
ভোরের রোদ লাগা
চায়ের পেয়ালা।
তামাটে পানীয়
কবোষ্ণ রূপালি ধোঁয়া ওঠে।

ঠোঁটে
এক এক বার ছুঁই
আর চেয়ে চেয়ে দেখি
কি করে ফুরোয়।
এক এক বার থামি
আর চেয়ে চেয়ে দেখি
কি করে জুড়োয়।

এই রকম চাতুরী আরো অনেকগুলি রচনায় প্রকাশ পেয়েছে, কোনো-কোনোটি জাপানি কবিতাকে মনে করিয়ে দেয়। প'ড়ে ভালো লাগলো।

বু. ব.

সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর: বুদ্ধদেব বসু। সহকারী সম্পাদক: নরেশ গুহ। কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত ও ১৪১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-১৩ মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড-এ মুদ্রিত।

কবিতা
পৌষ-ফাল্গুন, ১৩৬৪
বর্ষ ২২, সংখ্যা ২
ক্রমিক সংখ্যা ৯২

ইংরেজির প্রয়োজন

১

সকল প্রদেশেই ইংরেজীর স্থানে মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হবে, সরকারী কাজও তাতে চলবে—এই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু প্রচলিত রীতির আমূল পরিবর্তন হঠাৎ করা যায় না, দরকার evolution, revolution নয়। লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য আমাদের আগ্রহ থাকবে, সুকল্পিত চেষ্টাও থাকবে, কিন্তু লাফ দিয়ে কিছু করতে গেলে বিভ্রাট হবে।

সকল উন্নত দেশেই শিক্ষার আর জ্ঞান প্রচারের বাহন মাতৃভাষা, কিন্তু অন্যান্য ভাষা থেকেও উপকরণ আহরণ করা হয়। যাঁরা বর্তমান বাঙলা ভাষাকেই সর্বার্থকাধক মনে করেন তাঁরা হয়তো বলবেন, বেশী লোকের ইংরেজী শেখবার দরকার কি, অল্প কয়েকজন প্রতিভাশালী লোক ইরেজী শিখুক, ফরাসী জার্মান রুশ প্রভৃতিও শিখুক এবং নিজের আহৃত জ্ঞান সাধারণের জন্য বাঙলা ভাষায় প্রচার করুক। কিন্তু বর্তমান বাঙলা ভাষার প্রকাশশক্তি পর্যাপ্ত নয়, দক্ষ লোকের সংখ্যাও অল্প। অনভিজ্ঞ অপটু লোকে বিদেশী জ্ঞান ও ভাব (knowledge and ideas) বাঙলায় প্রকাশের চেষ্টা করলে তার ফল প্রায় বিকট হয়, বিজ্ঞান শিল্প পাশ্চাত্য দর্শন রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ক বাঙলা রচনায় তার উদাহরণ নিত্যই দেখা যায়। আমাদের পরিভাষার অভাব আছে, কিন্তু তাতে বিশেষ বাধা হয় না। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ইংরেজী পরিভাষা অবলম্বনে বাঙলায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যান দিতেন, ছাত্রেরা মুগ্ধ হয়ে শুনত। পরিভাষার চাইতেও বেশী অভাব উপযুক্ত বাগ্‌ধারা বা ইডিয়মের, তা গড়ে উঠতে সময় লাগবে। অবশ্য জনকতক লেখকের যথোচিত ক্ষমতা আছে, কিন্তু

তাঁরা সংখ্যায় অল্প। জনসাধারণকে যদি প্রধানত অপটু লেখকের রচনা থেকে জ্ঞানার্জন করতে হয় তবে তার ফল ভাল হবে না। অতএব এখনও বহু লোকের সরাসরি ইংরেজী (এবং অন্যান্য বিদেশী) ভাষা থেকে জ্ঞান আহরণের প্রয়োজন আছে। কালক্রমে বাঙলা ভাষার প্রকাশশক্তি বৃদ্ধি পেলে অন্য ব্যবস্থা হতে পারবে।

পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় এদেশের লোকের জ্ঞানের পরিমাণ খুব কম, অন্ধ সংস্কার খুব বেশী। এই তিমিরাচ্ছন্ন অবস্থা দূর করবার জন্য এখনও বহুকাল বহু লোকের ইংরেজী চর্চার প্রয়োজন আছে। ইংরেজী এখনও আমাদের জ্ঞানের প্রধান দ্বার, তা রুদ্ধ করলে অগ্রগতি নষ্ট হবে।

সংবিধানের ৮ম তফসিলে ১৪টি ভাষার মধ্যে সংস্কৃত আছে, ইংরেজী নেই। ক্ষেত্রবিশেষে সংস্কৃতের উপযোগিতা আছে, যেমন অক্সফোর্ড-প্রদত্ত লাটিন মানপত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষণ দিয়েছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত কারও মাতৃভাষা নয়। তথাপি তফসিলে স্থান পেয়েছে কেন? সংবিধানের ৩৫১ অনুচ্ছেদে আছে—...to secure its (হিন্দির) enrichment... without interfering with its genius, by drawing wherever necessary for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages। অর্থাৎ সংস্কৃতের প্রয়োজন শব্দের ভাণ্ডার হিসাবে। ইংরেজীরও সেই প্রয়োজন আছে। স্বয়ং নেহরু বলেছেন, international (=ইংরেজী) পরিভাষাই যথাসম্ভব যথাযথ নেওয়া উচিত। কিন্তু শুধু পরিভাষা নিলেই চলবে না, ইংরেজী ভাব আর বর্ণনাপদ্ধতিও বাঙলা ভাষায় আনতে হবে, অবশ্য 'without interfering with its genius।' তা ছাড়া ইংরেজীভাষী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা সংখ্যায় নগণ্য নয়। অতএব, যে-কারণে সংস্কৃত তফসিলভুক্ত হয়েছে সেই কারণ (বা ততোধিক) ইংরেজীর বেলাতেও খাটে।

রাজশেখর বসু

২

ইংরেজের শাসন শেষ হবার পর ইংরেজীর প্রয়োজন শেষ হবে না কেন, এর উত্তরে ছুটি মাত্র জোরালো যুক্তি আছে। তার একটি হচ্ছে: ইংরেজের উত্তরাধিকারী যদি সব ভারতীয় হয়ে থাকে তবে ইংরেজীর উত্তরাধিকারী সব ভারতীয় ভাষা। একা হিন্দী নয়। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মে সব ভারতীয় ভাষাই ব্যবহার করতে হবে। কেবল হিন্দীকে নয়। তা যতদিন সম্ভব না হয়েছে ততদিন সকলের প্রতি সুবিচারের অনুরোধে ইংরেজীকেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মের ভাষা হিসাবে রাখতে হবে। "ততদিন" মানে "চিরদিন" নয়। কিন্তু কতদিন তাও বলা কারো সাধ্য নয়। এর জন্যে সবাইকে ডেকে আপোসের চেষ্টা করা যেতে পারে। অধিকাংশের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার নাম আপোস নয়।

দ্বিতীয় যুক্তিটি হচ্ছে: দেশ তিন শ' বছর পেছিয়ে ছিল বলেই পরাধীন হলো। পরাধীনতা ঘুচেছে, কিন্তু পেছিয়ে থাকাটা পুরোপুরি ঘোচেনি। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানী, রাশিয়া ও ফ্রান্স যে-পরিমাণে আধুনিক, ভারত সে-পরিমাণে আধুনিক এখনো হয়নি। হতে আরো অনেকদিন লাগবে। সেই দিনটিকে এগিয়ে আনতে হলে যা যা করতে হবে তার একটি হচ্ছে ইংরেজী নামক একটি অগ্রগামী ভাষার ঘোড়ায় চড়ে বিশ্বের আধুনিকতম চিন্তার সঙ্গে বাজি রেখে দৌড়নো। ঘোড়া বদলের সময় এখনো আসেনি। মধ্যস্রোতে ঘোড়া বদল করা মূর্খতা। ইংরেজীর চাপে ভারতীয় ভাষাগুলির বিকাশ হয়নি বলে যে-নালিশ উঠেছে সেটা নাচতে না জানলে উঠানের দোষ। সে নালিশ অন্যের মুখে সাজতে পারে, বাঙালীর মুখে সাজে না। ইংরেজীর চাপে নয়, ইংরেজীর সঙ্গে গভীরতর পরিচয়ের ফলেই বাংলা সাহিত্যের বিকাশ অন্যের চেয়ে দ্রুত হয়েছে। এ পরিচয় ক্ষীণ হলে বাংলা সাহিত্যের নেতৃত্ব ফুরিয়ে আসবে। সংখ্যাবৃদ্ধি বা কলেবরবৃদ্ধি তো শ্রীবৃদ্ধি নয়। সেদিক থেকে ভাবনার কারণ না থাকতে পারে, ঐশ্বর্যের দিক থেকে আছে। সুতরাং আর যারা যে-সিদ্ধান্তই নিক আমরা কখনো এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেব না যার ফলে

আমাদের সাহিত্যের নেতৃত্বহানি ঘটবে। মধ্যস্রোতে ঘোড়াবদল আমাদের জন্যে নয়। সরকারী ভাষা যাই হোক না কেন আধুনিকতার ভাষা ইংরেজীই থাকবে, এবং সে ভাষায় আমাদের অরুচি ধরবে না। তার সঙ্গে গভীরতম পরিচয়ের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে, যদি বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যতের জন্যে আমাদের তেমন উচ্চাভিলাষ ও জল্পনাকল্পনা থাকে।

না। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে আপোসের অবকাশ নেই।৮

অন্নদাশঙ্কর রায়

দুটি কবিতা

মৃণালকান্তি

অপূর্ব

উৎসর্গ : শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুকে

সে ধুলোয় করে সোনা, সকালে মুঠো-মুঠো সোনা ছড়ায়।
কী মায়াবী-মন্ত্রে ওই মেঘ হয় পাখি, পাথর গলায়,
নিপুণ হাতে মাটি ছেনে মূর্তিগড়ে,—দূরের আলো আনে—
মাটির মায়ায় বাঁধে দূরের প্রাণ, বাঁধন-ছেঁড়া কঠিন আঘাত হানে।

সে আছে সবখানে, তবু পায় না কেউ তাকে—
রোদ বৃষ্টি ফুল ঝরায় : অসীম রূপে আপন রূপ সে ঢাকে।
দিনের শেষে শহরতলির অন্ধগলির শুদ্ধ এই মোড়ে,
অপূর্বের পাই পরিচয় ধুলোয়, নির্জন আলোর অক্ষরে॥

বিপ্রলব্ধ

সে আমারে বেঁধেছে কী কঠিন বাঁধনে।

নিরন্তর সে বন্ধনে আনন্দ-প্রসাদ পাই মনে,
সৌম্য এই দিনের প্রহরে, হৃদয়-সমুদ্র থৈ-থৈ—
প্রাণ-মন্ত্রে অমৃত-ভাষণে আমি জপি নাম তার।

বিরহবিষণ্ণ লোকে করি কভু নিঃসঙ্গ বিহার।
চেয়ে-চেয়ে দেখি ; নদী মাঠ সুদূর শহর ছবি
ওপারের পাহাড়ের নীল—
কী আশা, বেদনা বোনে এই চেনা
আঞ্চলিক আমার নিখিল।

রৌদ্র ঝরে—দুপুর গহন হয় শুদ্ধ ধ্যানাসনে
বিশাল সুনীল ছন্দে, আমি একা-একা
বেদনা-আভায় আঁকি বঞ্চিতের রূপ ক্ষণদেখা।
বেলা যায়—কনে-দেখা আলোয় আকাশে ফোটে
কার ছায়ামুখ :
সে যে আমি, রাত্রির সাম্রাজ্যে ফিরি সন্ধ্যা-লগ্নে
সূর্যের উজ্জ্বল শরে রক্তঝরা বুক।

নিষিদ্ধ দিক

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

সব দিকে, শুধু শোন যাসনে দক্ষিণে—
দীর্ঘ বনে ঘোরে এক বহুবর্ণ হাওয়া;
হঠাৎ সবুজ বৃক্ষ আলোকিত শাদা।
একটি আকাশ থাকে মন্ত্রতন্ত্র-জানা
যে যায় জ্যোৎস্নায় তার দুই চক্ষু বেঁধে
বলে, সপ্তরঙ আনো দীর্ঘ বন ঘুরে।

সব দিকে, শুধু তুই যাসনে দক্ষিণে।

আমি তো যাইনি শোন দক্ষিণের হাওয়া
কাল মৃদু অন্ধকারে নিজে এসেছিল।

একটি প্রশ্নের উত্তরে

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

ঘরে নেই ; বাইরে, আড়ালে
হয়তো উপুড়-করা নেশার হাঁড়িতে
দু'ফোঁটা তোমার ঋণ। হঠাৎ তাকালে
জাগায় সুখের ভয় নাড়িতে-নাড়িতে।

এ যেন নিজের প্রেম আরেক হৃদয়ে
দেখে না-চিনতে পারা। বালকের-দলে
কখন, হয়েছো লুট জ্বর-বিনিময়ে—
পেয়েছি লজ্জা, ভয়, তোমার বদলে।

তাহ'লে কোথায় তুমি? ঘরের ভেতরে
অলীক, আলগা রং দেয়ালে-দেয়ালে ;
আমি তো ভুলেই আছি ; যার মনে পড়ে,
সে শুধু একটি মোম প্রাণপণে জ্বালে॥

রাত্রির আরক

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

'উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এত দেখিনি কখনো'
পরস্পর সকলেই বলে;
তাঁর দৃপ্ত পদক্ষেপে অহেতুক দ্বিধা নেই কোনো,
সুদূর স্বর্গীয় আভা সৌম্য মুখে জ্বলে।

টুকরো ছোটো কথাগুলো, ফুলকির মতো,
ছড়ায় প্রেরণা, আলো, নিরলস কর্মীদের মনে ;
(তাঁর স্মৃতিস্তম্ভে লোকে কল্পনার ফুল দেয় কত),
হাততালি দিলে পাখি ত্রস্ত হ'য়ে উড়ে যায় বনে।

একরাশ নিজস্বতা ; তাকেও জারিত করে রাত্রির আরক :
বৌ পাশে নিয়ে শুলে বাচস্পতি সেও বিদূষক।

এজরা পাউণ্ডের দুটি কবিতা

নিউ ইয়র্ক

আমার নগরী, আমার প্রিয়া, আমার শুভ্রা, আহা তন্বা,
শোনো, শোনো আমার কথা, আমি সুর দিয়ে করবো তোমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা
বাঁশির নরম সুর হ'য়ে এসো আমার কাছে!

এখন আমি কি ভাববো যে আমি পাগল হ'য়ে গেছি,
কারণ এখানে লাখ দশেক লোক যানবাহনে খিটখিটে হ'য়ে রয়েছে,
এ তো কুমারী নয়,
আমার বাঁশি থাকলে আমি তা বাজাতেও পারতুম না।

আমার নগরী, আমার প্রিয়া,
তুমি তন্বী, কিন্তু স্তনহীনা,
তুমি তন্বী, রুপোর বাঁশির মতো।
শোনো আমার কথা, এসো আমার কাছে!
আর আমি সুর দিয়ে করবো তোমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা,
আর তুমি হবে চির অমরী।

নর্তকী মূর্তি

কাজল-চোখ
হে আমার স্বপ্নের মেয়ে,
তোমার পায়ে হাতি-দাঁতের চটি.
নর্তকীদের মধ্যে কেউ তো নেই তোমার মতো,
কেউ নেই এমন লঘুচরণা।

আমি তোমাকে তাঁবুগুলোতে খুঁজে পাইনি,
ভাঙা-ভাঙা অন্ধকারে।
তোমাকে খুঁজে পাইনি কুয়োতলায়
কলসি হাতে যে-সব মেয়েরা আছে তাদের ভেতর।

তোমার বাহু দুটি যেন বাকলের তলায় দুটি চারাগাছ;
তোমার মুখখানি যেন আলো-জলা নদী।
বাদামের মতো শাদা তোমার দুটি গ্রীবা;
যেন সদ্য ছাড়ানো হয়েছে দুটি বাদাম-খোসা থেকে।
তারা তোমাকে পাহারা দিচ্ছে না খোজা দিয়ে;
তামার গরাদ দিয়েও নয়।

তোমার বিশ্রামের স্থানটি নীলচে সবুজ পাথর আর রুপোতে খচিত
সোনার জরি দিয়ে বিচিত্র ছাঁচে বোনা বেগনিরঙের বসন জড়িয়েছ দেহে,
আহা নাথাট ইকানাঈ, 'নদীতীরের গাছ'।

ঘাসপাতার বনে ক্ষীণ জলস্রোতের মতো তোমার হাত দুটি আমার গায়ে;
তোমার আঙুলগুলি যেন তুষারে ঢাকা ঝর্না।

তোমার সখীরা শাদা, নুড়ি-পাথরের মতো,
তাদের সংগীত তোমাকে ঘিরে!
নর্তকীদের মধ্যে কেউ তো নেই তোমার মতো;
কেউ নেই এমন লঘুচরণা।

অনুবাদ: গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

শার্ল বোদলেয়ার অবলম্বনে
এক প্রতিভাস

বুদ্ধদেব বসু

১ : ছায়ারা

বন্দী আমাকে করেছে কুটিল নিয়তি,
একলা, অতল গহ্বরে যাপি যন্ত্রণা,
আলোর গোলাপ কখনো দেয় না সান্ত্বনা,
অন্ধ, বিকট রাত্রির নেই বিরতি।

আমি যেন অভিশপ্ত, নিঃস্ব চিত্রকার ;
পট নেই, শুধু ছায়ার উপর বুলোই তুলি,
রেঁধে খাই নিজ হৃৎপিণ্ডেরই তন্তুগুলি,
আর কোনো ভোজ নেই এ-খিন্ন বুভুক্ষার।

মাঝে-মাঝে এক লাবণ্যময় গরিমা
দেখি যেন এই অমার দেয়ালে এলিয়ে আঁকা,
মুখশ্রী তার প্রাচ্য, ধূসর, স্বপ্ন-মাখা :

পূর্ণ রেখায় জেগে ওঠে যেই প্রতিমা,
উল্লাসে, ভয়ে শিউরে তখনই চিনতে পারি—
ছায়াচ্ছন্ন, অথচ দীপ্ত, এ-ই সে নারী !

২ : সুগন্ধ

পাঠক, বলুন দেখি, কোনোদিন পুরোনো গির্জায়
যেখানে ধূপের ধোঁয়া মালা গাঁথে, আঁধার বাতাস,
কিংবা কোনো পুরাতন কস্তুরীর সঞ্চিত মূর্ছায়
নিয়েছেন, অলস লিপ্সায় ভরা, বিহ্বল নিশ্বাস ?

এই সেই মায়াজাল, যার গুণে, আর যা হবে না—
সে দেয় নেশায় ভ'রে আমাদের ক্ষণিক এখন—
যেমন প্রিয়ের দেহে নুয়ে-নুয়ে প্রেমের সাধনা
প্রণতির ভঙ্গিমায় দেয় শুধু স্মৃতিরে তর্পণ।

তার নীল, নিবিড় চুলের ঘোর অন্ধকার থেকে
(যা ছাড়া এ-ঘরে আর নেই ধূপ, গন্ধের আধার)
বিড়ালের ধূমল বিলাসী ঘ্রাণ পড়ে ঝেঁকে-ঝেঁকে।

আর তার যৌবনে গর্ভিণী হ'য়ে, কোমল, মসৃণ,
অঙ্গের পরশে ভরা বসনের রেশম, মসলিন
ছড়ায় লোমশ, ক্রূর শ্বাপদের সৌরভসম্ভার।

৩ : ফ্রেম

বিজ্ঞাপনে বিমুখ যদিও শিল্পী, তবুও ছবির
গৌরব বাড়িয়ে দেয় সোনালি ফ্রেমের প্রতিবেশ—
সেই মতো, জানি না কী অদ্ভুতের মদির আবেশ
দেয় তার রূপেরে, বিলাস-বিম্ব (বিশ্বপ্রকৃতির

বিশাল বিস্তার থেকে ছিন্ন ক'রে)—ধাতু, রত্ন, দ্যুতি,
আভরণ, আবরণ। মিশে যায় তরল হিল্লোলে
সে নিজে, সবার মধ্যে, অলংকারে, স্ফুরিত অঞ্চলে
জড়িয়ে ছড়ায় তার শোণিতের গোপন আকূতি।

অনেকে বলে, সে-মেয়ে ভেবেছিলো সব উপচার
তার প্রেমে মোহমান। নগ্ন তার অঙ্গের পরশে
চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে রেশমের গভীর লালসে,

সাটিনের চুম্বনের প্রস্রবণে। তাই ভঙ্গি তার—
চলা, ফেরা, শরীরের অফুরন্ত নতুন সংবাদ—
পেয়েছে শিশুর কান্তি, বানরের আদিম আহ্লাদ।

৪ : ছবি

বিদ্যুতে ভরা আগুনে আমরা জলেছিলাম,
ঐ গাঢ় চোখ—কামের কোমল উৎস,
এবং হৃদয়-ডোবানো ঠোঁটের কী পরিণাম ?—
ব্যাধির বিকার, মরণের চিতাভস্ম !

প্রবল পুলক, সূর্যের মতো দীপ্তিময়,
চুম্বনধারা, ধুতুরার মতো তীব্র—
কোনখানে তার উপসংহার ?—হায়, হৃদয় !
শুধু তিনরঙা ক্ষীণ এক রেখাচিত্র

নির্জনতায় ক্রমশ মলিন আমারই মতো ;—
পাখা ভেঙে পড়ে দিগন্ত জুড়ে সন্ধ্যা
বৃদ্ধ কালের প্রহারে মর্মাহত—

শিল্পের আর প্রাণের পিশুন হন্তা !
—যা ছিলো আমার গৌরব, সুখ, মুগ্ধ প্রীতি
তুমিও নেবাতে পারবে না সেই দীপ্ত স্মৃতি।

অব্যক্ত

প্রফুল্লকুমার দত্ত

এখনো অনেক রাত শহুরে গলিতে ঠাসা ! মেঝের ওপর
নিঃসাড় ঘুমিয়ে তুমি : প্রচণ্ড ঝড়ের পরে প্রশান্ত সাগর
মগ্ন ঘন নীল ঘুমে। সারা ঘর ম্লান ক'রে কেরোসিন-বাতি
লাল চোখ নিয়ে জাগে, কালিপড়া চোখ ; আর আমি ওরই সাথী
তুষানল জেলে মনে জ'লে মরি রাতভর—যাবার সময়
হয়নি এখনো, তবু ঘুমিয়ে থাকার মৃত লগ্ন এটা নয় !

ঐ তোর শীর্ণ দেহ ! পশুহিংস্র নখ দাঁত কত যে ধারালো !
নিশাচর তারা। তুমি রক্তের জোয়ারে আনো সকালের আলো :
বিশ্বের অভয় মন্ত্র ! তারপর স'রে যাও পর্দার আড়ালে।
চকচকে লোলুপচক্ষু বাঘেদের—সারা বনে দাবানল জ্বালে ;
হরিণীরা ছুটে আসে তোমারই পশ্চাতে—হবে তুমিও হরিণী ?
খাণ্ডবদাহন যজ্ঞে আমি তো কখনো হাতে গাণ্ডীব ধরিনি।

ঘুমাও ! ঘুমাও তুমি ! জেগে র'বো আমি পাহারায় ;
আমার নিশ্বাসে যেন ভয় পেয়ে কেঁদে উঠে অব্যক্ত কান্নায়
চোখ ঢেকে লুকিয়ো না। যাবার সময় হ'লে যাবোই। একাকী
মেরুদণ্ডে পৃথিবীটা আর-একটু ঘুরুক, ব'সে ততক্ষণ থাকি—
এখনো অনেক রাত। কেরোসিন-বাতি-মৃত-গন্ধ-অন্ধকার :
বেসুরো হাওয়ায় ডেকে তোমাকে আজকে আমি জাগাবো না,
জাগাবো না আর।

পথ চলে যে-লোকটা

আনোয়ার পাশা

ব্যস্ত হ'য়ে পথ চলে যে-লোকটা আমি তাকে চিনি।
হাটে, মানুষের ভিড়ে, পাটের কারবারে গঞ্জে, তাকে প্রতিদিনই
দেখা যাবে নগ্নপদে—বিড়ির টুকরো চেপে ঠোঁটে,
নৈশ ব্যবসায়ে কিছু প্রসন্নতা হয়তো বা জমেছে ললাটে।
জুটেছে স্তাবক বহু, নিষিদ্ধ পাড়ায় আনাগোনা,
মৃৎপাত্রে ফেনায়িত স্বদেশী পানীয় আনে অন্য সম্ভাবনা
জীবনের নিত্য রাতে; আর তার চোখের পাতায়
কালিমা-আল্পনা আঁকা রাত-জাগা সুখের ছোঁওয়ায়।

এই প্রভাতের রৌদ্রে পথে-চলা ঐ যে পথিক—
নিতান্ত নগণ্য, আছে পৃথিবীর এককোণে অখ্যাত অচেনা,
জীবনে সে পৃথিবীকে, মানুষের সভ্যতাকে কিছুই দেবে না।
অজানা দেউলে যেন প্রদীপ সে জ্বলবে ক্ষণিক,
একদিন নিভে যাবে। তবু এই সৃষ্টির সীমায়
তার শূন্য স্থানটুকু ভ'রে দিতে অবিকল তার মতো অন্য কেউ নাই॥

দুটি কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী

হৃদয়-ভূমি

যখন অসহ্য হয়, হে মার্কিন, তোমারি প্রত্যহে
খুঁজি জনতার শান্তি, তোমার অগণ্য পথচারী
সহজ সহাস্য ব্যস্ত তৃপ্তি দেয়, কফির দোকানে
বসি কোণে, বই পড়ি, ডুবি ভিড়ে, অতিথির বুকে
ঢেউ দিয়ে সৌহার্দ্যের স্নিগ্ধ চেনা নামে বারবার,
রোধ করে, মুছে দেয়, রাষ্ট্রজ্বালা; পাড়ার লণ্ড্রিতে
কারো চোখে অহেতুক করুণা, কোথাও কানে ঠেকে
স্মিত কণ্ঠে চলতি দান, ভাগ্য মানি এও আমেরিকা।
যে-তীব্র বারুদ-ভরা বিশ্বজোড়া অন্ধতার জালে
প্রতিযোগী রূঢ় দ্বন্দ্বে ঘিরেছে তোমারো প্রতিনিধি
আশঙ্কিত নরলোক, কৌশলী সমর-সাংবাদিক
স্পর্ধিত তোমার নামে আতঙ্ক-রেডিয়ো সমবায়ী
ঢালে যুগ্ম যে-প্রচার, তারি কেন্দ্রে তবু তারি পারে
নির্মল সংসারে যুক্ত তোমারি ঘরের নরনারী
কল্যাণ উত্তর আনে, ট্যাক্সি-অলা সুরসিক জানে
ঘটনারহস্য, ব্যাঙ্কে প্রসন্ন কেরানি ভদ্রতায়
বহু লজ্জা ঢেকে দেয়; নির্লজ্জ আণব মৃত্যু-দূত
জাতিধর্ম ধ্বজা তুলে যেখানে যতই সংঘ বেঁধে
বিদ্বেষে হানুক দেশ, স্বার্থের ভবিষ্য বেচে লোভে
যূথবদ্ধ যুবকের হাতে দিক মারণাস্ত্র:—শুনি,
গির্জা-ঘণ্টা, দেখি নব্য বিবাহিত যুগল আলোয়

মন্ত্র পড়ে শূন্য ঘরে, আনন্দ আত্মীয় ঘেরা ; পথে
স্কুল-বাস্ থেকে নামে দলে-দলে দৌড়ে ছেলেমেয়ে
ঘরের উৎসুক চোখে ; এই তো মার্কিন ; গলি-মোড়ে
বাঁকা টুপি প'রে ঐ হট্-ডগ্ বেচে মস্ত হেসে
ওর ভঙ্গি দ্যাখো, দেশী, সর্বদেশী সেও ; অন্য যারা
প্রহরে-প্রহরে মূঢ় বাঙ্ময় বিস্তার দিয়ে ভাবে
লুপ্ত ক'রে দেবে কোটি মহাচীন জনানী জাগৃতি,
তাদেরো ভুলতে পারি—(চাতুরির বাক্য-দরে তারা
মানুষের ইতিহাস-ভাগ্য জানে করে ওঠা-নামা,
স্বর্গ মর্ত মুষ্টিগত সুনিশ্চয় ইচ্ছার মর্জিতে ;
বিপুল সত্যকে নিয়ে রাষ্ট্র মল্ল-খেলা)—হোক তাই,
হৃদয়ে মার্কিদেশ মার্কিনেই করি আবিষ্কার ॥

সম্বিৎ

জগৎ সংসার চ'লে যায়
যম নেয় প্রাণ—
রেখে দিই লুকিয়ে
তবু একরত্তি।
চোখে দিনের সোনা,
কানে ভোরের আহ্বান,
অদৃশ্য দেহের গাঁঠ-বাঁধা
বেঁচে থাকার সত্যি
—একরত্তি।
প্রাণের বেশি সেই প্রাণ ॥

সরস্বতী

মৈত্রেয়ী দেবী

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু ও শ্রীমতী প্রতিভা বসুর করকমলে

নীলচক্ষু দীর্ঘ দেহ মানুষের গলায়
আদিম বনের তলায়
সরস্বতীর ধূম্রপ্লাবিত তীরে
দেবী বাক্ মন্ত্রসম্ভবা।
জ্যোতিষ্কের সভা থেকে চ্যুত, আকাশগঙ্গার মতো
অলক্ষ্য অবিরত, ধারা তার
ব'য়ে নিয়ে আশ্চর্য সম্ভার
রন্ধ্রচারী গোপন ভ্রমণে
মনে-মনে
নিতান্ত অহেতু
বেঁধে চলে সেতু।

এতে কি রহস্য নেই—
যে-নদী সেতু সেই ?
যে প্রবাহিত অজ্ঞাত পথে
অদৃশ্য জগতে
সেই নদী বার্তা বহে
কার কথা কারে কহে—
শতমুখে শতমনে চূর্ণীকৃত, ফেনায়িত গতি
দেবী সরস্-বতী।
মাটিতে পাথরে চাপা বোবা ভাবনায়
চৈতন্যের মূঢ় ধ্বনি জন্তুর কান্নায়

সেই আর্তনাদে
ভ'রে তোলে আশ্চর্য সংবাদে
সৃষ্টি তার মৃতসঞ্জীবন
দেহহীন ছায়াহীন স্বরের গগন।
সে সরস্ যদি ফল্গু হয়
অহল্যা মরুতে কাঁদে মানুষের ব্যর্থ পরিচয়।
যে-কথা শোনাতে চায় যুগ-যুগান্তর
মাটিতে পাথরে লেখা বোবা কণ্ঠস্বর
যে আমার স্পর্শহারা আশা
তোমার মননে দেবে ভাষা
অখণ্ড অনন্ত ধ্বনি তারি
স্বর্গচ্যুত জহ্নুকন্যা শুভ্র প্রজ্ঞাবারি ॥
চিন্তার আবর্তে দিয়ে পাক
মন্ত্রোদ্ভবা স্রোতস্বিনী বাক্
চলে দূরান্তরে
গেঁথে-গেঁথে অন্তরে-অন্তরে
প্রবালে খচিত কথা বলা
সুন্দরী প্রবলা।

ঋষিকে দিয়েছে জ্ঞান
দৃষ্টি অন্তর্মুখী,
প্রিয়কে করেছে সুখী
ইন্দ্রজাল-বিছানো ভাষায়
কান্নাকে করেছে গান
শত শোক ভরেছে আশায়
বঞ্চনার ছুরি-বেঁধা রক্তের প্রবাহে

কামনার দাহে
কখনো প্রমত্ত হয় লীলা।
শব্দ আর অর্থে বাঁধা মন্ত্রময়ী ইলা
ধরা দেয় শত মূক মনে
গূঢ় স্বপ্নে ধ্যানের বন্দনে।
কখনো ভূষণ তার অরণ্যমেখলা
কখনো আতপ্ত সোনাগলা
নিত্য সে বিচিত্রদেহা তবু তার অখণ্ড স্বরূপ
সৃষ্টি করে মানুষের সর্বগামী রূপ।
আদিম প্রভাতে যার রক্তস্রোতে পশি
স্পন্দিত ক্রন্দসী,
সে স্পন্দন আজো নেমে আসে
শব্দময় ছড়ানো আকাশে,
নূতন তরঙ্গে নামে নবীন ভঙ্গিমা,
অর্থের শিকলে গাঁথা ছোটো-ছোটো সীমা
পার হ'য়ে আসে লঘুভার
ধ্যানময় মনোলোক
তোমার আমার।
ভ'রে ওঠে প্রাণের নিশ্বাসে
অন্তর্গূঢ় শুদ্ধ ইতিহাস,
অচৈতন্য অন্ধকার হ'তে
উদ্ভিন্ন বীজের মতো দেখা দেয় ভাবের জগতে।
প্রচ্ছন্ন প্রবাহ তার আবর্তিত হলে
মনের মিছিল নিয়ে চলে,
প্রজ্ঞামতী
অখণ্ড অচ্ছিন্ন বাক্
নদী সরস্বতী।

ল্যাবরেটরি

গোপাল ভৌমিক

দাঁড়ালে যদি দুয়ারে এসে
থাকো সেখানে, চেয়ো না হেসে
ঢুকতে ঘরে বন্ধ দুয়ার ঠেলে :
বিষের বাষ্প এখানে ডানা মেলে
প্রতিনিয়ত করছে আনাগোনা—
স্বরূপ ঢাকে সোনালি জাল বোনা।

বর্ণলীলায় মুগ্ধ হ'য়ে যদিই এসে থাকো
দেখো না তাই বাইরে থেকে, দুয়ারে হাত রাখো।
ভিতরে এসে কী লাভ হবে বলো!
দর্শকের ভূমিকা নিয়ে চলেছো পথ চলো
অযথা কেন বিষের ধোঁয়া শুঁকে
অকালে প্রাণ হারাবে ধুঁকে-ধুঁকে ?

আমি যে আছি প্রশ্ন যদি করো
বলবো আমি বিষের চেয়ে বড়ো
এমন কিছু পেয়েছি এই ঘরে
মরণজয়ী হয়েছি তার বরে।
অনেক মৃত্যু পেরিয়ে যাবার এষণা থাকে যদি
এখানে এসে মিলতে পারে ঈপ্সিত সম্বোধি।

দুটি কবিতা

ছায়া-বিলাস

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সতীশের মৃত্যু হ'লো, জিভ দিয়ে চেটেছিল শ্বেতবর্ণ বিষ।
আমরা সব বেঁচে আছি ঠিকঠাক কী আশ্চর্য, দেখ হে সতীশ,
ব্যস্ত হ'য়ে কাজ করি উদ্ভিদের মতো এক লেবরেটরিতে
রোদ্দুর মেশাই দেহে প্রতিদিন, ঝ'রে যাইনি বর্ষা কিংবা শীতে।

তোমার নবোঢ়া পত্নী কিস্তি হারে শেলাইয়ের কল কিনছে কাল
অশ্রান্ত ঘর্ঘর শব্দ টুকরো কাটা ছিটকাপড় নানান জঞ্জাল
রোজ তাকে ঘিরে থাকবে, সময়ের দাম পাবে গুনে বারোমাস,
আমিও এক-একদিন হঠাৎ হয়তো করবো চায়ের ফরমাশ।

এক হাত টেনে তার রেখা গুনে ভবিষ্যৎ বানাবো নির্ভীক,
কপালে অশেষ দুঃখ, বললে, তুমি টিকটিকির সঙ্গে মিশে বলবে ঠিক ঠিক ;
ফোটো হ'য়ে ঝুলে থাকবে, হা সতীশ, নাকের উপর বসবে মশা
নিতান্ত ডাক্তারি মতে আমি ও তোমার পত্নী করবো শোয়া-বসা।

আমাকে ছুঁয়েই হয়তো তোমার মৃত্যুর কথা বলবে একদিন
তোমার জীবন ছিল কী শীতল, প্রত্যহের অস্তিত্ববিহীন।
পিঁপড়ের মতন তুমি জীবনকে খুঁটে-খুঁটে চেয়েছো বাঁচাতে
রমণী-শরীর ঘিরে চামচিকের মতো শুধু জেগে উঠতে রাতে।

এই সব কথা শুনে আমিও তখন উঠবো ক্লান্ত তিক্ত মনে
নিজেকে রজকপোষ্য চতুষ্পদ মনে হবে বাইরের নির্জনে।

দীর্ঘ কালো ছায়া পড়বে স্বল্পালোকে চকচকে পিচ-বাঁধা পথে
কার ছায়া ? আমারই তো,—ব'লে আমি মিশে যাবো সশরীরে
অদৃশ্য জগতে।

শেষ যাত্রী

শেষ ট্রেন ছেড়ে গেছে, এখন এ প্ল্যাটফর্মে আমরা সকলে
হাঁটু গুঁজে ব'সে থাকবো, সারারাত আলো জলবে স্থির
শ্মশানযাত্রীর মতো ঘুম চোখে বিস্মৃতির শান্ত কৌতূহলে
প্রাচীন মূর্তির সাজে আমরা সব ব'সে থাকবো অস্পষ্ট, গম্ভীর।

শেষ ট্রেনে কারা গেল, আমাদেরই মাসতুতো, পিসতুতো ভায়েরা,
রাত্রির পোষাক প'রে বাঙ্কে চেপে এতক্ষণে ঘুমুচ্ছে আরামে
চিরকাল ঘড়ি বেঁধে ঠিক ট্রেনে চেপে সুখে চ'লে যাবে এরা
পৃথিবীর সব দ্রব্য অনেক যাচাই ক'রে কিনে নেবে ঠিক-ঠিক দামে।

আমরা সব ট্রেন ছেড়ে প্রতিদিন প্ল্যাটফর্মে থাকবো ক'জন
পাখির নখের মতো গায়ে বেঁধে তীক্ষ্ণধার শীতের বাতাস,
ঘুরঘুরে পোকার মতো হকারেরা একে-একে লাভের হিসেবে দেবে মন
শহরের গৃহস্থেরা রাত্রির পরম ব্রত মানবে বারো মাস।

স্টেশনের কিছু দূরে ব্রিজ, তার নিচে এক রাত্রি-জাগা নদী
শীতল নিশ্বাস নেয়, আমারও বুকের মধ্যে অন্ধকার জল
আহা ঠিক এ-সময়ে এক ভাঁড় চা পেতাম যদি !

পাওয়া গেল, টাকার খুচরোয় কিছু ঘাটতি হ'লো, তিনটে অচল।

দুটি কবিতা

শকুন

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

মাজ্যর দুপুরে ফাঁকা নীলকুঠি-সাহেবের মাঠে
পরিত্যক্ত শবের সংকারে নামে প্রস্তুত বাহিনী।
ত্রুটিহীন সমবায়-প্রচেষ্টা তাদের : অচিরেই
শেয়াল, ময়াল কিংবা ভিন্নদেশী বজ্জাত মেয়ের
অন্ত্র, মাংস, হৃৎপিণ্ডের অনুজ্জ্বল রক্তাক্ত গলির
তাবৎ বিস্ময় তারা ঠেলে দেয় স্বগত জঠরে।

সংসারের চোখে নয়, নয় কোনো তান্ত্রিক নির্দেশে,
ইন্দ্রিয়ের মৌলিক প্রজ্ঞায় জানে সত্য সারাৎসার :
লক্ষ-লক্ষ মদির মাছির ভোগ্য গলিত দেহের
শ্রেণী নেই, জাতি নেই, দেশ নেই ; মৃত্যুর প্রতিভা
শবের আবহে দেয়. পবিত্র, প্রবল আকর্ষণ।
তাই নামে ঝাঁকে-ঝাঁকে কুঠিয়াল সাহেবের মাঠে—
সর্বত্র আদৃত প্রাণ, অপ্রাণের প্রেমিক তারাই।

আমিও অপ্রাণ আজ, হে উদাত্ত, উদার সংহতি,
নেমে এসো ; নির্জীব পুঁটির মতো দু'চোখ আমার
উপড়ে নিক প্রখর উজ্জ্বল চঞ্চু ; নির্ভীক নখরে
ছিন্ন করো শীতল রক্তের পিণ্ড ; দেহের সুষমা
খণ্ড-খণ্ড ক'রে দেখো কত লক্ষ বছরের বিষে
নীল হ'য়ে আছে প্রেম, করুণা, মমতা ॥

পোড়াকপাল

(কোনো প্রবীণ কবির প্রতি)

কপালটা তার সবাই খারাপ বলে!
নইলে সে কেন কবি?
তা না হ'লে সেও সচ্ছল সুখী হ'তো,
তার জীবনের হলুদ বকুল-ডালে
সফলতা হ'তো ফুল।

কপালটা তার খারাপ হ'তেও পারে!
নইলে সে কেন প্রেমিক?
কেননা প্রেমিক মাত্রই জলে পোড়ে;
যদিও সুচির অন্তর্জ্বালা নিয়ে
আকাঙ্ক্ষিতাকে পাবে না সে-পোড়াকাঠ।

কপালটা তার খারাপ সুনিশ্চিত!
নইলে সে কেন জানে?
কেননা জানার বেদনায় ভূপাতিত
সে জেনেছে ভূমি-শয়নে আরাম নেই।

অবশ্য এই যন্ত্রণা থেকে সেও
নির্বাণ পাবে সংসারে একদিন।
তবুও তখনো মুক্তি দেবে না তাকে
নির্দয়, নীল, মানুষের ইতিহাস॥

চিঠি

রবীন্দ্রনাথ সেন

তোমাকে লিখবো চিঠি
মনে-মনে কতদিন ভাবি,
লেখা তবু হয় না আমার;
স্মরণের সাঁকো পার হ'য়ে
এসে দেখি, অনেক অনেক স্বপ্ন
কবে যেন, আমিও জানিনে,
জ'মে-জ'মে
হ'য়ে আছে সীমাহীন কথার পাহাড়।
তারি এক পাশে
রক্তাক্ত সূর্যের শেষ হয়।
সূর্য কি আবার জন্ম নেবে?
সূর্যকরোজ্জ্বল পাখি আবার কি আসবে এখানে?

এই প্রশ্ন নিয়ে—
অতীত সমুদ্রপারে
যেখানে এখনো দেখি ঝড়ের সংকেত জেগে আছে,
তারি একধারে
আমি আজো ব'সে আছি
সূর্যের পায়ের শব্দ শুনবো, আশা ক'রে।

তুমি নেই
আমি জানি, অনেক দূরের পথে তুমি;
কতদূরে? সেই পথ আমি
আমার মনের ম্যাপে খুঁজি—খুঁজি

রাত্রিদিন, অবরুদ্ধ শহরের
খণ্ডিত আকাশপথে। নক্ষত্রের মতো
তুমিও যে আসোনি এখনো
অসংখ্য আলোক-বর্ষ পার হ'য়ে আজো,
এ-নীল রাত্রির অন্ধকারে।
তোমারো কি মৃত্যু হ'লো, কখনো ভেবেছি,
নিরুদ্দেশ নক্ষত্রের মতো ?—
আলো যার আসেনি কখনো,
আলো যার
আসবে না আর।

মানে নেই,
এ-কথার কোনো মানে নেই।
তুমি শুধু এইটুকু জেনো—
কোনোদিন কোনো এক বিবিক্ত সন্ধ্যায়
তোমার বিষণ্ণ অবসরে
পাখি যদি গেয়ে ওঠে গান
পাখিকে কোরো না ভুল তুমি ;
খাঁচার পাখির গানে, গান নয়,
সমস্ত আকাশ।

একটি মন্দির

অর্চন দাশগুপ্ত

এখানে সময় শান্ত, ইতিহাস গ্রামান্তের মাঠে
অকস্মাৎ থেমে গেছে—শিবালয়ে দুপুরে নির্জন,
অদ্ভুত আঘ্রাণে ভারি বিগ্রহের ধ্যানস্থ ছায়ায়।

(শিশ্নের প্রতীকী পূজা ? অন্ধকার জৈবিক বিস্ময় ?)

মাটিকে পবিত্র জানি, দেবতার গৃহের মাটিও,
যদিও বিশ্বাসী নই, মানুষের বৈরাগ্য ও প্রেম
মন তবু ছুঁয়ে যায়, নিঃশব্দে দাঁড়াতে ভালো লাগে।

(পাথরের স্পর্শে যেন উষ্ণ কোনো নরম শরীর !)

আহার মৈথুন নিদ্রা : জীবিকার মূল্যমান, আর
দিনান্তে গেরুয়া ক্লান্তি সন্ধ্যায়িত, জানালার ধারে
রাত্রির আকাশে ব্যাপ্তি, কবিতার শুদ্ধ অবকাশ :

মধ্যপদী জীবনের সচ্ছলতা আপাতসহজ।

নিজেরও অজ্ঞাতে তবু একবিন্দু শূন্যতার নীলে
রৌদ্রের চূড়াতে বিদ্ধ এ-মন্দির গূর্জর গ্রামের ॥

সাগরপারে

মানসী দাশগুপ্ত

এখানে ফাগুন মাথায় বরফটুপি
বুড়ো সেজে থাকে রঙচোরা বহুরূপী।
গাছে-গাছে নেই কানাকানি চুপিচুপি,
স্তব্ধ নিঝুম। পাতা-ঝরা মাঠ শাদা।
তুষারস্তূপের জলে চলাপথে কাদা।
সারা বসন্ত আশা নিয়ে বুক বাঁধা:
কখন গ্রীষ্ম আসে।

নব উত্তাপে নতুন প্রাণের সাড়া,
পুরোনো মাটির শিকড়ে লাগায় নাড়া
যারা ভুল বুঝে দূরে গিয়েছিল তারা
যদি ফিরে ভালোবাসে!

(অতল সাগর তোমার আমার মাঝে,
এপারে-ওপারে ঢেউয়ের আঘাত বাজে।
দুরাশারও আর আশ্রয় মেলেনা-যে!)

আবহ

Roger Woledge
প্রিয়বন্ধুবরেষু—

শান্তিকুমার ঘোষ

সেই সব পরদেশী আজ দূরে চ'লে গেছে।
ঝরনায় বেগ নেই, ঝরে না তরল আলো ফোয়ারার জলে।
বিগত বছরে লীন বিপণি-সম্ভার মেলা, কাচের আধারে মদ,
সিম্ফনিক ঢেউ;
কম্পিত বন্দর সেতু মাতালের চোখে:
মেয়েদের ঝাঁক যত চকচকে মাছ।

শিখরে তুষার-শিল্প—কুয়াশায় বনভূমি।
গত বছরের রাশি-ঝরা পাতা, লাল ঘাস
কচিৎ পায়ের শব্দ, প্রেমিকের শূন্য দৃষ্টি—স্মৃতির বিস্তার:
আঁধারে বিচ্যুত শিলা, শিলাজতু, হাওয়ার চীৎকার।

বাগানে যন্ত্রণা এত—অন্তহীন সেতুগড়া, চিত্রের যোজনা
আপাতসংলগ্ন বস্তু, শব্দরাশি, ভ্রষ্ট প্রেম
অঙ্গার নক্ষত্রচূর্ণ, সমুদ্র সবুজ সব উদ্ভিদের ভার।
সমস্ত সুষমা ক্ষীণ কেমন সংগতিহারা
জলের দর্পণে এক ছায়ার বিকৃতি।

কয়েকটা মাত্র ফুল তবুও যথেষ্ট ছিল প্রেমিকের কবে:
বুঝতে চেয়েছে মন নিশ্বাসের ছন্দ কার, স্পর্শ অভিঘাত—
তুচ্ছ কথা অর্থহীন মুহূর্তে বা অসামান্য হয়;

সার্কাসে বালক-বীর আরেক আলোয় যার উদ্ভাসিত মুখ ;
প্রমিনাড বীথিকায় বসন্তবাতাস আর সমুদ্রের গান।

একটি নক্ষত্র হ'লে সমস্ত সম্পূর্ণ হ'তো এই দৃশ্যভূমি :
একটি হৃদয় পেলে জীবন সংগীত হ'তো সহজ মধুর :
একটি নক্ষত্র হ'লে···

স্পন্দিত ধ্বনির রেশ অন্তিম দূরত্বে লীন।
আগামী-অতীত দুই ঢেউ দুই দিকে :
মাঝে কি অনন্ত কাল
যেখানে অস্তিত্ব প্রেম ব্যথার তীব্রতা॥

অভিজ্ঞানবসন্ত

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

শিয়রে বসন্ত আসে পাতাঝরা শুরু হ'লে পর,
হাওয়ার তরঙ্গে মগ্ন হৃদয়ের শীত-সহচরী
প্রজাপতি-বর্ণ দিয়ে শরীরকে করে গাঢ়তর
আশ্লেষ-শিখায় জ্বলে বাসনার প্রতীক সে নারী।

দুটি শ্বেত পদ্মকলি জলেডোবা আধেক উন্মুখ
শুভ্র আকাঙ্ক্ষার ফুল, ঢেকে রাখে দুটি নীল ঢেউ
প্রায় স্বচ্ছ আবরণে, শরীরী রহস্যে ঘেরা বুক
তৃষ্ণার প্রদীপ জ্বালে, সে-আগুন নেভায় না কেউ।

এই সব গূঢ় কথা চৈতন্যের নদীতে যখন
মৃদু ছলছল স্বরে অন্তরঙ্গ রেখা-ঢেউ বোনে
আমি তাকে ডেকে বলি : 'তোমার আত্মার কাছে মন
আরো কিছু আশা নিয়ে যাবে ; না কি সমাপ্তি এখানে ?'

উত্তর দেয় না কিছু, অতল সাগর-ঘেরা চোখে
অপলক চেয়ে থাকে, তারপর কান্নার জোয়ারে
আচমকা ভেঙে পড়ে, সহমর্মী অস্তিত্বের শোকে
অন্ধকার ফিরে যায় নিশীথের নিষ্কম্প্র শরীরে॥

ইংরেজি ও মাতৃভাষা

'ইংরেজির জন্য মাতৃভাষা ব্যাহত হয়েছে আমাদের, সাহিত্যের বিকাশ হ'তে পারেনি।' 'ইংরেজি শিখে আমাদের চরিত্র নষ্ট হয়েছে, দেবদ্বিজে ভক্তি নেই, নারীরা সতীধর্মে জলাঞ্জলি দিয়েছেন।' 'ইংরেজির উচ্ছেদের জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন চাই, নয়তো তা এ-দেশে মূলবিস্তার করবে।' 'বিদেশী ভাষার মুঠো থেকে মুক্তি না-পেলে ভারতবর্ষীয় বিপ্লব সার্থক হবে না—কংগ্রেস দ্বিধাগ্রস্ত কেন?'

এই মন্তব্যগুলি আমার মন-গড়া নয়, সম্প্রতি কাগজে পড়েছি বা বক্তৃতায় শোনা গেছে। এর প্রবক্তারা প্রায় সকলেই রাজনীতির ব্যবসায়ী। এই একটি বিষয়ে, চরম বাম ও চরম দক্ষিণে ভেদ রইলো না, বিপ্লবী ও সনাতনী মন মিলিত হ'লো। এঁদের মধ্যে যাঁদের কাছে সাহিত্য নামক বিষয়টাও আলোচ্য, তাঁরা বলছেন রামমোহন রায় ভ্রান্তিপ্রচার ক'রে গেছেন, বাংলা ভাষার আধুনিক সাহিত্য একটি ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা, বলছেন রবীন্দ্রনাথ ভেজাল, মঙ্গলকাব্যই খাঁটি। এ-সব কথায় বিচলিত হবার প্রয়োজন হ'তো না, যদি না এর পিছনে থাকতো একটি রাজনৈতিক সংকল্প, সারা দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের উচ্চাশা।

ধ'রে নেয়া যাক রবীন্দ্রনাথ ভেজাল, আর মঙ্গলকাব্যই খাঁটি। তাহ'লে, আমরা মানতে বাধ্য, চসার শেক্সপীয়র ইত্যাদিরা অপলাপ মাত্র, ইংলণ্ডের অকৃত্রিম সাহিত্য 'বেওউলফ'-এই সাঙ্গ হ'য়ে গেছে। মানতে বাধ্য, পুশকিন থেকে পাস্টেরনাক পর্যন্ত রুশ সাহিত্যে যা-কিছু ঘটেছে সবই জঞ্জাল, শ্লাভনিক ভাষার লোকসাহিত্যই একমাত্র খাঁটি রাশিয়ান। এইভাবে, খাঁটির পিছনে ছুটতে-ছুটতে, শেষ পর্যন্ত বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যকে বর্জন না-ক'রে উপায় থাকবে না, কেননা ভৌগোলিক ভারতে সংস্কৃত ভাষাও বৈদেশিক আমদানি আর তাকে নিয়ে এসেছিলো একদল শ্বেতাঙ্গ বিজেতা।

গবেষকের কথা আলাদা, কিন্তু ভোক্তার কাছে ইংরেজি সাহিত্যের চসারই আদিপুরুষ, যেমন রুশ সাহিত্যের পুশকিন। এঁরা দু-জন মাতৃভাষার সাহিত্যে

মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, তাকে জন্মান্তর বললে ভুল হয় না। এই জন্মান্তর কেমন ক'রে সম্ভব হয়েছিলো? বিদেশী প্রভাবে, বিদেশী প্রেরণায়। যা ছিলো কুয়াশাচ্ছন্ন, সুদূর একটি দ্বীপ, সেই ইংলণ্ড, নর্ম্যান বিজয়ের পর থেকে, হ'য়ে উঠলো য়োরোপের অংশ, গ্রীক-লাটিন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী, বিশ্বের হৃৎস্পন্দনে চঞ্চল। সেই সময়ে ফরাশি ভাষা ও লাটিন সংস্কৃতির অভিঘাত না-ঘটলে, ঐ ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন দ্বীপ শেক্সপীয়রকে প্রসব করতে পারতো না; রেনেসাঁসের বিরাট বীজময় ঝড় উত্তরসাগরের উপকূল থেকে সেইভাবেই ফিরে যেতো, যে-ভাবে, য়োরোপের পূর্বপ্রান্তে, রাশিয়ার তুষার-পুঞ্জকে দখিন হাওয়া গলাতে পারেনি। অবশেষে যখন বিশ্ব-ইতিহাসের সীমান্তে রাশিয়ারও অভ্যুদয় হ'লো, তখন তার সনাতন গুণ্ঠন যাঁরা ছিন্ন করলেন তাঁদের মধ্যে পীটার দীক্ষা নিয়েছিলেন স্বদেশের বাইরে, আর ক্যাথারীন ছিলেন জাতে জর্মান আর ভাবনায় ভলতেয়ার-ভক্ত। অথচ দেশের চিত্ত তাঁদের ডাকে সাড়া দিতে কুণ্ঠিত হ'লো না; অচিরেই, তার প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক লক্ষণ ত্যাগ ক'রে, রুশ সাহিত্য বিশ্বের হ'য়ে উঠলো। সে-ই তো পুশকিন, 'ভেজাল' রাশিয়ান, বায়রনের চেলা, কাফ্রি হানিবালের বংশধর। পুশকিনের পিছনে যা ছিলো তা কোনো দৈশিক আদর্শ নয়—ছিলো ফরাশি ভাষা, আর সেই ভাষার মধ্য দিয়ে পশ্চিম য়োরোপের সাহিত্য, তার ব্যক্তিবাদ, রোমান্টিক মন, তার উত্তর-রেনেসাঁস জঙ্গমতা।

ইতিহাসের একটি প্রবচন এই যে গ্যেটের আগে জর্মন সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিলো না। 'অস্তিত্ব ছিলো না'—এ-কথা অবশ্য আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়, কিন্তু গ্যেটের পূর্ববর্তী জর্মন সাহিত্য একান্তভাবে জর্মনির ছিলো ব'লেই পুরোপুরি সাহিত্য হ'তে পারেনি। গ্যেটে যা করলেন তা একাধারে আবিষ্কার ও সমন্বয়; শেক্সপীয়র, রুসো ও প্রাচীন গ্রীসকে একসূত্রে গ্রথিত করলেন তিনি; মধ্যবয়সে দুই বছর ইটালিতে কাটিয়ে নূতন ক'রে নিলেন নিজেকে; জর্মনিকে দান করলেন আবহমান য়োরোপ, এবং য়োরোপকে এমন এক জর্মনি, যা সারা উনিশ শতক ভ'রে, বিরাট ও বহুমুখী সৃষ্টিশীলতায় জগতের বিস্ময় হ'য়ে

উঠলো। এবং, সকলেই জানেন, গ্যেটের বিশ্বস্তর মন য়োরোপীয় সীমানার মধ্যেই তৃপ্ত থাকেনি, আর 'বিশ্বসাহিত্য' সূত্রটিরও তিনিই জনক।

ইবসেন, জগতের চোখে নরোয়েজীয় আত্মার প্রতিভূ, তিনিও শুধু দৈশিক সংস্রবে বেড়ে ওঠেননি। সাতাশ বছর ধ'রে তিনি প্রবাসী ছিলেন ইটালিতে ও জর্মনিতে, আর এই সাতাশ বছরই তাঁর মহত্তম নাট্যসমূহের রচনাকাল। তাঁকে দেশত্যাগী হ'তে হয়েছিলো—কোনো অস্বাভাবিক বিদেশপ্রীতির প্রকোপে নয়, নির্বাধ আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষায়। এই কারণে, তাঁর আগে ও পরে, আরো অনেকেই প্রবাসী হয়েছেন, বা হ'তে চেয়েছেন ; পুশকিন, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও, রাশিয়ার বাইরে যাবার অনুমতি পাননি। ইবসেন অনুভব করেছিলেন, আর তিনিই প্রথম অনুভব করেছিলেন, যে তাঁর স্বদেশের সংকীর্ণ প্রটেস্টান্ট-সমাজে চিত্তের স্বাধীনতা নেই। তৎকালীন নরোয়ের অপরিসর প্রাদেশিকতায় তাঁর পাত্রপাত্রীরাও পীড়িত ; 'প্রেত' নাটকের প্রবাস-প্রত্যাগত নায়ক যখন প্যারিসের 'জীবনানন্দে'র উল্লেখ করে তাতে আমরা যা শুনতে পাই, তা যুবকোচিত প্রমোদলিপ্সা নয়, তা বৃহতের জন্য, বিশ্বের জন্য, মুক্তির জন্য হাহাকার। ইবসেনের মনে এই বেদনা তীব্র ছিলো ব'লেই, গ্যেটের সঙ্গে জর্মনি বা পুশকিনের সঙ্গে রাশিয়ার মতো, তাঁর মাতৃভূমি তাঁরই সঙ্গে জগৎ-সভায় প্রবেশ করলে।

যা চিত্তের সৃষ্টি তাতে রাসায়নিক বিশুদ্ধতা অসম্ভব। চিত্তের ধর্ম সংক্রাম; সৃষ্টির ধর্ম সংশ্লেষণ। কোনো মানুষের মন বিকশিত হয় না, যতদিন তার উপর দিয়ে অনেক ঝড় ব'য়ে না যায়, অনেক মিশ্রণ, আন্দোলন, আক্রমণ। নিজের পরিবার, গ্রাম বা গোষ্ঠীর মধ্যে একান্তভাবে বেড়ে উঠলে কোনো মানুষ বেড়ে উঠতেই পারে না, তার প্রকাশ হয় খণ্ডিত, তার ব্যক্তিত্ব পর্দানশিন। এই কথা জাতির বিষয়েও সত্য। সেই দেশই মলিন হ'য়ে থাকে, বিদেশের সঙ্গে যার বিনিময় নেই। এর চরম উদাহরণ আমাদের পাশের দেশ আফগানিস্তান। ইরান, প্রাচীন কালে 'আর্য' সভ্যতার একটি কেন্দ্র, আধুনিক কালে স্থাবরতাকে বরণ ক'রে সেও কেমন স্থবির হ'য়ে গেলো।

বিনিময়ের অভাব যদি ভৌগোলিক কারণে ঘটে তাহ'লে বলা যায় যে গুণ্ঠনের উন্মোচন শুধু সময়সাপেক্ষ। ইতিহাসের ধারায় রাশিয়া ও জাপানের প্রবেশ যে এত দেরিতে হ'লো তার একটি প্রধান কারণ নিশ্চয়ই তাদের প্রাক্কালীন দুর্গমতা, মানচিত্রে প্রান্তিক পরিস্থিতি। কিন্তু বিচ্ছেদের কারণ যদি হয় রক্ষণশীলতা, আত্মম্ভরিতা বা শুচিবায়ুগ্রস্ত মনোভাব, যদি কোনো জাতি নিজের একটি দেশীয় ঐতিহ্য কল্পনা ক'রে নিয়ে তাকেই সর্বস্ব ব'লে ধ'রে নেয়, তাহ'লে নিশ্চয়ই সেই দূষিত অবস্থার চিকিৎসা প্রয়োজন।

ভারতের ইতিহাস যেদিন আরম্ভ, তারপর থেকে বহুকাল পর্যন্ত সমগ্র জগতের সঙ্গে নাড়িতে-নাড়িতে যোগ ছিলো তার। অনুকূল ছিলো ভূগোল ; উত্তরে গিরিসংকট আর অন্য তিন দিকে সমুদ্র-পথে অবারিত ছিলো বৈদেশিক অভিযান। সেটা সাংসারিক অর্থে দুর্ভাগ্য হ'তে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক হিশেবে সৌভাগ্যই বলবো। যুগে-যুগে বিদেশী আগন্তুক ঝড় তুলে গেছে এই মহাদেশের উপর দিয়ে ; আর তারই ফলে, অনেক ত্রাস, অনেক ভাঙন ও অনেক বিনিময়ের মধ্য দিয়ে গ'ড়ে উঠেছে এই বহুমিশ্রিত মহাজাতির জীবন। একান্তরূপে নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে ভারতীয়েরা কখনোই থাকেনি বা থাকতে পারেনি ; এমনকি 'নিজেরা' বলতে ঠিক কী বোঝায় তাও এ-ক্ষেত্রে আলোচনাসাপেক্ষ। দ্রাবিড়, আর্য, নিষাদ, কিরাত ; শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত ; নিগ্রো, মঙ্গোলীয়, অস্ট্রিক—মানবজাতির এতগুলো ধারা যেখানে মিলেছে সেখানে কে ব'লে দেবে কোন আচার, কোন ধর্ম, কোন ভাষা চরমরূপে ভারতীয় ? ভারতবর্ষীয় ব'লে যে-সত্তাকে আমরা অনুভব করি তার মধ্যে এই সবগুলো সূত্রই গ্রথিত হ'য়ে আছে : সে-ই তো সেই বিরাট চিত্ত, যা 'একের অনলে বহুর আহুতি'র ফলে জেগে উঠেছিলো। এখানে অনল অর্থ সাধনার তেজ, আর আহুতি অর্থ ধ্বংস নয়, সমন্বয়। আজকের দিনের ভারত-বাসীর চেহারার ছাঁচ এক নয়, আহার, আচার, বেশবাস এক নয়, তার ধর্ম অনেক, তার ভাষা ভিন্ন-ভিন্ন। য়োরোপে নরোয়ে থেকে সিসিলি পর্যন্ত প্রায় সকলেই খৃষ্টান, সকলেই মাংসাশী ও সুরাপায়ী, সামাজিক ব্যবহারেও বৃহত্তর

অংশে মিল পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে এক রাত্রির ট্রেনে আমরা আমিষ থেকে নিরামিষ রাজ্যে চ'লে যাই, আর-এক রাত্রে ধুতির বদলে পাজামার। বাইরের দিক থেকে দেখলে, সর্বভারতে কোনো-একটি সামান্য লক্ষণ খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। এ-কথা ব'লে বিচ্ছেদপ্রবণতার সমর্থন করছি না আমি, সেই অতি পুরোনো কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছি যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসাধনই ভারতবর্ষীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। এক হবার জন্যই অনেককে আপন ক'রে নিয়েছে যে-দেশ, সেখানে কোনো এক বা সামান্য ভাষার ভিত্তিতে ঐক্যের কল্পনা অবাস্তব। যে-দেশের ধর্মে, দর্শনে, শিল্পকলায় বিজাতীয়কে আত্মীয় ক'রে নেবার আবহমান শক্তি দেখা গেছে, আজকের দিনে, বিশ শতকের অপরাহ্ণে, কোনো ভাষাকে বিদেশী ব'লে বর্জন করার ইচ্ছেটা সেই দেশের পক্ষে কৃত্রিম। মনে করিয়ে দিচ্ছি, আমাদের ইতিহাসের মূলসূত্র রবীন্দ্রনাথের 'ভারত-তীর্থ' কবিতায় বিধৃত হ'য়ে আছে।

সেই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমকে অভ্যর্থনা জনিয়েছিলেন। নবীন, চঞ্চল, প্রাণবন্ত পশ্চিমকে, যার জন্মক্ষণ ইটালির পনেরো শতক আর ফরাশি বিপ্লব যার বয়ঃপ্রাপ্তির ঘোষণা। মধ্যযুগের য়োরোপের সঙ্গে মধ্যযুগের ভারতের পরিচয় ঘটলে এই সচেতন স্বাগতোক্তির প্রয়োজন হ'তো না, কেননা তখন জগতের এই দুই অংশে—বলতে গেলে সকল অংশেই—একটি মৌলিক সাদৃশ্য বিদ্যমান ছিলো,—সেই একই রকম ঈশ্বরপ্রতিভূ পুরোহিতের শাসন, একই রকম প্রথাবদ্ধ শিল্পকলা। সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলিতে পশ্চিম য়োরোপ অবশিষ্ট জগৎকে এমনভাবে অতিক্রম ক'রে গেলো এবং তার বিশ্বজিগীষা এমন দস্যুতার রূপ নিলে যে অবশিষ্ট জগতে ত্রাস জেগে উঠলো পাছে তার প্লাবনের মুখে প্রাচীন মূল্যগুলি ভেসে যায়। আর ঠিক সেইজন্যেই রবীন্দ্রনাথকে উচ্চারণ করতে হ'লো এই অভ্যর্থনা; এর মধ্যে যতটা আছে পশ্চিমের প্রতি পক্ষপাত ততটাই আছে স্বদেশের সনাতনপন্থার বিরুদ্ধতা।

এমন বলা যায় না যে এই উক্তি একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথেরই। নূতন কথা তিনি বলেননি, পূর্বসূরীদের চিন্তাধারাকে সমন্বিত, পরিপূর্ণ ও ব্যবহারযোগ্য

ক'রে তুলেছিলেন। এমনও বলা যায় যে তাঁকে সম্ভব ক'রে তোলার জন্যই রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগরের পরিশ্রম। তাঁরা, ব্রাহ্মণসন্তান, বাংলা ভাষায় সতীদাহ-নিবারক প্রস্তাব লিখলেন, প্রমাণ করলেন বিধবাবিবাহের বৈধতা, পণ করলেন দেশের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা চালাতে হবে। যুগান্তরের প্রথম পশ্চিম-পথিক অসুস্থ দেহে ডেক-এ উঠে এলেন ফরাশি জাহাজের পতাকাকে নমস্কার জানাতে, এক পয়ারচ্ছেদক মদ্যপ কবি ঋণ ক'রে য়োরোপ যাত্রা করলেন। রবীন্দ্রনাথের আগেই ঘটেছিলো এ-সব, কিন্তু এ-সবের তাৎপর্য কী, এর মধ্য দিয়ে ভারতের কোন সাধনা প্রকাশ পাচ্ছে, তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়নি যতদিন না রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ আমরা শুনেছিলাম। তাঁর প্রভাবে যে-বাংলাদেশ বেরিয়ে এলো, সেখানে, দুই পুরুষ পরে, কোনো-কোনো লেখক অনুভব করলেন যে 'বাংলাদেশ য়োরোপের অংশ', আর 'রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় য়োরোপীয় সাহিত্য রচনা করেছিলেন'।

এ-সব উক্তির অতিরঞ্জন প্রকট, সত্যের শাঁসও অবশ্যমান্য। কী আমরা পেয়েছিলাম ইংরেজি ভাষার মধ্যে, যাতে বিদেশী প্রভুকে রাজি করাতে হ'লো তার শিক্ষার জন্য বিস্তারিত ব্যবস্থায়? পেয়েছিলাম, বা সেকালে দু-চারজন পেয়েছিলেন, আধুনিক জগতের সঙ্গে সেতুবন্ধের উপায়। তাঁরা চাইলেন তাঁরা যা পেলেন তা সকলকে দান করতে, মাতৃভূমিতে বিশ্বের বীজ ছড়িয়ে দিতে। চাইলেন তাঁদের দেশ মধ্যযুগ ছেড়ে আধুনিক কালে বদলি হোক। আমাদের ইতিহাসের ম্লান লগ্ন তখন, রাষ্ট্রশক্তি ক্লান্ত, ধর্ম স হিত্য ও শিল্পকলা স্বানুকরণে বাঁধা প'ড়ে আছে। সেই বাঁধন তাঁরা ছিঁড়ে দিলেন, জাগিয়ে তুললেন গতি, উদ্যম, সাহসিকতা, জন্ম দিলেন নতুন এক বাংলাকে ও ভারতকে। ব্যাপ্তিতে ও বহুমুখিতায় য়োরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনীয় না হোক, মানতেই হবে উনিশ শতকের বাংলাদেশও একটি সফল নবজন্মের ঘটনাস্থল। যেমন জর্মনিতে গ্যেটে বা রাশিয়াতে পুশকিন, তেমনি বিশ্বক্ষুধিত রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশকে জগতের অংশরূপে গ্রথিত ক'রে নিলেন।

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য যাঁদের রচনা তাঁরা ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ক'রে

য়োরোপীয় ভাবনায় দীক্ষিত হয়েছেন। তারই জন্যে সেই সাহিত্যকে এলীটের সাহিত্য আখ্যা দিয়ে বর্জন করার দুঃস্পর্ধা আজ দেশের মধ্যে দেখা দিয়েছে। চেষ্টা চলেছে লোকসাহিত্যের মৃত অশ্বকে চাবুক মেরে জাগিয়ে তোলার, এদিকে নাকি আণবিক গবেষণার জন্যও কেন্দ্র খোলা চাই। কিন্তু ও-দুই বস্তু যুগপৎ লভ্য নয়, যন্ত্রযুগের শক্তিকে আকাঙ্ক্ষা করলে যন্ত্রযুগের দ্বন্দ্বকেও মেনে নিতে হবে, কাটাতে হবে সহজের মায়া, রাজি হ'তে হবে সেই পল্লীসমাজের বিলোপে যেখানে একই যাত্রাগান শুনে ধীবর, শিশু ও পণ্ডিত একই রকম অশ্রুপাত করতো। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনায় প্রবেশলাভ যদি শিক্ষাসাপেক্ষ হয়, আমি তা নিয়ে দুঃখ না-ক'রে তাতেই দেখবো বাংলা সাহিত্যের পরিণতির প্রমাণ।

ইংরেজি ভাষায় শাসনকর্ম চালাবার ফলে শাসকসম্প্রদায় ও প্রজাগণের মধ্যে যে-বিচ্ছেদ ঘটেছিলো, এবং সাহিত্যের সঙ্গে জনসাধারণের যে-ব্যবধান বিবর্ধমান, এ দুইকে এক চোখে দেখলে নিদারুণ ভুল করবো আমরা। কেননা দ্বিতীয়টি আধুনিক সভ্যতার একটি সার্বভৌম ও অনিবার্য লক্ষণ, আর প্রথমটি স্থানীয় ও শোধনসাপেক্ষ। কিন্তু তার শোধনের উপায় সর্বভারতে ইংরেজির বদলে হিন্দিকে স্থাপন করা নয়, ভিন্ন-ভিন্ন রাজ্যে সেই-সেই মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশের হাইকোর্টে যার বিচার হচ্ছে তার জীবনমৃত্যুর আলোচনার ভাষা ইংরেজি হ'লে সেটা যত অস্বাভাবিক হয়, হিন্দি হ'লেও তার চেয়ে কম অবাস্তব হয় না। শিক্ষার বাহনরূপে যে-কারণে ইংরেজিকে বর্জনীয় বলছি ঠিক সেই কারণেই, অহিন্দিভাষীর পক্ষে, হিন্দিও পরিত্যাজ্য। এবং কেন্দ্রীয় দপ্তরের ভাষারূপে ইংরেজিকে রাখলে শুধু আমাদের আত্মম্ভরিতায় আঘাত লাগতে পারে, কিন্তু অনন্যভাবে হিন্দিকে গ্রহণ করলে তার ফল হবে, অন্যান্য ভাষার পক্ষে, আত্মবিলোপের নামান্তর।

ভারতীয় জনগণের ভাষা হিন্দি, এই কথাটা নিতান্ত অলীক। 'জনগণ' শব্দটি এ-যুগের জাদুমন্ত্র; তার নামে যা-কিছু করা হয় তা-ই এমন স্বতঃসিদ্ধ-ভাবে শুভ ও নির্ভুল যে জনগণ বলতে যে-মনুষ্যসমাজকে বোঝায় তাদের পক্ষে

তা হিতকারী হ'লো কিনা তা পর্যন্ত পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। বর্তমান ভারতে হিন্দির স্থান এর একটি উত্তম উদাহরণ। সর্বসাধারণের যা জ্ঞাতব্য এমন সব বিষয় আজ প্রচারিত হচ্ছে ইংরেজিতে ও হিন্দিতে, বা শুধুই হিন্দিতে। ট্রেনে, এরোপ্লেনে, ডাকবিভাগে, এমনকি কলকাতার ট্র্যামে ও রাজপথে এর প্রচুর সাক্ষী ছড়িয়ে আছে। কিন্তু ক-জন বাঙালি, ক-জন উড়িয়া কানাড়া তামিল অসমিয়া আছেন যাঁরা স্বচ্ছন্দে প'ড়ে নিতে পারেন হিন্দি ভাষার টেলিগ্রাম কিংবা হিন্দিতে ছাপা মনি-অর্ডর ফর্ম? বা দেবনাগরি অক্ষরই চেনেন? ইংরেজিকে সরানো হচ্ছে তা জনগণের ভাষা নয় ব'লে, কিন্তু কবে থেকে তামিল তাঁতি, মলয়ালি কৃষক ও গঙ্গার জেলেরা হিন্দি ভাষায় বিজ্ঞ হ'য়ে উঠলো তা জানতে পারি কি? উত্তর: তাদের শিখিয়ে নেবো আমরা, কোটি-কোটি টাকা ঢালবো তার পিছনে, আর সে-টাকা অবশ্য আপনারাই দেবেন। সে কী? যাদের এখনো মাতৃভাষাতেই সাক্ষর করা যাচ্ছে না তাদের আবার হিন্দি শেখাবেন? আহা—হিন্দি কেন বলছেন, ওর নাম ভারতী, সব ভাষাকে মিলিয়ে-মিশিয়ে একটিমাত্র ভারতীয় ভাষা তৈরি ক'রে নেবো—ভেবে দেখুন ভারতীয় ঐক্য কী-রকম দৃঢ় হবে তখন, কত বড়ো একটা শক্তি হ'য়ে উঠবো আমরা! কল্পনাটি অনেকটা এই রকম যে ভারতের ভিন্ন-ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন-ভিন্ন মৌখিক ভাষা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু লেখাপড়ার ভাষা একটিই হবে, আর সে-ভাষা নাগরি অক্ষরের হিন্দিরই কোনো প্রকরণ। বাঙালি চাষির বাংলা ভাষায় বর্ণপরিচয় হোক বা না হোক, হিন্দি শেখাটাই জরুরি। এই উপায়ে, অনেকগুলি সাবালক ও সাহিত্য-সম্পন্ন ভাষাকে বিধ্বস্ত ক'রে একটিমাত্র ভাষার সূত্রে জনগণকে এক করার স্বপ্ন যাঁদের বিলাস, তাঁরা প্রমাণ ক'রে দিচ্ছেন যে এককালে যেমন জনগণের অহিফেন ছিলো ধর্ম, যেমনি আজকের দিনে বুদ্ধিজীবীর অহিফেন জনগণ।

যাঁরা মসনদে আছেন এবং যাঁরা মসনদের জন্য সচেষ্ট তাঁরা মাঝে-মাঝে তথাকথিত 'আঞ্চলিক' ভাষাগুলির প্রতি যে-বাৎসল্য প্রকাশ ক'রে থাকেন, প্রাকৃত ভাষায় তাকেই বলে মায়াকান্না। ও-সব স্তবচনে যদি তিলমাত্র সত্য

থাকে তাহ'লে সর্বসাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয় কেন প্রত্যেকটি প্রধান ভাষায় প্রচারিত হচ্ছে না? কেন রেডিওতে একমাত্র হিন্দি ভাষা শেখানো হচ্ছে, সরকারের সাংবাদিক ফিল্মের শিরোনামায় কেন হিন্দির একাধিপত্য? কেন, পশ্চিম বাংলার মতো ভাষাচেতন রাজ্যেও, বাংলা এখনো সরকারি ভাষার মর্যাদা পায়নি, কেন বাঙালি শিশুকে বাধ্য করা হচ্ছে হিন্দি শিখতে, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষাকে স্বীকার করতেই বা কর্তৃপক্ষের এত দ্বিধা কেন? আর কেনই বা, উচ্চশিক্ষার বাহন হিশেবে হিন্দি কতদূর যোগ্য হয়েছে, তা নিয়ে ভারত-সরকারের বড়ো তরফে এত দুশ্চিন্তা? হিন্দির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা হিন্দিভাষীর সমস্যা, আর ভারত-সরকার শুধু হিন্দি-ভাষীদের অভিভাবক নন, সর্বভারতের প্রতিনিধি। ইংরেজিকে সরিয়ে দিলে, উচ্চতর শিক্ষা আমরা পরিবেশন ও প্রকাশ করবো নিজ-নিজ মাতৃভাষাতেই; সেটাই স্বাভাবিক ও সংগত, সেটাই আমাদের আত্মসম্মান, দেশপ্রেম ও মনুষ্যত্বের চাহিদা। এর কোনো ব্যত্যয় চিন্তা করতে পারেন তাঁরাই যাঁরা এক মন-গড়া 'জনগণে'র প্রেমিক কিন্তু মানুষকে মানুষের অধিকার দিতে প্রস্তুত নন।

ভারতবর্ষ, য়োরোপের মতোই, বহু শতক ধ'রে অনেকগুলি সম্পৃক্ত ভাষাকে ফুটিয়ে তুলেছে। এরা আত্মীয় হ'লেও স্বতন্ত্র, এবং অনেকেই সপ্রাণ ও পুষ্ট সাহিত্যের অধিকারী। এই অবস্থায় কোনো-একটির মধ্যে অন্য প্রত্যেকটির বিলোপ স্বাভাবিকভাবে ঘটতেই পারে না। কোনো-কোনো দুর্বল ভাষা, যার সাহিত্য বলতে তেমন কিছু নেই, তা ঘটনাচক্রে কোনো প্রবল প্রতিবেশীর মধ্যে মিশে যেতে পারে; কিন্তু যে-সব ভাষা সুপরিণত, যাতে ছাপার অক্ষরে বহু গ্রন্থ বিদ্যমান, এবং যা বহু কোটি লোকের মাতৃভাষা, তাদের বিলোপের জন্য হয় খণ্ডপ্রলয় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, নয় তো একটি খণ্ডপ্রলয় ঘটিয়ে তোলা চাই। আজ যাঁরা হিন্দির যজমান, তাঁরা অচেতনভাবে দ্বিতীয় পথে ঠেলে দিচ্ছেন ভারতকে। যদি আইনের বলে হিন্দি শিখতে বাধ্য করা হয় আমাদের, যদি বিশ্ববিদ্যালয়েও হিন্দি ভাষায় পাঠ নিতে হয়, এমনকি যদি

সাংসারিক উন্নতি হিন্দি জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে, তবু থাকবে সাতাশ খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলী, থাকবে ছাপার অক্ষরে প্রোজ্জ্বল একটি মানস-ভাণ্ডার, যা আমাদের ভুলতে দেবে না বাংলা ভাষাকে, পাছে ভুলি সেই আশঙ্কাও ভুলতে দেবে না। এবং সেই আশঙ্কা দিনে-দিনে যত বেশি বাস্তব হ'য়ে উঠবে, যত আমরা নানা ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে সংকুচিত হ'তে দেখবো, ততই জ'মে উঠবে তীব্রতর হ'য়ে প্রতিবাদ, অধীরতর হবে প্রতিকারের চেষ্টা। শুধু বাংলার কথা বলছি না, কিছুদিন আগে বা পরে, অহিন্দিভাষী প্রতি রাজ্যেই অনুরূপ আবেগ জাগতে বাধ্য। আর সেই আবেগের আঘাতে তা-ই ঘটবে, যা কর্তৃপক্ষের ঘোষিত উদ্দেশ্যের ঠিক উল্টো। যে-ঐক্যের নামে হিন্দিকে ফুলিয়ে তোলা হচ্ছে, সেই কৃত্রিম, যান্ত্রিক ও আতিশয্যিক ঐক্যের চাপেই ভারতবর্ষ টুকরো হ'য়ে ভেঙে যাবে। কিংবা, যদি প্রতিবাদকে পিষ্ট ক'রে ঐক্যই টি'কিয়ে রাখতে হয়, তার জন্য প্রয়োজন হবে ডিক্টেটরীয় রূঢ়তা, লৌহ এবং শোণিতের শাসন। এই দুই সম্ভাবনার মধ্যে কোনোটাই কাম্য নয়।

সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ভাষার বিষয়ে চিন্তা করা যায় না। সাহিত্যে আমরা কতদূর শিক্ষিত হয়েছি তার উপরে আমাদের ভাষার বোধ নির্ভর করে; সাহিত্য বিষয়ে কী আমাদের ধারণা সেই অনুসারে ভাষা বিষয়ে মতামত গঠিত হয়। কিন্তু সাহিত্য, কেজো বিষয় নয় ব'লে, রাজনীতির বহির্ভূত; আর ভাষা, বর্তমান মুহূর্তে, তাঁদেরই আলোচ্য হ'য়ে উঠলো যাঁরা দৈনন্দিন রাজনীতির ব্যবসায়ী। তাঁদের মধ্যে ইংরেজিকে যাঁরা রাখতে রাজি তাঁদেরও যুক্তি ব্যবহারিকতার সীমা পেরোয় না; পাছে, ইংরেজিকে হারালে, আমরা যন্ত্রবিদ্যায় পেছিয়ে পড়ি বা কূটনীতিতে ঠ'কে যাই, এই আশঙ্কাতেই কিছুটা আনুকূল্যে তাঁরা সম্মত। সত্য, 'আন্তর্জাতিক সংযোগ' শব্দটি বার-বার উচ্চারিত হচ্ছে, কিন্তু এই সংযোগের ক্ষেত্র যে কূটনীতি, অর্থনীতি ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান ভিন্ন আরো কিছু এমন কোনো ইঙ্গিত নেই; এমন কথা একবারও শুনলাম না যে চিত্তের সৃষ্টিশীলতাকে অক্ষুণ্ণ ও সতেজ রাখার জন্যও ইংরেজির প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ, যে-সব রাজনৈতিকেরা ভাষা-কমিশনের বিবৃতির

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন ভাষা বিষয়ে তাঁদেরও ধারণা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, সেই বিবৃতির শেষাংশের সঙ্গে মিলে যায়। ভাষা বলতে তাঁরাও বোঝেন একটি উপায় বা হাতিয়ার, আর সাহিত্য বলতে বোঝেন জনগণের সাংসারিক উপকার বা অবসর-বিনোদনের একটি ব্যবস্থা মাত্র। তা না-হ'লে এ-কথা বলা সম্ভব হয় না যে ইংরেজি শিক্ষার ফলে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষতি হয়েছে।

'ক্ষতি হয়েছে', এই কথার একটিমাত্র অর্থ সম্ভব। বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিম, মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথ, যাঁর কথাই ভাবি না কেন, কেউ আর এমন কিছু লিখলেন না যা মঙ্গলকাব্য পাঁচালি বা পল্লীগীতির অনুগামী, যা কথক গায়ক কবিয়ালের দ্বারা রঞ্জিত ও তরলিত হ'য়ে গ্রামে-গ্রামে পৌঁছতে পারে। কথাটাকে শাদা বাংলায় তর্জমা করলে এই দাঁড়ায় যে সর্বসাধারণ যা বুঝতে পারে না সেটাই খারাপ। লক্ষণীয়, দর্শন বিজ্ঞান বিষয়ে, এমনকি সমাজতত্ত্ব বা অর্থনীতি বিষয়েও এই আদর্শের অনুমোদন করবেন, এমন বড়ো গণহিতৈষী ভারতভূমিতেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু যেহেতু আপতিক দৃষ্টিতে সাহিত্যের উপাদান ভাষা, যে-ভাষা আনুমানিক আট বছর বয়সে জড়বুদ্ধি ছাড়া সকলেই শিখে ফেলতে পারে, সেহেতু সাহিত্য সকলেরই বোধগম্য হওয়া চাই, আর নীলগ্রন্থে নিবদ্ধমন ভদ্রলোকও নিজেকে সাহিত্যের একজন বোদ্ধা ব'লে ভাবতে কম্পিত হন না!

অনেকদিন আগে আস্তন চেহ্‌হব বলেছিলেন: 'আমাদের কর্তব্য জনগণের কাছে গোগোলকে নামিয়ে আনা নয়, জনগণকে গোগোলের কাছে টেনে তোলা।' আধুনিক কাল এই নির্দেশের এক অদ্ভুত উত্তর দিয়েছে: তা, সাক্ষরতা ব্যাপ্ত ক'রে, সৃষ্টি করেছে পাঠকদের মধ্যে কঠিনভাবে বিভক্ত দুই সম্প্রদায়—স্বল্পসংখ্যক যাঁরা বিদগ্ধ, আর অসংখ্য যাঁরা বিনোদনেচ্ছু। এবং অসংখ্যের বিনোদন ও উপকারের জন্য যা-কিছু প্রচারিত হচ্ছে—ছাপার অক্ষরে বা চলচ্চিত্রে, রেডিওতে বা টেলিভিশনে—ইংরেজিতে যার নাম দিয়েছে ম্যাস্-কালচার, তা দেখতে-শুনতে ভয়াবহ হ'লেও শেষ পর্যন্ত তাকে সমর্থন না-ক'রে

উপায় থাকে না। থাকে না এইজন্যে যে ম্যাস-কালচার প্রবল হ'য়ে উঠলে, অন্ততপক্ষে সৎসাহিত্যে ও কুসাহিত্যে—বা সাহিত্যে ও অসাহিত্যে—ভেদরেখা নির্ভুলভাবে চিহ্নিত হয়ে যায়; এবং সামাজিক সংগঠন অনুসারে যাঁরা গোয়েন্দা-গল্পের ভোক্তা, তাঁদেরও মধ্যে একটি ছোটো অংশ, ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রভাবে, কালে-কালে সৎসাহিত্যের চাবি খুঁজে পান। সার্বিক সাক্ষরতার ফলে, শেষ হিশেবে নিশ্চয়ই ধরা পড়বে, জগতের গোগোলদের পাঠকসংখ্যা ক'মে যাচ্ছে না, বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। কীটসের সময়ে বহুমূল্য দুর্লভ সংস্করণে ভিন্ন হোমর পড়ার উপায় ছিলো না, আজ পেঙ্গুইন তা ঘরে-ঘরে পৌঁছিয়ে দিতে পারে। এর ফলে কয়েক হাজার, কয়েক শো—বা অন্তত কয়েকজন—নতুন পাঠক, যাঁরা পূর্বযুগে এ-বিষয়ে অজ্ঞ থাকতেন, তাঁরা হোমরকে স্বাধীনভাবে আবিষ্কার করছেন না, এ-কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব।

অতএব আমাদের এখন কর্তব্য দেশের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার সংকোচন নয়, বরং তার বিস্তারসাধন। তার জন্যে স্বতন্ত্র কোনো প্রয়াসেরও প্রয়োজন নেই; শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজির স্থানটি বিচলিত না-হ'লেই যথেষ্ট। বিদ্যালয়ে, এখনকার মতোই, ইংরেজি যদি অবশ্যপাঠ্য বিষয় থাকে, তাহ'লে দেশের চিত্ত পল্বলে পরিণত হ'তে পারবে না। শুধু যন্ত্রবিদ্যার সাহায্যে আর্থিক উন্নতির জন্য নয়, চিত্তের গতিশীলতা অব্যাহত রাখার জন্যও ইংরেজি আমাদের প্রয়োজন। শুধু জন্যও নয়, হয়তো বা সেইজন্যেই। এই প্রয়োজন চিরকাল থাকবে কি থাকবে না, সে-প্রশ্ন অবান্তর: শুধু অনুমেয় ও অদূরবর্তী ভবিষ্যৎই আমাদের আলোচ্য হ'তে পারে। সেই অনুমেয় ভাবীকালের মধ্যে একটি প্রধান য়োরোপীয় ভাষার নির্ভর আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। আর সে-ভাষা, ভারতের পক্ষে, স্পষ্টতই ইংরেজি। কিন্তু কেন্দ্রীয় দপ্তরে হিন্দি স্থাপিত হ'লেও আমরা শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজিকে অটুট রাখতে পারবো, এ-কথা মনে করা মতিভ্রম। জীবিকার উপায় যদি হিন্দি হয় তাহ'লে কতিপয় মেধাবী অথবা বিলাসী ব্যক্তি ছাড়া সাধ ক'রে কেউ ইংরেজি শিখবেন, এমন চিন্তা সুখস্বপ্ন মাত্র। ইংরেজিকে যদি শিক্ষাব্যবস্থায় অবিচল রাখতে হয়, তার একমাত্র উপায় কেন্দ্রীয় দপ্তরেও

ইংরেজি ভাষার ব্যবহার। কেন্দ্রে ইংরেজি থাকলে তার সীমানা আমরা বেঁধে দিতে পারবো, কিন্তু হিন্দি আমাদের জীবনের মধ্যে অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে পড়বে। যদি আমরা বাংলাদেশে বাংলা ভাষাকেই পরম আসন দিতে চাই, যদি চাই বঙ্গবাসী অবাঙালিরাও বাংলা শিখুন, তাহ'লেও আমাদের কেন্দ্রীয় দপ্তরে ইংরেজিকেই রাখা চাই। কেননা ইংরেজি কখনো আমাদের মাতৃভাষার প্রতিযোগী হবে না, বরং অতীতের মতো ভবিষ্যতেও মাতৃভাষাকে ঋদ্ধ ক'রে তুলবে; কিন্তু হিন্দি যে পদে-পদে মাতৃভাষাকে স্খলিত করার স্পর্ধা রাখবে তার লক্ষণ এখনই কিছুটা দেখা যাচ্ছে না তা নয়। মাতৃভাষার বিকাশ যাতে অবাধ হ'তে পারে, সেইজন্যই ইংরেজি আমাদের কাম্য। হিন্দির সপক্ষে একমাত্র যুক্তি যে তা স্বদেশী; ইংরেজির বিপক্ষে একমাত্র যুক্তি যে তা বিদেশী। কিন্তু ইংরেজিকে একটি ভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণ ক'রে নেবার যাঁরা পক্ষপাতী, তাঁদের কথার অনেক প্রতিবাদ হ'য়ে থাকলেও তাঁদের যুক্তিগুলোকে খণ্ডিত হ'তে এখনো দেখিনি।

বুদ্ধদেব বসু

ঘুম

আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আবার কখন ঝড়ের শেষে নিজের শরীর ফিরে পাওয়া,
সমস্ত প্রাণ বকুলবেদী বকুল-ছাওয়া,
ডিঙিনৌকার শান্তি শান্তি, দাঁড়ের শব্দ শান্তি শান্তি,
নারিকেলের পাতায় পাতায় দীঘল হাওয়া।

তোমায় নিয়ে গিয়েছিল তিনটি পুরুষ একটি নারী—
বলেছিলে: 'সবার বন্ধু হ'তে পারি';
তিনটি পুরুষ নারীটিকে নিয়ে গেল খালের দিকে,
তোমায় তখন করেনি কাণ্ডারী।

আর শেষে ঐ নারীটিকে বিকেলবেলায় তোমার কাছে
রেখে গেল তিনটি দস্যু, তোমার বুকে জায়গা আছে
মনে ক'রে বনের ভিতর তারা
দৃশ্যের রোমাঞ্চ খুঁজে চ'লে গেল মাতাল আত্মহারা।

তুলসীতলার অঙ্গনা সেই বিবর্তিতা প্রাঙ্গণা সেই নারী
এল তোমার বুকের ভিতর জায়গা নিতে, জানুর উপর
কবরী তার দিল সে সঞ্চারি',
দেহ তো নয় মোমের ক্ষরণ, রেখেছে তার একটি চরণ
অন্ধকারে, আলোর শরীর পরিপূরক তারি।

ওপারে লাল হলুদ হ'লো, হলুদ শেষে অবিমিশ্র কালো,
প্রসারিত ভালোবাসা শেষ দুইবার করুণা ঠিকরালো;
নিরালা বন বনের প্রান্ত ব'লে উঠলো: 'হে অশান্ত
কাকে তুমি ভালোবাসার আলো

দিতে চাইছো ? তুমি যাকে ভালো ক'রে কখনো জানোনি,
তাকে তুমি আলিঙ্গনে বাঁধলে কেন ? তোমার আলিঙ্গনই
পাবে যে সে জানতো না, আর সেই তিনটির একজনা তার
লক্ষ্য ছিল, ভেবেছিল সহজ হবে নীরব নির্বাচনী ;
কিন্তু সেজন তৃষ্ণাজীবী, অন্য দুজন তার আদর্শে গড়া
জীবন-অন্ত-করা
তোমার কাছে রেখে গেছে, তারা যে ফুল ঝরিয়েছে
তোমার সমবেদনা তার বিশল্যকরণী ।'

হঠাৎ শব্দ থেমে গেল, একটু জ্যোৎস্না পাতার জানালার
মধ্য দিয়ে এসে পড়লো, তুমি দেখলে নগ্ন শরীর তার
শিশুর মতো প'ড়ে আছে, গভীর ঘুমের কারুকাজে
চোখের দুটি নম্র নদী, ভ্রূযুগে ভৃঙ্গার ।

শিশুর চেয়ে আরো সহজ কী যেন কোন কাজল পরেছে সে,
সারা শরীর যেন শুধু একটি নয়ন, তোমার চোখে এসে
একটু ঘুমের ঘর বেঁধেছে, যাকে ছেড়ে সকল ত্যেজে
তোমার কাছে ঘুমোতে আজ এসেছে সে মানুষ ভালোবেসে ।

দুটি কবিতা

বিকাশ দাশ

আকস্মিক

তুমি কোনো বিরল মুহূর্তের—
একমুঠো রোদ চেনা গলির বাঁকে ।
হঠাৎ অলৌকিকের ঝলসানি
আছড়ে-পড়া ঝোপের ফাঁকে-ফাঁকে ।

মৌন ছবি উদাস সাঁওতালি,
নিবিড় গ্রাম রাতের শুদ্ধতায় ;
অবচেতন অনুভবের সুখ,
ঘন নিঝুম মনের কিনারায় ।

ঘনিষ্ঠ রাত নদীর উপকূলে
তারার ছায়া আকাশ-আলোর ঝড় ।
তোমার কালো খোঁপার সুরভিতে
মাতাল কত কালের বালুচর ।

বিশ্বরূপা

তোমার চোখের নীল অনেক মেয়ের নীল চোখে
মিলেছে—দিগন্তে শোয়া ম্রিয়মাণ নদীর সংগম
সাগরের মোহানায়, অগোছালো অরণ্যের চুলে
ঢেলেছে বিকেলে কেউ খোঁপার মাতাল-করা ঘ্রাণ ।
তোমার হাসির ফেনা ঝর্নার হৃদয়ে তোলে ঝড়,
খুশির প্রান্তরে তুমি একঝাঁক মুগ্ধ বালিহাঁস ।
শাড়ির আঁচল দূর-আকাশের সায়াহ্নের সোনা
দিঘির কাজল জলে মুখের মসৃণ ছায়া কাঁপে ।

তোমার আশ্চর্য মন—মেঘ হয়, ফুল হ'য়ে ফোটে,
দুপুরের অনাবিল প্রান্তরের বুনো প্রজাপতি
জানালায় উড়ে আসে—বনের রূপের প্রতিনিধি।
সন্ধ্যার পিলসুজে নীল নিঃসঙ্গ নক্ষত্র হ'য়ে জ্বলে।
তোমার সত্তার রূপ সারা বিশ্বে হ'লো একাকার,
'আমার একান্ত তুমি'—বলো তো কী ক'রে বলি আর?

তিনটি কবিতা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

অভিজ্ঞান

জানালাটা খোলা থাক;
আমি বাতাস ভালোবাসি।
এই গাঢ়, এই উন্মোচিত অন্ধকারে, এসো
আমরা রেখার উৎসব করি।
সন্ধ্যার ছত্রভঙ্গ আলোয় সূর্যদেব তার দৃশ্যসমষ্টি গুটিয়ে
পশ্চিমাচলে নেমেছেন,
আর এই বর্ণহীন পৃথিবীতে রেখে-যাওয়া
অগণিত নক্ষত্র-আকাশের মতো,—ছাখো
জ্বলজ্বল করছে আমাদের অভিজ্ঞতাগুলো।
জানালাটা খোলা থাক;
আমি আকাশ ভালোবাসি।

তারপর কখন আমি তার
সমৃদ্ধ উরুযুগলে যৌবনকে জাগিয়ে তুলেছি।
প্রমত্ত বনরাজের মতো নিষ্পেষণে
একটি সম্মত হরিণীর শীৎকার
শুনতে-শুনতে যখন মনে হয়েছে
এই ইটকাঠের অস্তিত্বটা একটা উদ্দাম তরণী,
ভবিষ্যতের সমুদ্রে যার কূল দেখা যাচ্ছে না কিছুতেই···

তথনি কেন অকস্মাৎ ছুটে-আসা ভোরে
গুনগুন গাছপালা, কাকলিকণ্ঠে সূর্যবরণের স্তব?
ভালোবাসা! তুমি চিরদিনের নিরুদ্দেশ সোনার হরিণ॥

রূপান্তরিত

ফিরে যাবার আগে, তুমি বলেছিলে
"অন্ধকার সব মনে রাখে।"
মনে রাখে নক্ষত্রনিবিড় আকাশ,
গভীর গাছের ছায়ায়
তৃপ্ত তৃণরাশির নির্ভর।

তারপর ; প্রতিটি মুহূর্ত একটি শব,
আর তাকে ঘিরে যুযুধান সময়ের বেদনাবহ উল্লাস।
আজ তাই প্রখর আলোয় আবার
ফিরে এসে দেখি, ভুলে গেছে, তারা সবাই ভুলে গেছে,

তুমি এক করপুটে কখন
বসন্তের প্রথম বিশ্বাস তুলে দিয়েছিলে ॥

দর্পণ

তুমি এখনো ছবি হ'য়ে দাঁড়াতে পারো ;
দাঁড়াতে পারো সূর্যের অন্তিম আলোর প্রসাধনে
আমার দুই পথিক চোখের

সমস্ত বিস্ময় আর লজ্জা কেড়ে নিয়ে ॥

দুরন্ত তেপান্তর

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অথচ ভয়ে থরোথরো কেঁপে-ওঠাই সার হ'লো কেবল, কেননা গোলাপকে মনে হয় অবান্তর ; সত্য যেন কেবল প্রেতমূর্তির মতো হানা-দেয়া মারাত্মক প্রপাতের প্রবল নিষ্ক্রান্তি, কেননা, কেউ তো জানবে না তার শরীর তেমন শাদা নয়, নয় তেমন মসৃণ কিংবা সুদূর, যেমন হ'লো হাসনুহানার পাপড়ি। বরং তার একটু আভাস যেন অন্ধকারে, যেখানে প্রচণ্ড স্বাস্থ্যের আহ্লাদে ঘুরে বেড়ায় দুর্দম বুনো জানোয়ার।

'যেমন হ'লো ফুলের সঞ্চয়কোষ, তেমনি তার গোপন, জটিল দুয়ার : কুসুমিত উচ্ছ্বাসে তার ব্যাপ্ত মুক্তি'—এ-কথা ভেবেছিলো দোলায়িত বয়ঃসন্ধি, তাই ভাবনাই জাগালো নীললোহিত রেখার বাঁকা আন্দোলন ধূসর গোধূলিতে। স্পর্শকে মনে হ'তো সোনালি ভোরের মতো, কুঁড়ি থেকে পাপড়ি ফোটায় আর শিউরোতে থাকে শরীরের প্রতিটি রোমকূপ।

সরাইখানার ছোটো ঘরে অন্ধকার ঘুরলো চরকিবাজির মতো পাক খেয়ে-খেয়ে। নির্মম পুলক নিষ্ঠুর হাতে কাঁপিয়েছিলো ততক্ষণ, যতক্ষণ-না সারা প্রান্তর বুনো তুরঙ্গের বাঁকানো ঘাড়ের মতো বাসনা হ'য়ে উঠেছিলো, যতক্ষণ-না ইন্দ্রিয়ের ভিতরে কোঁকড়ানো ইচ্ছে জেগেছিলো সান্ত্বনাহীন সর্বনাশের—

বিষাক্ত গোলাপ তবু ফুটলোই, ফুটলো আচমকা, অন্ধকারে, একলা, যেমন ক'রে ব্রেজিলের অরণ্যরাতে ঘোমটা খোলে ভয়ংকর ॥

দুটি কবিতা

বুদ্ধদেব বসু

ফাউস্টের গান

প্রজ্বলিত, লুপ্ত আচম্বিতে,
অঙ্গ তার বৈদ্যুতিক, চতুর :
ব্যগ্র মুঠি শূন্য ছেনে ফতুর,
কিংবা ঠেকে ছিন্ন কাঁচুলিতে।

ফিরিয়ে তাকে আনবো, এই পণ
পেতেছিলাম বেতাল-পরিশ্রমে,
চামড়া, হাড়, নাভিমূলের রোমে
সীবন ক'রে কাতর ত্রিভুবন—

ব্যর্থ তবু রইলো আলিঙ্গন!

হাজার তরী ভাসিয়েছিলো জলে,
লক্ষ রাতেও তৃষ্ণা বেড়ে চলে,
শাশ্বতী, যার দিগন্তে নেই জরা—

তপস্বীকে এমনি ক'রে ছল
দিলে কি সেই আধো-আলোয় ধরা
বেআইনি যার বেলা, ঋতুর দল

আলস্যে আর বুজরুকিতে ভরা!

পঞ্চাশের প্রান্তে

'যত্ন নিয়ো দাঁতের,' বলেছিলে।
সাধ্যমতো চেষ্টা ক'রেও দেখি
নিশ্বসিত চুল্লি ধিকিধিকি,
বাঁধের জল অধীর গাঙচিলে।

নতুন জ্ঞান নেড়েছি খুব ক'ষে,
কয়লাশেষের ফুলকি থামেনি তো;
উড়ে-চলার চঞ্চুতে উদ্ধত
তিন বছরে তিনটি পড়ে খ'সে।

পলায় পাখি, থাকে ডানার হাওয়া;
দেনার দায়ে হৃদয় করে ধাওয়া।

বাঁধিয়ে নেবো, কলপ দেবো চুলে,
অল্প আঁচে কষ্ট কেন সেঁকি?
—বরং থাকি, সব ইতিহাস ভুলে

শূন্য শিশি ধ্বংস ক'রে যেদিন
গন্ধ হ'য়ে জ্বলবো আমি, স্বাধীন,
ঠাণ্ডা, রোগা, ঝকঝকে আর মেকি!

আধুনিক কবি অমিত রায়

নরেশ গুহ

আমিও সেই কৃতার্থদের মধ্যে একজন—'শেষের কবিতা' একদিন যাদের আনন্দের সপ্তম স্বর্গে পৌঁছে দিয়েছি। ল এখনো দেয়, হয়তো চিরকালই দেবে। আবার কালক্রমে বিচলিতস্বপ্ন সেই হতভাগ্যদের মধ্যেও নিজেকে একজন ব'লে আমি আবিষ্কার করেছি—'শেষের কবিতা'র আনন্দলোকে আগের মতো যারা আর স্বস্তি পায় না, যাদের মনের মধ্যে নানা প্রশ্নের ধোঁয়া ওঠে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে, যারা এমনকি স্বর্গটি খাঁটি কিনা, টেঁকসই কিনা, এমন দারুণ সন্দেহও হয়তো পোষণ করে। স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হবার এই দুঃখকে মনে নিয়ে অনেকদিন তার কারণ জল্পনা করেছি। ভেবেছি কেন এমন হ'লো? 'শেষের কবিতা' লেখার পরে প্রায় তিরিশ বছর কেটে গেছে, রবীন্দ্রনাথের পরে আমরা তৃতীয় পুরুষের বালখিল্যের দলও তিরিশ পেরিয়ে অন্য জন্মে চ'লে এসেছি। 'শেষের কবিতা' নিয়ে এখনকার এই অতৃপ্তি শুধুই কি তাহ'লে কালের হাওয়াবদলের অনিবার্য ফল?

রুচি জিনিশটা অস্থির। গত তিরিশ বছরে তার বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা যে 'শেষের কবিতা' নিয়ে অসুখী তার সঙ্গে সেই রুচিবদলের কোনো সম্পর্ক আছে এমন অনুমান আমি একেবারেই বরখাস্ত ক'রে দিতে চাই। বরং দিনে-দিনে এ-কথাই বুঝতে শিখেছি যে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে প্লটপ্রবণ উপন্যাসের যে-প্রধান ধারাটি আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে তরঙ্গিত হচ্ছে, 'শেষের কবিতা' তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেই স্বাতন্ত্র্যের দুর্গম আভিজাত্য নিয়ে ভবিষ্যতের বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা মুক্তির উপায় হ'য়ে দেখা দিয়েছে। যে-জীবন পায়ে-চলা-পথের মতো সংকীর্ণ, বৈচিত্র্যের নিত্যনবীনতা যাতে নেই, ক্রোধ-লোভ-বিদ্বেষ-ঐশ্বর্য-উচ্চাভিলাষ—সবই যেখানে ছোটো মাপের, সেখানে বাহিরের ঘটনা দিয়ে মানুষকে গড়তে যাওয়াই ভুল। সচরাচর বাংলা উপন্যাসে দুর্বল ক্ষীণ সুরের সারেগামা থেকে সে-শিক্ষাই আমরা

পাই। কিছুতেই তার নিষ্ফল দৈন্য ঢাকা পড়ে না, অতিপ্রাকৃতের ছায়া ফেললেও না, ভাবালুতার চোরাপুঞ্জি ঝরালেও না, ঘটনার অন্তহীন সমাপতন ঘটালেও না। তবু যদি প্লটের দুর্মর অভ্যাসকে ছাড়তে না পারেন তাহ'লে বাঙালি লেখককে অগত্যা রোমাঞ্চিত ইতিহাসের সুদূর ডাঙাকে আশ্রয় করতে হয়, যার বেমালিক পোড়ো জমিতে বিনা বল্‌গায় কল্পনার অশ্বটিকে যেমন খুশি চরালে কেউ মামলা করতে আসে না।

অবশ্য পৃথিবীর চেহারা আজকাল এতই দ্রুতগতিতে বদলে যাচ্ছে যে কোনো বিষয়েই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। ভারতবর্ষেও নদী জুড়ে বাঁধ উঠছে, আকাশ ফুঁড়ে লোহাকারখানার চিমনি। অসুখী দম্পতির বিচ্ছেদ এখন আইনত সাধ্য। কলকারখানায় কাজ করছে মেয়েরা। আস্তেধীরে হ'লেও পরিবারের বাঁধন ক্রমে আলগা হচ্ছে। বাইরের সঙ্গে তাল রেখে-রেখে ক্রমে ভিতরটাও কি আর বদলাবে না? জটিল হবে না জীবন? জেগে উঠবে না সৃজনের শক্তি? উদ্ভাবনের বুদ্ধি? দূর হবে না ইউরোপের সঙ্গে আমাদের মৌল পার্থক্য? তখন হয়তো প্লটের উপন্যাসও জমবে বাঙালি লেখকের হাতে, ঘটনার জন্যে ইতিহাসের ধুলো ঘাঁটতে হবে না, মধ্যবিত্তের নিঃস্ব দাম্পত্য কিংবা নির্বীজ প্রেম নিয়ে গাণিতিক খেলা হয়তো না খেললেও চলবে তার। তা যতদিন না হচ্ছে অন্তত ততদিন পর্যন্ত অন্য যে-উপায়ে বাংলা উপন্যাসের যথার্থ মুক্তি হ'তে পারে তার অমূল্য দৃষ্টান্ত 'শেষের কবিতা', আখ্যানের শুরুতে সামান্য একটা মোটর এ্যাক্সিডেণ্ট ছাড়া বলবার মতো আর প্রায় কিছুই যেখানে ঘটছে না, চারটি পাঁচটি চরিত্র নিয়ে যার গোটা গল্পটা অমিতশক্তি ভাষার কারুকাজ, বর্ণনার সুষমা এবং সৌরভ, আর ভাব এবং ভাবনার প্রতিঘাতের উপর দাঁড়িয়ে আছে। শিলং পাহাড়ের কয়েকটি সকাল, কয়েকটা দুপুর, বিষম বর্ষণের অন্তে একটি অবিস্মরণীয় অপরাহ্ন, একটি-দুটি বিকেল এবং সন্ধ্যা—তারই পথ ধ'রে হৃদয়ের জয়পরাজয়ের অনাদি এবং চিরনবীন একটি অপূর্ব কাহিনী কোন দিগন্তের দিকে মুখ ক'রে চ'লে গেছে। আধুনিক বিশ্বের আবর্তে প'ড়ে এ-দেশেও জীবন যেদিন মথিত হ'য়ে উঠবে, ঘোরালো প্লটের সন্ধানে দেয়ালে

যেদিন আর মাথা খুঁড়তে হবে না, সেদিনও 'শেষের কবিতা'—মুষ্টিমেয় হ'লেও, বিশিষ্ট কতিপয় গুণী লেখকের কাছে উপন্যাস লেখার আদর্শ হ'য়ে থাকবে। এবং রচনার শক্তি থাকলে, কাব্যের সাংকেতিক গুণসম্পন্ন এই শ্রেণীর উপন্যাস অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির এমন গভীরতাকে স্পর্শ করতে পারবে, কেজো গদ্যের রচনায় যা অসাধ্য, এবং বিশশতকী এই তীব্রমধ্যাহ্নে কাব্যবিদ্বেষী চৌকশ চতুর লোকের মনেও যার জন্য অগাধ তৃষ্ণা রয়েছে। তার প্রমাণ, হালের ইউরোপীয় সাহিত্যে কাব্যনাট্যের পুনরাবির্ভাব।

ড্রামার সঙ্গে পোয়েটিক ড্রামার যে প্রভেদ, উপন্যাসের মধ্যে—ধরা যাক 'গোরা'র তুলনায় 'শেষের কবিতা'র প্রভেদ অনেকটা সেই অনুপাতের। 'শেষের কবিতা'র বর্ণনা অংশে খ'সে গেছে গদ্য-পদ্যের ভেদ, স্থানে-স্থানে পুরোপুরি তা গদ্যকবিতাই হ'য়ে উঠেছে, যে-ধরণের গদ্যকবিতা এ-বই লেখার অল্প পরেই 'পুনশ্চ' ইত্যাদি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন। এ-প্রসঙ্গে আরো দু-একটি কথা বলবার আছে। তার জন্য 'পুনশ্চ' থেকে 'বাসা' ব'লে কবিতাটি নেওয়া যাক :

ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।
... ...
নদীতে নেমেছে ছোটো একটি ঘাট
    লাল পাথরে বাঁধানো।
তারি একপাশে অনেককালের চাঁপা গাছ,
    মোটা তার গুঁড়ি।
নদীর উপরে বেঁধেছি একটি সাঁকো,
    তার দুই পাশে কাচের টবে
    জুঁই বেল রজনীগন্ধা শ্বেতকরবী।
        গভীর জল মাঝে-মাঝে
    নীচে দেখা যায় নুড়িগুলি।
    সেইখানে ভাসে রাজহংস।...
ঘরের মেঝেতে ফিকে নীল রঙের জাজিম পাতা
    খয়েরি রঙের ফুল-কাটা।

দেয়াল বাসন্তী রঙের
তাতে ঘন কালো রেখার পাড়।
    একটুখানি বারান্দা পুবের দিকে,
        সেইখানে বসি সূর্যোদয়ের আগেই।...
    বাড়ির পিছন দিকটাতে
        শাকসবজির খেত।
    বিঘে দুয়েক জমিতে হয় ধান।
        আর আছে আম-কাঁঠালের বাগিচা
        আস-শেওড়ার বেড়া-দেওয়া।...

ইচ্ছে ক'রেই উদ্ধৃতিটিকে দীর্ঘ করলুম। এর কোথাও কোনো সংস্কার না ক'রে সহজেই 'শেষের কবিতা'য় ঢুকিয়ে দেওয়া যেতো। লাবণ্যর কাছে অমিত রায় তার সাধের যে কল্পিত বাগানবাড়িটির বর্ণনা পেশ করছে, এর সঙ্গে তার মিলটা নিছক ভাষার ভঙ্গির চাইতেও কিছু বেশি :

'গঙ্গার ধার, বাগানটা ডায়মণ্ডহারবারের ওই দিকটাতে। ...পাড়ির নিচে তলা থেকে উঠেছে ঝুরি-নামা অতিপুরোনো বটগাছ। ধনপতি যখন গঙ্গা বেয়ে সিংহলে যাচ্ছিল তখন হয়তো ওই বটগাছে নৌকো বেঁধে গাছতলায় রান্না চড়িয়েছিল। ওরই দক্ষিণ ধারে ছ্যাতলা-পড়া বাঁধানো ঘাট, অনেকখানি ফাটল-ধরা, কিছু-কিছু ধ'সে-যাওয়া। সেই ঘাটে সবুজে শাদায় রঙ করা আমাদের ছিপছিপে নৌকোখানি।...বাগানের মাঝখান দিয়ে সরু একটি খাড়ি চ'লে গেছে, গঙ্গার হৃৎস্পন্দন ব'য়ে। তার ওপারে তোমার বাড়ি এপারে আমার। [মাঝখানে] একটি কাঠের সাঁকো...।

সন্ধ্যাতারা উঠেছে, জোয়ার এসেছে গঙ্গায়, হাওয়া উঠল ঝিরঝির ক'রে, ঝাউগাছগুলোর সার বেয়ে, বুড়ো বটগাছটার শিকড়ে-শিকড়ে উঠল স্রোতের ছলছলানি। তোমার বাড়ির পিছনে পদ্মদিঘি, সেইখানে খিড়কির নির্জন ঘাটে গা ধুয়ে চুল বেঁধেছ।...

গিয়ে দেখব, গালচে বিছিয়ে বসেছ, সামনে রুপোর রেকাবিতে মোটা গোড়ে মালা, চন্দনের বাটিতে চন্দন, এককোণে জ্বলছে ধূপ।...'

বার্লিন থেকে প্রতিমা দেবীর কাছে লেখা চিঠির সঙ্গে 'বাসা' কবিতার প্রায় আক্ষরিক মিল সত্ত্বেও, মনে করলে কিছুই দোষের হবে না যে, চার বছর

আগে-পরে লেখা উল্লিখিত দুটি রচনার একটি আর-একটির আদি খশড়া। সাদৃশ্য এই একটা নয়। মিলিয়ে পড়তে গেলে দেখা যাবে 'শেষের কবিতা'র অনেক অংশেরই চেনা প্রতিধ্বনি 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে কবিতা হ'য়ে ফিরে এসেছে। ভঙ্গি একই। শুধু পাঠের রীতিকে বুঝিয়ে দেবার জন্য 'পুনশ্চ' গ্রন্থে পংক্তিগুলোকে সিঁড়ি ভেঙে সাজানো হয়েছে মাত্র। আমি এ-কথাও বলতে চাই যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে গদ্যঋতুর শুরু হয়েছে 'পরিশেষ' কিংবা 'পুনশ্চ' থেকে নয়, তারও আগে 'শেষের কবিতা' থেকে। তারও আগে 'লিপিকা'য় অবশ্য এই বসন্তেরই একটি দলছাড়া পাখি একবার গেয়ে নীরব হ'য়ে গিয়েছিল। 'লিপিকা'র মতো 'শেষের কবিতা'য় পৌঁছেও পদ্যের ছন্দমিল-ঝরানো, এই শ্রেণীর রচনাকে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সংকোচ ভেঙে একবারেই কবিতা ব'লে স্বীকার করতে পারেননি। হয়তো তার জন্য 'কল্লোল'-'প্রগতি'র পক্ষ থেকে নবীন কবিদের বিরোধিতা এবং বিদ্রোহের দরকার ছিল।

তাঁদের সেই বিরোধিতা খুবই নিশ্চয়ই বিচলিত করেছিল রবীন্দ্রনাথকে। নবীনদের সঙ্গে পর-পর দুদিন ধ'রে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে আলোচনাও করেছিলেন। নতুন কবিতাকে, মোটকথা, কিছুতেই তিনি আর উপেক্ষা করতে পারছিলেন না; অথচ তাকে স্নেহের আশীর্বাদ জানানোও অসম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে, যদিও মনের মধ্যে নিজেও তিনি বড়ো একটা ঝড়ের সাড়া শুনতে পাচ্ছিলেন। ঝড় উঠেওছিল, প'ড়ে গিয়েছিল কাব্যরীতির পুরোনো অনেক দরজাদেয়াল। সেই আকাশতলের খোলামেলার মধ্যে 'পুনশ্চ' কাব্যের আসর বসলো। অর্থাৎ আধুনিকদের বিদ্রোহকে স্বীকার করলেন না, তবে নিজের রচনায় এই পর্যন্ত মেনে নিলেন যে কাব্যের অধিকারকে বাড়ানো সম্ভব। 'তাঁর রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো—গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরনে'—অমিত রায়ের মুখ দিয়ে বিদ্রোহীদের অতৃপ্তিকে তিনি এইভাবে ব্যক্ত করেছেন। যেন তারই লোকশান পুষিয়ে নেবার জন্যে 'পুনশ্চ'র প্রবেশ। এখানে মিলিয়ে গেল আগের কবিতার ছন্দমিলের ঝংকার। কবিতার ভাষাকে মুখের কথার কাছাকাছি এনে বৃহৎ গদ্য-পৃথিবীর বৈচিত্র্যকে

অঙ্গীকার ক'রে নিলেন রবীন্দ্রনাথ। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন :

'পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থে আধিভৌতিককে সমাদর ক'রে ভোজে বসানো হয়েছে। গদ্যটি মাংসপেশল পুরুষ ব'লেই কিছু প্রাধান্য যদি নিয়ে থাকে তবু তার কলাবতী বধূ দরজার আধখোলা অবকাশ দিয়ে উঁকি মারছে। এর মধ্যে ছন্দ নেই বললে অত্যুক্তি হবে, ছন্দ আছে বললেও সেটাকে বলব স্পর্ধা।…

সাধারণত যাকে কাব্য বলি সেটা হচ্ছে বচন-অনির্বচনীয়ের সম্মিলনের পরিভূষিত উৎসব। অনুষ্ঠানে যা-যা দরকার সযত্নে তা সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু তার পরে? অনুষ্ঠান তো বারো মাস চলবে না।…সপ্তপদী বা চতুর্দশপদীর পদক্ষেপটা অস্থানে প'ড়ে বিপজ্জনক হবেই এমন আশঙ্কা করিনে।…কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি তাহ'লে সাহিত্য-সংসারের আলংকারিক অংশটা হাল্কা হ'য়ে তার বৈচিত্র্যের দিক, তার চরিত্রের দিক, অনেকটা খোলা জায়গা পায়; কাব্য জোরে পা ফেলতে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সব সময় যে নিন্দনীয় তা নয়। নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচুনিচু বিচিত্রবৃহৎজগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর; সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো, কখনো ঘাসের উপর, কখনো কাঁকরের উপর দিয়ে। কেবলমাত্র কাব্যের অধিকারকে বাড়াব মনে ক'রেই একটা দিকের বেড়ায় গেট বসিয়েছি। এবারকার মতো আমার কাজ ঐ পর্যন্ত।'

অর্থাৎ নবীন কবিরা যা চাচ্ছিলেন তার মধ্যে এর বেশি আর তিনি মানতে পারলেন না। নিজের কবিধর্মে অবিচলিত থেকেও নিজেকে তিনি বিবর্তিত করলেন ঠিকই, কিন্তু নতুন কবিতার প্রতি সন্দেহ তাঁর কিছুতেই গেল না। মনে হ'লো কড়াভঙ্গির চমক লাগানো দুর্বোধ্যতা ছাড়া আর কিছু নেই তাদের। এ-দ্বন্দ্বের ইতিহাস 'শেষের কবিতা'র পাতায় প্রচ্ছন্ন আছে। 'শেষের কবিতা'কে তাই অনায়াসে বলা চলে রবীন্দ্রনাথের শেষের পর্বে রচিত কবিতাবলির মুখবন্ধ। তার অনেকটাই যে রাবীন্দ্রিক গদ্যকবিতার খশড়া তাই শুধু নয়। আধুনিক কবিদের তিনি কী ভাবে বুঝেছিলেন, তাঁদের প্রতি কী মনোভাব ছিল তাঁর,—সে-সব কথা এতটা স্পষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষগোচর ক'রে আর কোথাও বলেননি। ঐখান থেকেই আধুনিক-রবীন্দ্রনাথ আর নবীন

কবিদের পথ দুইদিকে ভাগ হ'য়ে গেল। 'শেষের কবিতা'র মূল্য অপরিসীম—এ-কারণেও।

গল্পাংশের পশ্চাৎপট এই দুই কাব্যাদর্শের দ্বন্দ্ব। নিজে উপন্যাসের লেখক হ'য়েও স্বনামেই নিজেকে তিনি কবিহিশেবে পাত্রপাত্রীদের আলোচ্য ক'রে তুলেছেন। এবং শেষ পর্যন্ত জিতিয়েও দিয়েছেন। প্রসঙ্গত মনে করিয়ে দিই যে উপন্যাসের শেষ কবিতাটির লেখক ইতিহাসের মেধাবী ছাত্রী লাবণ্য দত্ত নয়, কেননা লাবণ্য কোনোকালে কবিতা লেখেনি। এ-বিষয়ে তার মনোভাবটাও খুব স্পষ্ট:

'আমি চাইনে কবি হ'তে।...জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না। জগতে যারা উৎসব-সভা সাজাবার হুকুম পেয়েছে কথা তাদের পক্ষেই ভালো। আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যই।'

কবিতাটির লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শোভনলালকে তিনি অনেক কবিতা দান করেছিলেন। শোভনলালের খাতা থেকেই লাবণ্য এ-কবিতাটি উদ্ধার করে, এটা অনুমান ক'রে নিতে কোনো বাধা নেই। যাই হোক, 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে 'রবিঠাকুরে'র প্রতিপক্ষ নিবারণ চক্রবর্তীর ছদ্মনামে অমিত রায়। এবং 'শেষের কবিতা'র আনন্দলোক থেকে আমরা যে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে আসি অমিত রায়ই তার জন্য দায়ী। রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ হওয়ার মতো কোনো যোগ্যতাই তার নেই। আধুনিক কবি তো সে নয়ই, এমনকি সে যে কবি তাও রবীন্দ্রনাথেরই দয়ায়।

'অমিত রায় ব্যারিস্টার'। তীরের মতো সরল, তীক্ষ্ণ, বেগবান এমন একটি বাক্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসের শুরু করেছেন ব'লে আমরা অনেকদূর পর্যন্ত ভুলে থাকি, অনেকে এমনকি শেষ পর্যন্ত গিয়েও ধরতে পারেন না যে গল্পের পরিধির মধ্যে নায়কের পরিচয়জ্ঞাপক এই তথ্যটি একেবারেই জরুরি নয়। ব্যারিস্টারি সে সত্যিই কোনোদিন মন দিয়ে করেনি। বার-লাইব্রেরিতে যদি বা কখনো গেছে তো ব্যবসা করতে নয়, দাবা খেলতে। অমিত রায় ব্যারিস্টার, তার চাইতেও বর্তমান উপন্যাসের পক্ষে জরুরি খবর

হচ্ছে এই যে সে কবি, আধুনিক কবি,—অন্তত সে নিজে তাই মনে করে—এবং 'রবিঠাকুরের' কবিতাকে সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না। সে যে বিত্তবান ঘরের সন্তান, তার পিতার জমানো টাকা যে তিনপুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট, এবং দীর্ঘ সাত বছর বিলেতে কাটিয়ে মনের মধ্যে সে যে অক্সফোর্ডের রঙ পাকা ক'রে নিয়ে এসেছিল—এ-সব আনুষঙ্গিক তথ্য তখনই অর্থময় হ'য়ে ওঠে যখন আমরা আবিষ্কার করি যে তার রবীন্দ্রবিদ্বেষী আধুনিক কবি হওয়ার পক্ষে এ-সবই হচ্ছে আবশ্যিক গুণ। আমরা জানতে পাই, তার রুচির তৃষ্ণা মেটাবার মতো কবিতা বাংলা ভাষায় লেখা হয় না, অন্তত রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত হয়নি। তাই লাবণ্যর জন্য প্রেমের উচ্ছ্বাসে তার সমস্ত মনটি যখন উপচে পড়ছে তখনও সে বারবার বিদেশী কবিতার শরণাপন্ন হয়, যদিও লাবণ্যর মনে পড়ে জয়দেবকেই। 'ওর বিশ্বাস আমাদের দেশের সাহিত্য-বাজারে যাদের নাম আছে তাদের স্টাইল নেই। জীবসৃষ্টিতে উট জন্তুটা যেমন, এই লেখকদের রচনাও তেমনি ঘাড়ে গর্দানে, সামনে-পিছনে, পিঠে-পেটে বেখাপ, চালটা ঢিলে নড়বড়ে, বাংলা সাহিত্যের মতো ন্যাড়া ফ্যাকাশে মরুভূমিতেই তার চলন।'

হাল আমলের ইউরোপী সাহিত্যের আবহাওয়ায় বিচরণ ক'রে সে আর কিছু আনতে পারেনি, শুধু একটি মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে ফিরেছে যে সাহিত্যে স্টাইলটাই হচ্ছে সব। 'অমিতর নেশাই হল স্টাইলে। কেবল সাহিত্যবাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষায় ব্যবহারে।' আর এই জন্যই ইংরেজি সাহিত্যেও রোমান্টিক কিংবা ভিক্টোরিয়ানদের স্তবস্তুতি না ক'রে সে একবারে গিয়ে পৌঁছায় ডান্-এর দরজায়, যাঁর কবিতায় স্টাইলটা খুবই ঘটা ক'রে চোখে পড়বার মতো, এবং বোধহয় সেই জন্যেই, আড়াইশো বছর পেরিয়ে আধুনিকদের কাছে যে-ডান্-এর এতো সমাদর। অবশ্য ব'লে নেওয়া ভালো যে স্টাইল বলতে অমিত বাইরের সেই খোলশটাকেই শুধু বোঝে যা দশের ভিড়েও চট ক'রে চোখে পড়বার মতো। সেই সঙ্গে থাকা চাই তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা, পৌরুষ। ঢিলেঢোলা ভাবটা কেটে গিয়ে, তার মতে, সাহিত্য হ'য়ে

উঠবে 'কড়া লাইনের খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো, ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেথার মতো, ন্যুরালজিয়ার ব্যথার মতো, খোঁচাওআলা, কোনওআলা, গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়, এমনকি, যদি চটকল, পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর আদলে হয় ক্ষতি নেই।

এই মনোভাবের বশবর্তী হ'য়েই নিজের নাম থেকে সে 'কুমার' বর্জন ক'রে যেমন তার ভার কমিয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার মুখের ভাষায় হ'য়ে উঠেছেন 'রবিঠাকুর'। এই 'রবিঠাকুরের' বিরুদ্ধে তার অভিযোগের বহরটা বেশ চওড়া। প্রথমত তাঁর রচনায় কোনো তীব্রতা এবং তীক্ষ্ণতা নেই, অমিতর ভাষায় 'স্টাইল' নেই। ছন্দমিলের মসৃণ নৈপুণ্যে তাঁর অনড় আস্থা। দ্বিতীয়ত হয়তো পূর্বোক্ত কারণেই, তাঁর লেখায় 'পৌরুষের অভাব', তাতে 'আশার জোর নেই', 'ভাবী প্রত্যূষের উজ্জ্বল গৌরব নেই,' আছে শুধু 'মিইয়ে-পড়া হাল-ছাড়া বিলাপ'। অন্যদিকে তিনি যে কল্পিত সৌন্দর্যলোকের ধ্যান করছেন তার মধ্যে বাস্তব দুঃখদারিদ্র্যের কিছুমাত্র ছায়া পড়ে না। কাজেই অমিত রায় স্থির করেছে—এই পাংশু দীনতা থেকে বাংলা কাব্যকে সে উদ্ধার করবে।

'শেষের কবিতা'র আখ্যানভাগের অঙ্গ হিশেবে যে-এগারোটি ছন্দমিলের আশ্চর্য কবিতা ছড়িয়ে আছে তার প্রথম কবিতাই হচ্ছে এই আধুনিক কবি অমিত রায়ের ক্রেডো। জনগণের প্রতি অবজ্ঞা নিয়েই সে কবিতার শুরু। এতে অমিত রায়ের চোখে, 'রবীন্দ্রোত্তর' কবিতার (মুখের কথায় যাকে 'রবীনধুত্তোর' ব'লেও বর্ণনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ) আদর্শকে ব্যক্ত করা হয়েছে। দারিদ্র্যের অহংকার আছে এ-কবিতায়, বিদ্রোহ আছে, বিপ্লব আছে, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যা নেই :

'পুষ্পমাল্য নাহি মোর, রিক্ত বক্ষতল,
নাহি বর্ম অঙ্গদ কুণ্ডল।
শূন্য এ ললাটপটে লিখা
গূঢ় জয়টিকা।
ছিন্ন কন্থা দরিদ্রের বেশ।'

মনে থাকতে পারে তার 'বাপ ছিলেন দিগ্‌বিজয়ী ব্যারিস্টার। যে পরিমাণ টাকা তিনি জমিয়ে গেছেন সেটা অধস্তন তিন পুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।' সেই অমিত রায়ের কবিতায় 'ছিন্নকন্থা দরিদ্রের বেশ' ইত্যাদি প্রকট থাকলে নিশ্চয়ই বিদ্রূপ করতে পারেন রবীন্দ্রনাথ, যদিও সে-বিদ্রূপ এতোই সূক্ষ্ম যে 'শেষের কবিতা'র পাঠকরা প্রায় লক্ষ্যই করেন না। এ ছাড়া অমিত রায় বর্ণিত আধুনিক কবিতা দুর্বোধ্য, তাতে ছন্দের মাথামুণ্ডু নেই। এবং সেটাই নাকি বিশেষ গৌরবের, গর্বের বিষয় ;

আমার দুর্বোধ বাণী
বিরুদ্ধ বুদ্ধির 'পরে মুষ্টি হানি
করিবে তাহারে উচ্চকিত,
আতঙ্কিত।
উন্মাদ আমার ছন্দ
দিবে ধন্দ
শান্তিলুব্ধ মুমুক্ষুরে
ভিক্ষাজীর্ণ বুভুক্ষেরে।...

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বাণী দুর্বোধ, ছন্দ উন্মাদ হ'লেও, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় রবীন্দ্রনাথের পরে এই আধুনিক কবিতাকেই যে সবাই মেনে নিতে বাধ্য হবে সে-বিষয়েও অমিতর সন্দেহ নেই :

শিরে হস্ত হেনে
একে-একে নিবে মেনে
ক্রোধে ক্ষোভে ভয়ে
লোকালয়ে
অপরিচিতের জয়,
অপরিচিতের পরিচয়,—

অমিতর আধুনিকতার অন্য লক্ষণ হচ্ছে—রবীন্দ্রনাথে তার বিপুল অবজ্ঞা। তার প্রেমের তরী যখন মাঝদরিয়ায় ঢেউ খাচ্ছে তখনো নেহাৎ গায়ে প'ড়ে 'রবিঠাকুরের' বিরুদ্ধে লড়াই করতে তার ক্লান্তি নেই। এবং আত্মপ্রশংসায়

এমনই সে নিঃসংকোচ যে নিজের লেখা কবিতাকে আবৃত্তি ক'রেই সে ক্ষান্ত হয় না, বিস্তারিত টীকা সহযোগে তার ব্যাখ্যাও সে ক'রে দেয়, বুঝিয়ে দেয়—রবিঠাকুরের তুলনায় তার কবিতা কতোখানি উঁচুদরের। কিন্তু দুঃখের বিষয় এহেন বিদ্রোহী কবির লেখা ব'লে যে-কবিতাগুলিকে উপন্যাসে বসানো হয়েছে, তার সঙ্গে ভাবে ভাষায় বা লেখার ভঙ্গিতে কোনোখানেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কবিতার অমিল নেই। যার মানে হচ্ছে এই যে, ইচ্ছে করলেও রবীন্দ্রনাথ অমিত রায়ের ফরমায়েশি কবিতা লিখতে পারতেন না। অভিযোগ করছি না। তিনি যে তাঁর নিজের মতোই লিখবেন এটাই তো আমরা আশা করি।

তাহ'লে অমিতর চরিত্রকে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় এই যে একমাত্র ভঙ্গি ছাড়া, স্টাইল ছাড়া, এবং দারিদ্র্য, বিপ্লব, গন্ধ-পৃথিবীর বাস্তবতা প্রভৃতি কয়েকটি উপাদানগত বৈশিষ্ট্য ছাড়া তার পক্ষে রবীন্দ্রবিরোধী কিংবা রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতাকে জন্ম দেবার মতো কোনো মূলধনই নেই। তার চাঞ্চল্যের সবটাই হচ্ছে হালের ইউরোপ থেকে ধার করা। প্রাচী-প্রতীচীর যুগল সাধনা তার মধ্যে মূর্ত হ'তে পারেনি। শিক্ষার বৈগুণ্যে সে হ'য়ে উঠেছে ইউরোপী আধুনিকতার ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া। 'আপন নিখিলের মাঝখানে একের অভাবে ও কেবলই চঞ্চলভাবে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়ে।' এবং এটাও লক্ষ্য করবার যে শহর ছাড়া কোথাও তার মন টেঁকে না। শিলং পাহাড়েও টিঁকতো না, যদি না—ইত্যাদি!

কল্লোল-যুগে যে-নবীন লেখকদের কলরবের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে আধুনিক সাহিত্য প্রবেশ করেছিল তাঁদের সঙ্গে অমিত রায়ের কোনোখানেই মিল নেই তা বলবো না। তাঁদের কারো-কারো লেখায় রবীন্দ্রবিরোধিতা, অন্তত রবীন্দ্রনাথে অতৃপ্তি, হয়তো একটু বাড়াবাড়ি রকমেই প্রকাশ পেয়েছিল। আবার যথাসময়ে সেই মনোভাবের প্রত্যাহার ক'রে, রবীন্দ্রনাথ যেখানে আধুনিকদের শিরোমণি সেখানে তাঁর আসনের সামনে প্রণত হ'তেও দ্বিধা করেননি তাঁরা। তখনকার নবীন কবিদেরই একজনের লেখা থেকে তুলে দিই:

'তারুণ্যের সেই সংঘাতের দিনে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ আর মেনে নিতে পারছি না আমরা; আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছুটেছে তীক্ষ্ণতার দিকে, তীব্রতার দিকে, তার প্রভাবে তখন রবীন্দ্রনাথের রচনাকে বড্ড বেশি মৃদু ব'লে ঘোষণা করতে আমরা কুণ্ঠিত হইনি।...কিন্তু 'শেষের কবিতা'র প্রথম কিস্তি বেরোনো মাত্র বিকিয়ে যেতে হ'লো। মাসে-মাসে এই আশ্চর্য নতুন রচনাটি পড়তে-পড়তে আমাদের মনে হ'লো যেন একটা বন্ধ দুয়ার, যা আমাদের হাতের আঘাতে কোনো উত্তর দেয়নি, তা এক জাদুকরের স্পর্শে হঠাৎ খুলে গেলো—দেখা গেলো আমাদেরই অনেক স্বপ্নের চোখ-ধাঁধানো মূর্তি। আমরা যা-কিছু চেষ্টা করছিলাম অথচ ঠিক পারছিলাম না, সেই সবই রবীন্দ্রনাথ করেছেন—কী সহজে, কী সম্পূর্ণ ক'রে, কী সুন্দর ভঙ্গিতে। মনে হ'লো বইটা যেন আমাদেরই, অর্থাৎ নবীন লেখকদেরই উদ্দেশে লেখা, আমাদেরই শিক্ষা দেবার জন্যে এটি গুরুদেবের একটি তির্যক ভর্ৎসনা।...হার মানতে হ'লো তাঁর কাছে, সেই আনন্দে তাঁকে প্রণাম জানালুম, আর 'শেষের কবিতা'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে বেড়াতে লাগলুম চারদিকে।'

—বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য' থেকে।

ইউরোপীয় সাহিত্যের কাছে এই সব ভিন্নপন্থী লেখকদের মানসিক প্রবণতা অনেকখানি ঋণী একথাও স্বীকার করবো। কিন্তু শুধুমাত্র অন্তঃসারশূন্য ভঙ্গি ছাড়া তাঁদের লেখায় কোনো নতুন অভিজ্ঞতাকেই দেবার ছিল না বললে কিছুতেই মানতে পারবো না। তাই যদি হ'তো তাহ'লে আধুনিক কবিতা আঁতুরেই মরতো। ঢেউ এসেছিল ইউরোপের দিক থেকেই। আমরাও যে সে-ঢেউতে দুলে উঠেছিলুম তার কারণ গোটা পৃথিবীটাই ক্রমে ইউরোপ হ'য়ে উঠছে। ইউরোপী সভ্যতার সব উপাদানগুলিকে আয়ত্ত করবো, অথচ তার জীবনমথিত সুধা এবং গরল সমপরিমাণে নিতে চাইবো না—সেটা হয় না। শুধু নতুনত্বের মোহ নিয়ে উদ্ধতভাবে প্রবেশ করেনি আধুনিক কবিতা। তার মর্মলোকে গুরুতর জটিল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। অগ্রজের অটল বিশ্বাসে আস্থা যদি ট'লে যায়, কিছুই তো আর আগের মতো থাকে না। যাই হোক, অমিত রায়কে আমাদের চেনা আধুনিক কবিদলের প্রতিনিধি বলা একমাত্র ব্যঙ্গের ছলেই সম্ভব।

উত্তরে কেউ যদি বলেন, অমিত রায়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কখনোই আধুনিক কবির মূর্তি আঁকতে চাননি, কেননা 'শেষের কবিতা' উপন্যাস, দুই কাব্যরীতির সমালোচনা করবার প্রকৃষ্ট স্থান নয়, উপন্যাস লিখতে গিয়ে গল্পের টানে একটি চরিত্রকে তিনি গড়েছেন,—ধরা যাক তাঁর মন থেকেই—কাজেই উপরোক্ত তর্ক এবং আলোচনা সাহিত্যবিচারের বাইরে পড়ে। গল্পটা কেমন হয়েছে এটাই হ'লো আসল কথা। বস্তুত, 'চার অধ্যায়ে'র কোনো-কোনো বিরূপ আলোচনাকে লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ এই কথাই লিখেছিলেন :

'গল্পের প্রসঙ্গে বিপ্লবচেষ্টা-সংক্রান্ত মতামত পাত্রদের মুখে প্রকাশ পেয়েছে। ধ'রে নিতে হবে যারা বলছে, তাদেরই চরিত্রের জন্যে এই সব মত। যদি কেউ সন্দেহ করেন এ-সকল মতের কোনো-কোনোটা আমার মতের সঙ্গে মেলে তবে বলবো 'এহ বাহ্য'। এ-কথাটা মিথ্যে হ'লেও গল্পের মধ্যে তার যে মূল্য, সত্য হ'লেও তাই।'

নিশ্চয়ই তাই, সে-কথা একশোবার মানবো। ধরা যাক ব্যক্তিগতভাবে আধুনিক কবি বলতে অমিত রায়ের মতো একটি অতি দুর্বলচিত্তের চরিত্রকেই বুঝতেন রবীন্দ্রনাথ, বুঝতেন যে চমকে দেবার মতো ভঙ্গি আর কলাকৌশলময় দুর্বোধ্যতা ছাড়া আর কিছুই দেবার নেই তাদের। উপন্যাসের বিচারে সে-কথাকে টেনে আনা কেন? তাঁর ব্যক্তিগত মত এই রকম ছিল বলছি, তার কারণ ভঙ্গিসর্বস্ব এক শ্রেণীর কবিতার প্রতি পরেও তিনি তিরস্কার উচ্চারণ করেছেন, সতর্ক করেছেন আমাদের। এবং 'ভঙ্গিসর্বস্ব' বলতে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর সমসাময়িক রবীন্দ্র-অনুকারীদের কথা বলতে চাননি, ভিন্নপন্থীদের কথাই বলেছেন :

'সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে, নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।
সেটা সত্য হোক ;
শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।'

এ-কবিতা কোনো গল্পের পাত্রপাত্রীর মুখে বসাননি, এটা স্বতন্ত্র কবিতার অন্তর্গত, কাজেই কবির নিজের কথা। ধরা যাক আধুনিক কবিতা সম্পর্কে তাঁর নিজের এই সন্দেহকেই তিনি অমিত-চরিত্র রচনার কাজে ব্যবহার করেছেন। এবং ধরা যাক, আমরা সে-সন্দেহকে সত্য ব'লে মানছি না। কিন্তু তাতে কী? তার পরেও গল্পটির সামঞ্জস্যে যদি কোনো ব্যাঘাত না হয়, ঘটনা এবং চরিত্রের মিলিত বেগে কাহিনী যদি তার অনিবার্য পরিণামে পৌছয়, তাহ'লে কেন আপত্তি উঠবে? কিন্তু 'শেষের কবিতা' সে-দাবি পূরণ করে না ব'লেই তো আপত্তি। এ-উপন্যাসের উপসংহার অনিবার্য নয়।

তার মানে এ-নয় যে অমিতকে লাবণ্য বিয়ে করলেই সব ঠিক হ'য়ে যেতো। লাবণ্য-অমিতর ভালোবাসায় ঐ যে ছেদ পড়লো সেটা আকস্মিক নয়। এটা না-হ'লেই বরং আশ্চর্য হতুম আমরা। কেননা দুই ভিন্ন জগতের, ভিন্ন জাতের মানুষ তারা। একজন ইউরোপের প্রতিচ্ছায়া, অন্যজন ইউরোপেরই মন্ত্রে-জাগা খাঁটি ভারতীয় কন্যা। 'অমিতর নিজের মধ্যে বুদ্ধি আছে ক্ষমা নেই, বিচার আছে ধৈর্য নেই, ও অনেক জেনেছে শিখেছে কিন্তু শান্তি পায়নি—লাবণ্যর মধ্যে ও এমন একটি শান্তির রূপ দেখেছিল যে-শান্তি হৃদয়ের তৃপ্তি থেকে নয়, যা ওর বিবেচনাশক্তির গভীরতায় অচঞ্চল।' শুধু এটুকু হ'লেও হয়তো বিপত্তি ঘটতো না। কিন্তু অমিতর মতো মানুষের ভালোবাসাটা যে কতোটা টেঁকসই, লাবণ্যকে পাবার আগ্রহ তার কতোটা তীব্র, কতোটা সত্য, সে-বিষয়েই যে সন্দেহ জাগে আমাদের। তার চরিত্রের প্রধান অভাব এই যে কোনো অভিজ্ঞতারই গভীরে সে যেতে পারে না; হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই অভিজ্ঞতাগুলি তার কণ্ঠনালী দিয়ে ফিরে এসে অপরূপ কথা হ'য়ে ঝ'রে পড়ে। প্রাণে কিছুই সঞ্চিত হয় না তার। দুঃখী হওয়া তার স্বভাবে নেই। বেদনার বোধ তার নাগালের বাইরে। কেতকী মিত্রের 'কেটি'তে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে, একদিন যখন জুনমাসের জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ কথা ক'য়ে উঠেছিল, ইংলণ্ডের মাঠে-মাঠে ফুলের প্রচুর বৈচিত্র্যে ধরণী তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল,—এই অমিত রায়ই অনুরাগের আংটি পরিয়ে দিয়েছিল তার হাতে। 'তার মধ্যে

অনেক কথাই উহ্য ছিল কিন্তু কোনো কথাই গোপন ছিল না।' পরে লাবণ্যকে ভালোবেসে সেদিনের জন্য অমিতর মনে যে কোনো বেদনাও জাগছে না এটা লক্ষ্য করবার মতো। সপ্রতিভ সে সর্বদাই, সেটা তার গুণ হ'তে পারে। কিন্তু এনামেল-করা মুখের উপর দিয়ে দরদর ক'রে জল ঝরিয়ে কেটির ফিরে যাবার পরে লাবণ্যকে অমিত যখন অম্লানবদনে বলে : 'সেদিন যাকে আংটি পরিয়েছিলুম, আর যে আজ সেটা খুলে দিলে তারা দুজনে কি একই মানুষ?'—তখন তার নির্লজ্জ সপ্রতিভতা দেখে স্তম্ভিত হ'তে হয়। লাবণ্য তাকে বুঝতে ভুল করেনি। কোনো কিছুতেই দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা নেই অমিতর চরিত্রে, সে কেবল রুচির তৃষ্ণা মিটিয়ে ফেরে, সাহিত্যে-সাহিত্যে তাই তার বিহার, লাবণ্যর কাছেও সেইজন্যেই সে এসেছে। রুচি গড়াটা নির্ভর করে শিক্ষার প্রকৃতির উপরে। তার সঙ্গে চারিত্রিক দৃঢ়তার কোনো অত্যাবশ্যক যোগ নাই। যে লোক দুঃখ পেতে জানে না, সে কবি? বেদনার স্নায়ু যার অসাড়, সে প্রেমিক?

তার শিক্ষা সংস্কৃতি বিদ্রোহ ইত্যাদি নিয়েও অমিত রায় যে কতো দুর্বলচিত্তের মানুষ, তা এই একটা ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে। বাঙালি গবর্নেসের সঙ্গে সে প্রেমে পড়েছে শুনে তার বোনেরা উদ্বিগ্ন হ'য়ে যখন শিলং চ'লে এলো, তখন, কাজে-কাজেই, অমিতকেও বাসা তুলে দিয়ে উঠে আসতে হ'লো 'অতি পরিচ্ছন্ন হোটেলের এক অতিসভ্য কামরায়।' তেমন মারাত্মক ক্ষতি ছিল না তাতে। কিন্তু এ-কথাটা বুঝে নিতে লাবণ্যর বা আমাদের কারোরই দেরি লাগে না যে লাবণ্যকে নিয়ে অমিত যেন তার বোনেদের কাছে লজ্জিত। তার কারণ তার সমাজ লাবণ্যদের সমাজ থেকে সহস্র যোজন দূরে। নিন্দে করলেও সে সমাজকে উড়িয়ে দেবার মতো মনোবল অমিতর নেই। আবার লাবণ্যকেও সে ছাড়তে পারে না। দোটানায় প'ড়ে তার সাধের জীর্ণ কুটিরটিকে চড়া দামেই গোপনে কিনে নিতে হ'লো তাকে। এই কুটিরেই বিষম বর্ষণের অন্তে একদিন অপরাহ্ণবেলায় যোগমায়া তাদের দুজনকার হাত এক ক'রে দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। বিয়ের পর লাবণ্যকে নিয়ে তার সঙ্গে চিরকাল নববধূর

সম্পর্ক স্থাপন করবে ব'লে গঙ্গার ধারের বাগান, ঘাট, বটগাছ ইত্যাদি পরিবেশের কথা যা-যা সে কল্পনা ক'রে রেখেছিল, সেই সব যেন মিলিয়ে গেছে ঐ ছোটো বাড়িটির মধ্যে। তাই হোটেল থেকে যখন সে বেরোয়, মাথায় থাকে হয়তো ফেল্টের হ্যাট, গায়ে বিলিতি কোর্তা। তারপর ঐ কুটিরে ঢুকে বেশান্তর ঘটিয়ে লাবণ্যদের কাছে দেখা দেয় যে-অমিত রায় তার পরনে কিন্তু ধুতি আর শাল। এই লুকোচুরির ব্যাপারটা লাবণ্যর মতো মেয়ের কাছে অসম্মানের ঠেকবে, না তো কী? 'আর কারও কথা অত ক'রে তুমি ভাবো কেন? না হয় আর সবাই জানতে পারলে। ঠিকমতো জানতে পারাই তো চাই, তাহ'লে কেউ অমর্যাদা করতে সাহস করে না।'—লাবণ্যর দিক থেকে এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর জানা নেই অমিতর। এমনকি নিজেদের গরজেই কেটি আর সিসি যোগমায়ার বাড়ি হানা দিয়ে তাদের অপমান করার চেষ্টা না করলে লাবণ্যর সঙ্গে তার যে বিয়ে ঠিক—একথাও সে বোনেদের বলতে পারতো কিনা সন্দেহ।

পরিণাম যা হবার তাই হ'লো। লাবণ্যই শুধু অমিতকে প্রত্যাখ্যান করলো তা নয়, যোগমায়াও তাকে ত্যাগ করলেন। 'সাতদিন যেতেই অমিত ফিরে যোগমায়ার সেই বাসায় গেল। ঘর বন্ধ, সবাই চ'লে গেছে। কোথায় গেছে তার কোনো ঠিকানা রেখে যায় নি।'

'শেষের কবিতা'র কাহিনী আসলে এখানেই শেষ। কেন তবু শেষ করলেন না রবীন্দ্রনাথ? পরের পরিচ্ছেদটি না লিখলে একটি অপরূপ কবিতাকে আমরা হারাতুম ঠিকই, কিন্তু অমিত রায় নামক চরিত্রের ভরাডুবি হ'তো না। আশা রাখতে পারতুম, হয়তো জীবনে একবার অন্তত তার মনে সত্যি-সত্যি দুঃখের আঘাত গিয়ে পৌঁছল। লাবণ্য স'রে গেল তার জীবন থেকে, এত বড়ো বেদনার মধ্যে নতুন জন্মে উত্তীর্ণ হ'তে পারতো অমিত। কিন্তু হায়রে রবীন্দ্র-বিরোধী দুর্ভাগা কবি। গল্পের দাবি ছাপিয়ে গেলেও তার পরাভবের চূড়ান্ত দৃশ্য দেখতেই হবে আমাদের। জানতে হবে যে লাবণ্যর প্রেমও তার জীবনে শুধুই আশ্চর্য কথা বলার একটি উপলক্ষ্য হ'য়ে উঠেছে মাত্র। এবং ইতিমধ্যেই

এ-অভিজ্ঞতাকে সে চমক-লাগানো কথার ছাঁচে ঢেলে ফেলেছে। দুঃখ নেই, দ্বন্দ্ব নেই, বেদনা নেই। তার মুখের অবিশ্বাস্য অদ্ভুত সব তত্ত্বকথা শুনে যতিশঙ্করের মতো বিশ বছরের যুবকের মনেও খটকা লাগে, যদিও একে গম্ভীর কোনো প্রেমতত্ত্ব ব'লে কল্পনা করার মতো পণ্ডিত ভাষ্যকারের অভাব হয় না বাংলাদেশে। মনে পড়ে, একদিন অমিত লাবণ্যকে বলেছিল: 'একদিন হয়তো দেখবে আর কিছু যদি না থাকে আমার বাণীরূপ রয়েছে।' সে-কথাই আরেকভাবে সত্য হ'লো।

শেষ পর্যন্ত অমিতর নির্জলা যৌবনের বিদ্রোহী আধুনিকতা তো টিঁকলো না। কেটিকে বিয়ে ক'রে আকাশে ওড়বার ডানা গেল কাটা। শুনতে পাই, কেটিকে সে নিবারণ চক্রবর্তীর কবিতা শোনায় না,—সে বেচারা মরেছে,—শোনায় 'রবিঠাকুরে'র কবিতা, 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। নতুন যুগের বাণী আর ফুটলো না তার লেখায়। ফুটবে না তা সবাই আমরা জানতুম। অপরিচিতের নাম আর ধরণীতে এসে পৌঁছল না। পৌঁছল, তবে নিবারণ চক্রবর্তীর সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। এই চরিত্রের জন্য এমন আশ্চর্য রচনা যেন ঐশ্বর্যের বাজে খরচ। আধুনিক কবির প্রতি অতটা নিষ্করুণ না-হ'লেও পারতেন রবীন্দ্রনাথ।

কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত ও ১৪১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-১৩ মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড-এ মুদ্রিত।
সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর: বুদ্ধদেব বসু। সহকারী সম্পাদক: নরেশ গুহ।

কবিতা
চৈত্র, ১৩৬৫
বর্ষ ২২, সংখ্যা ৩
ক্রমিক সংখ্যা ৯৩

দুটি কবিতা

জীবনানন্দ দাশ

রজনীগন্ধা

এখন রজনীগন্ধা—প্রথম—নতুন—
একটি নক্ষত্র শুধু বিকেলের সমস্ত আকাশে;
অন্ধকার ভালো ব'লে শান্ত পৃথিবীর
আলো নিভে আসে।

অনেক কাজের পরে এইখানে থেমে থাকা ভালো;
রজনীগন্ধার ফুলে মৌমাছির কাছে
কেউ নেই, কিছু নেই, তবু মুখোমুখি
এক আশাতীত ফুল আছে।

রচনাকাল: ১৩৫৪
কবি-কর্তৃক পরে ঈষৎ পরিবর্তিত

শবের পাশে

(পুরোহিতের প্রার্থনা : অসামাজিক)

মৃত ?
তবুও সে মাটি নয়।
মাথার চুল যেন আরো অনেক কাল ব্যবহার করবে সে—
তার হাতির দাঁতের মতো ধূসর কপালের উপর
ভোরের অজস্র দাঁড়কাকের মতো চুলের আনন্দ,
চুলের আবেগ : যেন মিশরের মহীয়সী শাল প'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে
লাল-নীল কাচের জানালা খুলে দিয়ে
নব-নব ভোরের রৌদ্র ও নীল আকাশকে আস্বাদ করবার জন্যে।

কোন-এক অন্ধকার লাইব্রেরির নিস্তব্ধ হলুদ পাণ্ডুলিপির মতো
দেখলাম তাকে :
শ্রাবণের রৌদ্রে রেবা নদীর মতো ছিল যে একদিন ;
সে আর ঘুমোবে না কোনোদিন,
স্বপ্ন দেখবে না ;
তার মৃত মুখের বিমর্ষ মোমের গন্ধকে ঢেকে ফেলে
শুধু তার ঘন কালো চুল
সেই আবহমান রাত্রি থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে জেগে রয়েছে
কোনো-এক দূর, ভালো দ্বীপের মতো
যেখানে জাগ্রত পাখিদের প্রেম
ধূসর সমুদ্রকে জাগাতে পারে না আর।

যে-সমুদ্রের কোনো বেলা নেই,
পাণ্ডুর দেহের নীরবতা নিয়ে তারই ভিতর নামল সে ;
জ্যামিতির ভিতর থেকে রূপ তার কুহক হারিয়ে ফেলেছে ;

তারপর বিশৃঙ্খল মাংসের দুর্বলতা নিয়ে
পৃথিবীর বড়ো-বড়ো নাবিকের বিবর্ণ ভয় ও বিস্ময়ের জিনিস সে।

এই নারী আজ নিস্তব্ধ ;
মনে হয় যেন কোন সুদূর দ্বীপে ঘুম রয়েছে শুধু :
এর দেহের ভিতর বিবর্ণ দারুচিনি-ছালের গন্ধ,
এর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়
কোন অসীম নির্জনতার ভিতরে উঁচু-উঁচু গাছের ধীর আলোড়ন যেন
(আরো নিস্তব্ধ)
এই মৃতার শরীরে সেই দূর দ্বীপের সবুজ শব্দ—স্বাদ—ছায়ারৌদ্রের বুনুনি—

আমলকি-গাছে কোকিল এই নিষ্পাপ স্রোত অনুভব করেছে,
তাই সে ধূসর চিন্তার সম্রাটের জন্যে সংগীত খুঁজতে চ'লে গিয়েছে :
মৃত্যুর মহান আত্মীয়তা
পৃথিবীর পাখিদের কাছেও মৈথুনের চেয়ে প্রগাঢ়।

রচনাকাল : ১৩৪৪

কবিতায় প্রাণী ও পুতুল : গটফ্রীড বেন্‌-এর স্মরণে

জ্যোতির্ময় দত্ত

জর্মানির সব-কিছুর মধ্যেই এক বর্বর অসাধারণতার স্পর্শ আছে। সে-দেশের ভূগোল ও ইতিহাসে যেমন বিপরীতের সংঘাত ও সমন্বয় ঘটেছে, মানুষের দেহে ও মনেও তেমনি এক আশ্চর্য মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। জর্মানির পূর্বদিকে অগণিত শ্লাভগণ, ভাষা ও আচারে যেমন তাঁরা পৃথক, তাঁদের অধিকৃত ভূভাগের আকার ও গড়নও তেমনি পশ্চিম-ইউরোপের বিপরীত। পূর্ব-ইউরোপের বিশাল প্রান্তর জলাভূমি ও হ্রদের দ্বারা বিভক্ত। পশ্চিমের দেশগুলি ছোটো-বড়ো উপত্যকাবিশেষ; বিভিন্ন পর্বতমালার চাপে প'ড়ে ক্ষুদ্র প্রান্তরগুলি আন্দোলিত; মাঝে পলিমাটি জ'মে যতটুকু গ'ড়ে উঠেছে সেটুকুই সমতলভূমি। নাইসে ও ওডার নদী যখন জর্মানির সীমান্তে ছিলো না তখন মনে হ'তো সে-দেশের জ্যামিতিক্ কেন্দ্রের এক চুলও পূর্বদিকে কেউ যদি কোনো মার্বেলের গুলি রাখে, তবে তা অনায়াসে গড়িয়ে-গড়িয়ে লেনিনগ্রাদ, এমনকি বেরিং প্রণালী পর্যন্ত চ'লে যেতে পারে। ছুটি ছাড়া সব বড়ো-বড়ো হ্রদ পূর্বাঞ্চলে। আর পশ্চিমে ও দক্ষিণে, হার্ৎজ ও ভোজ পর্বতমালা বিভিন্ন নদীর অববাহিকাকে বিভক্ত করে।

পশ্চিম এবং পূর্বের বিপরীত গড়ন যেমন জর্মানির ভূগোলে লক্ষ্য করা যায়, তার ইতিহাসেও তেমনি বৈপরীত্যের প্রাচুর্য বিদ্যমান। আধুনিক কালে যন্ত্রের আশ্চর্য উন্নতি যদিও ঘটেছে, মধ্যযুগীয় সমরব্যবসায়ী ভূস্বামীগণের প্রতাপ কিছুকাল আগেও প্রবল ছিলো। ধর্মবিপ্লব প্রথম ঘটে জর্মানিতে, আবার, সে-বিপ্লব সবচেয়ে আগে ফুরিয়ে যায় সেই দেশেই। অর্থাৎ, মধ্যযুগ সবচেয়ে বেশিদিন টি'কেছিলো সেই জর্মানিতে, যেখানে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়।

জর্মানগণের জাত্যাভিমান প্রসিদ্ধ। অথচ, তাঁদের রক্তেও অসংখ্য উৎসের ধারা প্রবাহিত। উত্তরের অধিবাসীগণের আকার দীর্ঘ, নীল তাদের চোখ, চুল কটা। দক্ষিণে বাঙালির মতো কৃশ জর্মানের দেখা পাওয়া অসম্ভব নয়।

হার্ৎজ পাহাড়ের দক্ষিণে যতো যাওয়া যায়, চুল ও চোখ ততোই কালচে হ'য়ে আসে। টমাস মান্ উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে এই দৈহিক পার্থক্য ছাড়াও আরো অনেক কিছু লক্ষ্য করেছিলেন। গ্যেটে এবং শীলার, বেটোফেন ও হ্বাগনার তুই সুদূর লোকের অধিবাসী; টিউটন ও লাতিন, পূর্ব ও পশ্চিম, আপোলো ও ডিয়োনিসাস—বিরোধের যতোগুলি পরিচিত উপমা আছে সেগুলি তাই এতো ঘন-ঘন জর্মানির বেলায় প্রয়োগ করা হয়।

অর্থাৎ, যে-কোনো দিক থেকেই দেখা যাক, সে-দেশের অর্ধাংশ আড়ালে র'য়ে যাবে। তাই, ইতিহাসের সরলতায় জর্মানির গভীরতা ধরা পড়ে না। যেমন উঁচু-নিচু প্রান্তরের পৃষ্ঠভাগ অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার দ্বারা নির্ণয় করা যায় না, পুরাণের সাহায্য বিনা জর্মান চৈতন্যের অন্ধকার, পাগলামি-ভরা আধখানার সঙ্গে পরিচয় হওয়া অসম্ভব।

হোল্ডার্লিনের হাইপেরিয়ন নাকি এ-রকম একটি পুরাণ, যার সাহায্যে আমরা জর্মান চৈতন্যের গোপন অংশগুলির সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারি। এই উপন্যাসটির একটি অংশ কোথাও উদ্ধৃত দেখেছি: 'এমন এক নীরব-হ'য়ে-যাওয়া আছে যখন অন্য সব জীবন উপেক্ষিত হবে। তখন মনে হবে আমরা সব হারিয়েছি। আত্মার দীর্ঘ রাত্রি নেমে আসবে। কোনো নক্ষত্রেরই আলো এসে পৌঁছবে না। এমনকি ভেজা কাঠের জৌলুশও আমরা দেখতে পাবো না।···সেই চরম নেতির আবেশে আমাদেরই মনে হবে যেন শুধু শূন্যতার প্রভাবে আমরা জন্মেছি, শুধু সেই চরম নেতিই আমাদের বিশ্বাসের আশ্রয়, সমস্ত জীবনের কীর্তিস্বরূপ সেই শূন্যতাই রেখে যাবো।'

'চোখ নিভে গেছে, চোখের তারা উল্টো দিকে ঘোরানো। কোথাও অন্য কোনো মানুষ নেই, সর্বদাই শুধু আমি আছি। কানের দুয়ার বন্ধ, পেছনে—মস্তিষ্কের দিকে—তার খিড়কি খোলা। কোথাও কিছু ঘটছে না। আমি আছি।'

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতে, পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, বিবৃত কালের পরিবর্তন হয়েছে। যা হোল্ডার্লিন আশঙ্কা করেছিলেন শুধু, দ্বিতীয়টিতে তা নিশ্চিত

বর্তমান। উদ্ধৃতিটি ১৯২০ সালে লেখা 'পরম গদ্য' নামক এক প্রবন্ধের অংশ। লেখক গটফ্রীড বেন্।

অংশটিতে ইন্দ্রিয়হীনতার যে-বর্ণনা আছে তা শুধু ইতিহাস নয়, প্রার্থনাও বটে। বেন্-এর নন্দনতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম। কাব্যের সে-রূপটি আমরা প্রত্যাশা করি, বেন্ তাকে বাতিল ক'রে দিতে চান। বেন্-এর পরবর্তী কবি হোলথুসেনের মতে কবিত্বের আর-এক নাম ইন্দ্রিয়ময়তা।' বেন্-এর স্বভাব উল্টো বলা; তাই, তাঁর মতে, ইন্দ্রিয়মুক্তিই হ'লো স্বরলোকে পৌঁছবার একমাত্র উপায়।

১৯৫৬ সালের হেমন্তকালে বেন্ সত্যিই ইন্দ্রিয়মুক্তির লোকে চ'লে গেলেন, কিন্তু গেলেন অন্য সবাই যেভাবে যায়। তাঁর কবিতা এমন এক পরমতার সন্ধান করেছে যেখানে ঘটনা ও ঘটনার অর্থহীনতা লুপ্ত হবে, স্মৃতির ও ইন্দ্রিয়ের নির্ভরগুলি ধ্ব'সে পড়বে; কবিতা তখন কৈবল্যের সারাৎসারে নিমজ্জিত হ'য়ে, সৃষ্টির পূর্বে অনন্তশয়ান দেবতার মতো, শুধু আপনাকে ধ্যান করবে। তাঁর গদ্যে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, শুধু কবিতায় নয়, জীবনেও এই কৈবল্যকে তিনি প্রার্থনা করেন। তাঁর মতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ ছিন্ন হয়েছে, মানুষ এবং পৃথিবীর মধ্যে বিচ্ছেদ এসেছে, এখন পরম নেতিবাদেই শুধু আস্থা স্থাপন করা সম্ভব; শুধু সম্ভব নয়, সেটাই উচিত বিশ্বাস।

এ-বিশ্বাস সম্ভবত ঠিক নয়। শেষ বিচারে, প্রত্যেক কবিই ইন্দ্রিয়নির্ভর, উপমাসৃষ্টিকারী এক মানুষ মাত্র। সেজন্য, কৈবল্যপ্রাপ্তি তাঁর পক্ষে অসম্ভব। হোল্ডার্লিনের সেই 'অনভিজ্ঞ, ভীত উচ্চারণের' শত্রু অসংখ্য। শঙ্কার প্রথম কারণ দেবতারা স্বয়ং। শুধু কবি নামক এই পরম শিশুই দেবতার উষ্ণ সন্নিধানে গমন করতে পারেন। কখনো যদি তাঁরা উজ্জ্বলতর হন, কিংবা কবি যদি তাঁদের কাছাকাছি এসে পড়েন তবে অনিষ্ট সম্ভব। কিন্তু বিনাশের আরো প্রশস্ত উপায় আছে। কখনো কবির মনে হ'তে পারে লব্ধ জ্ঞানের সম্পূর্ণ উৎস তাঁরই চিত্তের অন্ধকারে, মনে হ'তে পারে তিনিই ঈশ্বর—প্রতিনিধি নন; তখন দেবতারা রুষ্ট হবেন, চেতনার ও অবচেতনার স্রোত বন্ধ হ'য়ে যাবে।

অথচ, বেন্-এর কবিতার উৎস কখনো বন্ধ হয়নি। তার একটি কারণ এই যে প্রচারিত বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর আচারের কিছু বিভেদ ছিলো। বরং, একদিকে যেমন তিনি ঘটনাকে অস্বীকার করেছেন, অন্যদিকে কবিতায় জগৎকে মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়েছেন। রিলকের সঙ্গে তাঁর অনেক প্রভেদের মধ্যে এটাই সর্বপ্রধান। রিলকের চিন্তায় বস্তুরা অনন্য চরিত্রমণ্ডিত। আশবাবপত্র, ঘণ্টা, এক টুকরো সাবান (প্রায় বলা যায় 'একজন সাবান')—তাঁকে ঘিরে যা-কিছু থাকে, তা জড় পদার্থের উদ্ভট সমাবেশ নয়, তা যেন বহুজীবনের পরিচয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের নিয়ে গ'ড়ে-তোলা সংসার। তাই, কবিতায় তারা প্রবেশ করে বস্তুর জড়ত্ব ঘুচিয়ে, যে-কোনো সম্পর্কে তারা বৃদ্ধি পায়, যে-কোনো উপমার নিবিড় আকারে তাদের তরল স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত হয় না।

কিন্তু বেন্-এর কবিতায় বস্তুদের ভিন্নতা ঘোচে না, স্থূলত্ব তারল্যে পরিণত হয় না। তাঁর কবিতায় উপমার রসায়নের অভাব আছে। উপকরণ আছে, সংযোগ নেই। তাই, তাঁর কবিতা, মনে হয়, যেন এক সুপরিকল্পিত কিন্তু পুলকহীন তালিকামাত্র।

রিলকের কবিতায় তো বটেই, চিঠিপত্রের প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতি উল্লেখ কতো বিরল। আধুনিক জীবনযাত্রার উপকরণগুলি কতো অল্পবারই না তাঁর কবিতায় প্রবেশ করেছে। আর বেন্-এর ব্যবহার এর ঠিক বিপরীত। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রভাব তিনি কখনো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে তিনি ছিলেন সাময়িকতার ভৃত্য। মর্গ আর হাসপাতালের মধ্যে তাঁর বোধ দুলেছে—একমাত্র কারণ বোধহয় এই যে চিকিৎসা ছিলো তাঁর পেশা। গদ্যে তো বটেই, কাব্যেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত বেশি উপলক্ষ্যনির্ভর।

কোনো-কোনো মানুষকে সমকালীন ইতিহাস এমনভাবে নাড়া দেয় যে তাঁদের মনে হয় আদিকাল থেকে মানুষ যে-ভাবে বিবর্তিত হয়েছে হঠাৎ, তাঁদের কালে, সেই অনিবার্য গতির মধ্যে এক পূর্বাপরবিহীন সংকট উপস্থিত হ'লো। তাঁরা যেন মানুষ নামক নাটকের তৃতীয় অঙ্কে অভিনয় করছেন। বেন্ অনেকটা এই ধরনের মানুষ ছিলেন। ইউরোপের ক্রমাবনতি তাঁর কাছে

সহজতম সত্য ব'লে মনে হয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিলো যে এবারে ইউরোপ শুধু দুই-রকম মানুষের জন্ম দেবে—প্রথম, যারা বর্বর, চিত্ত- ও বিবেকহীন, পশুশক্তির দ্বারা চালিত; দ্বিতীয়, যারা অক্ষম, প্রত্যয়হীন ও প্রশ্নজর্জর। ইউরোপের শুভ মুহূর্তে এই দুই প্রকার গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিলো। বিশ শতকের ইউরোপীয় উদারনৈতিকতা এই সমন্বয় থেকে অপজাত, কিন্তু তার মধ্যে বুদ্ধি ও বিবেকের মাত্রাধিক্য ঘটেছে। শ্বেত জাতির মৃত্যু আসন্ন, ও ইউরোপের ধ্বংসই আয়তি, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো এর পর অতি সহজ।

টমাস মান্‌ও মানুষদের স্বস্থ গৃহী ও অসুস্থ শিল্পী এই দুই সম্প্রদায়ে ভাগ করেছিলেন; কিন্তু ইউরোপের ধ্বংসের কারণ সাংসারিকতার অভাব, অথবা উদারনৈতিকতার বৃদ্ধি, এমন তাঁর মনে হয়নি। সেহেতু, ইউরোপের ক্ষয়ের সম্ভাবনা তাঁকে শঙ্কিত করেছে। অপরদিকে, উদারনৈতিকতার বিস্তার বেন্‌কে পীড়িত করেছে। তাঁর মতে, বিবেক এককালে মানুষের অন্য সব প্রত্যঙ্গের মতো ছিলো। স্বাভাবিক অবস্থায় অন্ত্র, যকৃৎ অথবা স্নায়ুর মতোই হয়তো বিবেকও প্রয়োজনীয়, কিন্তু তার অধিক বৃদ্ধি ভালো নয়। স্নায়ুসর্বস্ব যারা, অথবা যাদের যকৃৎ দেহের সবটুকুর চাইতে ভারি, তারা যেমন আদর্শ মানুষ নয়, বিবেক যাদের সহজ জৈববুদ্ধিকে নাশ করেছে তারাও ঠিক সমান বিকৃত। তাই, শ্বেত জাতির আশু ধ্বংসের সম্ভাবনা তাঁকে প্রায় পুলকিত করে। যখন তিনি এ-সম্পর্কে কোনো প্রস্তাবের অবতারণা করেন তখন তাঁর লেখার ঢং বদলে যায়; যা ভবিষ্যৎবাণী ব'লে তিনি প্রচার করতে চান, তা পাঠকের মনে হয় তীব্র ইচ্ছার আবেগে কম্পিত; শুধু তখনই তাঁর লেখা যেন জীবিত হ'য়ে ওঠে।

অবশ্য, তাঁর সকল বিশ্বাসের মধ্যেই দুঃসাহসের মহত্ত্ব লক্ষ্য করা যায়। শ্বেত জাতির ধ্বংসের ভবিষ্যৎবাণী যিনি করেছিলেন, চরাচরের আড়ালে মানুষাতীত কোনো প্রেমময় শক্তির উপস্থিতি যিনি মানেননি, তাঁর চিত্তকে কোমল অথবা সুখাভিলাষী বলা চলে না। তাঁর গদ্য দার্ঢ্যগুণে অতুলনীয়। তাতে ভাষার ও বিশ্বাসের ঋজুতার এক ভিন্ন স্বাদ আছে। যাঁর রুচি একবার

বেন্‌-এর গদ্যের দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে, সে সহজে তাঁকে অস্বীকার করতে পারবে না। তাছাড়া তিনি বৈজ্ঞানিক তথ্যকে জাদুবিদ্যা কিংবা কিমিয়া শাস্ত্রের মতো রোমহর্ষক ক'রে তুলতে পারতেন। আসলে, তাঁর পাণ্ডিত্যের মধ্যে বৈজ্ঞানিকের পরিকল্পনা ছিলো না; বরং, তাঁর মনকে পুরোনো নাবিকদের দেখা উদ্ভিদসাগরের সঙ্গে তুলনা করা চলে। যেমন সেই শুদ্ধ, উদ্ভিদঘন, নিরক্ষীয় সমুদ্রে অন্যত্রবিরল প্রাণীকুল বসবাস করে; পাহাড়ের মতো বিশাল, ও সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত, জাহাজের ভগ্নাবশেষ চারদিকে ছড়িয়ে থাকে,—তেমনি বিশ্বের সহস্র খুঁটিনাটি ও বিচ্ছিন্ন খবর, বহু প্রাচীন মতবাদের ভগ্ন অংশ, বিচিত্র তথ্যের দ্বারা অলংকৃত অনেক অযৌক্তিক ধারণা তাঁর মনের উষ্ণ পরিসরে এসে সমবেত হয়েছিলো। তাঁর গদ্যের সাহায্যে এই মনের রোমাঞ্চকর অন্দরলোকে প্রবেশ করা যায়। এবং এমন অভিযানে শুধু বুদ্ধিই তৃপ্ত হয় না, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিও পুলকিত হয়। কোনো বক্তৃতা শোনাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেউ যদি জাদুঘর ও শিল্পশালা, চিড়িয়াখানা ও বোটানিকাল গার্ডেন, বন্দর, সার্কাস এবং মেলা ঘুরিয়ে এনে হঠাৎ জানিয়ে দেয় আমাদের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে তবে যেমন হয়, বেন্‌-এর প্রবন্ধপাঠেও পাঠক তেমন অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

প্রথমে মনে হ'তে পারে এইরকম মনই কবিতার উপযুক্ত ভূমি। কিন্তু নির্বিকার সমাধিতে বাইরের ছবিকে ছায়া এবং বস্তুর বৈচিত্র্যকে বাহুল্য ব'লে বোধ হ'তে পারে। বেন্‌-এর একমাত্র উপন্যাসের নায়ক একটি ছবির সামনে দাঁড়িয়ে চিত্রিত প্রাণীটির কয়টি পা তা গোনেন—এক, দুই, তিন, চার—এই সংখ্যাগুলিতে যেটুকু প্রত্যয় লাভ করে তা বর্ণের অতিরঞ্জনে পায় না, ঘ্রাণের মোহাবেশে তা হারিয়ে ফেলে।

কবিতার পক্ষে যা হানি, কবিতা সম্পর্কে তর্কের বেলায় বেন্‌ সেই বিশ্বাসকেই সবচেয়ে চতুরভাবে কাজে লাগান। বেন্‌ জগতের জঙ্গমতার মধ্যে কোনো পরম নিয়ম দেখতে পান নি। সৃষ্টির মধ্যে যা-কিছু নিয়ম, যে-কোনো সংযোগ লক্ষ্য করা যায়, তার সব কটিই বিচ্ছিন্ন, সাময়িক ও স্থানীয়। যেমন

ভিন্ন-ভিন্ন মূল্যবোধের চতুর্দিকে ভিন্ন-ভিন্ন সভ্যতা গ'ড়ে ওঠে, সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার মধ্যে তাদের বৃদ্ধি ও ক্ষয় হয়, তেমনি বিভিন্ন সৌরসমাজ আকাশের শূন্যতার মধ্যে বর্ধিত ও বিনষ্ট হয়। এমনকি সময় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন। সৌরলোকে যে-সময়ের আধিপত্য, অন্য কোনো সুদূর নক্ষত্রলোকে সে-সময় অর্থহীন।

এই নৈরাজ্যের মধ্যে মানুষ আজ নিরালম্ব। ঈশ্বরে বিশ্বাস ক্ষ'য়ে গেছে, সুতরাং ধর্ম আর মানুষকে আশ্বাস দিতে পারে না। অর্থনীতির দ্বারা মানচিত্রিত যে-সুবিশাল, জটিল ও ভয়াবহ অরণ্যসদৃশ জগৎ মানুষের বিস্মিত চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, সেখানে কোথাও প্রাণীদল স্বার্থের জন্য নিষ্ঠুর, কোথাও জীবনরক্ষার্থে যূথচারী, অন্যত্র প্রকৃতির অটল নিয়মে সংগমাকাঙ্ক্ষী—এই জগতেই বা মূল্যবোধের নিশ্চয়তা কোথায়? কিন্তু কবিতায় কোনো-কিছু প্রবেশ করতে পারে উপমার প্রসাদে, দিব্য দেহান্তর লাভ ক'রে। মানুষ দুই পৃথক বস্তুর মধ্যে যে-অতল সংযোগ লক্ষ্য করে সেটুকু তার দান। সুদূর বস্তু শুধু এইভাবেই মানুষের মনের অন্যান্য আশবারের সঙ্গে মিলে যায়।

বেন্ বললেন, শুধু মানুষের সৃষ্টিতে নিয়ম আছে, সংহতির পশ্চাতে উদ্দেশ্যও আছে। শুধু তা-ই নয়, মানুষের সিদ্ধি শুধু তার সৃষ্টিতে। সৃজন-ক্ষমতাই একমাত্র মূল্য। মানুষের কাজের মধ্যে আমরা সাধারণত যে-সকল উদ্দেশ্য লক্ষ্য করি—চাকরির ফললাভ আহারে, সমাজ-জীবনের উদ্দেশ্য নিশ্চিন্ততা লাভ—তা বাহ্য ও গৌণ। কারণ আমরা বাঁচবার জন্য আহার করি, নিশ্চিন্ত হ'তে চাই; সুখাদ্য যদিও রসনার পুলকসঞ্চার করে, তবুও শুধুমাত্র ভোজের প্রত্যাশায় আমরা জীবনধারণ করি এমন বিশ্বাস করা শক্ত। আসলে, প্রতি কাজের মধ্যে মানুষ, তা যতো সূক্ষ্মভাবেই হোক, তার মনুষ্যত্বকে মুক্তি দেয়, তার ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করে। জড় পদার্থ ও অন্যান্য প্রাণীরা যা-কিছু করে তা কোনো-না-কোনো প্রাকৃতিক নিয়মের প্রভাবে, শুধুমাত্র মানুষ একই অবস্থার ভিন্ন-ভিন্ন পথ গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং যে যতো মাত্রায় অভ্যাস, সামাজিক রীতিনীতি ও প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে সচেতন হয়, এবং তাদের দ্বারা চালিত না-হ'য়ে ইচ্ছামতো চলে, সে

ততো তীব্রভাবে মানুষ। বেন্ লক্ষ্য করলেন যে ঈশ্বর অথবা শয়তান, পরি অথবা প্রেত, অনুষ্ঠান এবং সমাজ—এই সব প্রাচীন বিশ্বাসের অন্তর্দেশে একটি পুলকে অশেষ, যদিও আকারে ক্ষুদ্র, প্রাণী উত্তপ্ত রাখে। উত্তাপের উৎস এই প্রাণী হ'লো সেই সৃষ্টিশক্তি, যা এদের প্রত্যেকটিকে কোনো-না-কোনো সময়ে জন্ম দিয়েছিলো।

মানুষের সৃষ্টিসম্ভার অশেষ। কিন্তু অধিকাংশ সৃষ্টির আড়ালে এক বাহ্য উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়। শুধুমাত্র কবিতা উদ্দেশ্যহীন, অথচ কবিতা মানুষের গভীরতম অভ্যাসের বিরোধী, তার সকল সৃষ্টির চেয়ে নতুন। ভাষার স্বভাব নয় ছন্দোবদ্ধ হওয়া, বুলি স্বভাবতই মুখে আসে। জন্মের পর থেকেই মানুষ ভাষার যে-ব্যবহার শেখে তা সৃষ্টির প্রতিবন্ধক; অথচ, কবিতার ভাষায় ও বাজারের ভাষায় এক আপতিক সাদৃশ্য নেই তা তো নয়। পৃথিবীর জড়ত্ব মানুষের সামনে যতো ফাঁদ পেতেছে, এটাই হ'লো তাদের মধ্যে সবচেয়ে চতুর ও সবচেয়ে সার্থক। কারণ, অর্থনীতি, এমনকি দর্শন ও এই প্রকার অন্যান্য সব জটিল বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে গেলে কিছুটা অভ্যাস ও সাধনার প্রয়োজনীয়তা যদিও সবাই স্বীকার করেন, এমন কে আছেন যিনি মনে করেন না যে, যেহেতু মাতৃক্রোড়ে তাঁরও বাক্‌স্ফূর্তি হয়েছিলো, সেহেতু কবিতার উপর তাঁর অধিকার বর্তেছে?

কবিতা (ও অন্যান্য শিল্পকর্ম) তাই মানুষের শ্রেষ্ঠ কৃত্য; মৃত ধর্মের পরিবর্তে মানুষের দেবত্বপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। যে-পৃথিবীতে মনের লেশ নেই, যে-আদি-অন্তহীন জড়ত্বের ভার মানুষকে সতত পীড়িত করে, যে-অটল চৈতন্যহীনতা সকল প্রাণীর শত্রু, সেই জড়ত্বের উপর আমরা শুধু এইভাবেই ক্ষমতা বিস্তার করতে পারি। ঘটনা যদি মানুষের ইচ্ছামতো না চলে, যদি সৃষ্টির আগেকার সেই আদি নৈরাজ্য ঘোর হ'য়ে নেমে আসে, তবু কবিতার নিভৃতে আলো জ্বলবে, যা বিচ্ছিন্ন ছিলো তা সংযুক্ত হবে, যার মধ্যে শুধু ছিলো অচেতন পদার্থের মানুষের প্রতিকূল সমাবেশ তা চৈতন্যের সংযোগে মানবীয় হবে।

কবিতায় বস্তু চৈতন্যের রসায়নে মানবীয় হয়—এটুকু ব'লেই বেন্ ক্ষান্ত হননি। ঐ শোধনপ্রক্রিয়ার জন্য জড়ত্বে—এটা তিনি বরদাস্ত করতে পারেননি। তাঁর বিশ্বাস ছিলো যে আগামী কালের কবিতায় এমনকি বস্তুরাশির স্মৃতিটুকু থাকবে না। তাঁর মনে হয়েছে যে কবিতায় কল্পনার সারটুকু ছাড়া অন্য কিছুর স্থান থাকা উচিত নয়। আর তাই তাঁর ইচ্ছা ছিলো যে এই মুহূর্তেই চৈতন্যের সঙ্গে জড়জগতের সংযোগ লুপ্ত হোক।

এই পরম কবিতার কল্পনা আধুনিক কবিমাত্রেরই প্রিয়। আদি সাহিত্যের কলেবর ছিলো বিপুল, মানুষের সকল চিন্তাই তাতে স্থান পেতো। মহাভারতের বিশাল অরণ্যে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর উদ্ভিদ ও সমাজের উপকারী ওষধি সমানভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমে, কল্পনার সন্তানেরা হিশেবি বেনেতে পরিণত হ'লো। এখন তাদের প্রতিপত্তি যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, মেজাজও বদলেছে। কবিতা ও বিজ্ঞান আজ বিচ্ছিন্ন। সমাজতত্ত্বের ধূসর গোঁড়ামি কবিতার অরিদলের একগুঁয়েমি বৃদ্ধি করেছে। এর ফলে কবিতার ব্যাপ্তি যদিও হ্রাস পেয়েছে ঘনত্ব বেড়েছে। মানুষের সব প্রশ্নের জবাব আজ আর কবিতায় নিহিত নেই, তাই প্রতি কোষ তার রসে টনটনে। আধুনিক কবিতা আকারে হ্রস্ব, প্রতি ছত্রে তার অর্থের ধাতুশিলা এমনভাবে গ্রথিত যে কখনোই খননের প্রয়োজনীয়তা ফুরোবে না।

উনিশ শতকে কবিতা থেকে যেমন অন্যান্য তত্ত্ব বিচ্ছিন্ন হ'লো, বিশ শতকে কবিও তেমনি অপসৃত হলেন। শুধু সৃষ্টির মুহূর্তটি রইলো; সৃষ্টির আগে কবি কী ভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, বিবিধ উপকরণ কখন, কোথা থেকে এসে জড়ো হ'লো, বিস্ফোরণের সংঘাতে উপকরণগুলি কেন গ'লে-বেঁকে চেতন হ'য়ে গেলো,—ঐ-সবের কিছুই কবি আর বলেন না। গটফ্রীড বেন বললেন, সৃষ্টির অলৌকিক ঘটনা দেখবার জন্য, দর্শকদের সাহায্যার্থে, পুরাকালের কবিরা যে-সব রেলরাস্তা ঐ সুদূর তীর্থ পর্যন্ত গ'ড়ে তুলতেন, ভ্রমণকারীদের জন্য যে-সব টাইমটেবল, তীর্থের চতুষ্পার্শ্বের মানচিত্র, অলৌকিক ঘটনার ইতিহাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করতেন, সে-সবই শুধু যে কবিতায় বর্জিত হবে তাই নয়, শুধুমাত্র

অলৌকিক ঘটনাটি থাকবে কিন্তু ঘটনার উপকরণ কিছু থাকবে না, পাপহরণী ক্ষমতা থাকবে স্রোতের, কিন্তু জল থাকবে না, তীর্থটির অস্তিত্ব থাকবে কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থিতি থাকবে না। বেন্ কল্পনায় দেখলেন কবিতায় সৃষ্টি আছে, কিন্তু সৃষ্ট বস্তু নেই। বিস্ফোরণের ঘটনাটি আছে, কিন্তু আলো, শব্দ অথবা ধোঁয়া নেই। রসায়নের প্রক্রিয়াটুকু আছে, কিন্তু কোনো গন্ধ অথবা জ্বালা নেই, শেষে কোনো তলানি প'ড়ে থাকে না। সীমাহীন শূন্যতার মধ্যে কবিতাও পরম শূন্যতায় পরিণত হ'লো।

কিন্তু শূন্যতা তো অসংখ্য শব্দের মধ্যে আরেকটি শব্দমাত্র, উচ্চারণ করা চলে, বোধ করা যায় না। যে-কবিতার অস্তিত্ব আছে, যে-কোনো কবিতা যা আমরা পড়েছি. প'ড়ে না-থাকি লেখা হয়েছে, লেখা না-হোক কেউ ভেবেছে, তার আয়তন আছে, গাঢ় চিত্রকল্প, রোমাঞ্চকর ধ্বনি ও আরো অনেক কিছু আছে। এতো না থাক, অন্তত কালের বিস্তারটুকু থাকতেই হবে। এবং, যেহেতু বেন্-এর কবিতাও বইয়ের পাতায় ছাপা অক্ষরের সমষ্টি মাত্র, তাঁর পরম কবিতাও আসলে অশুদ্ধ, জড়ত্বের ভারে জাগতিক।

বেন্ জড়বস্তুর ভয়ে ভীত ছিলেন। জড়ত্ব বহু প্রকারের। কবিতায় যে-শব্দ, যে-ছন্দ স্বভাবত আসে তা জড়বস্তুর কৌশল, অভ্যাসের ছদ্মবেশ। সুতরাং বেন্ সর্বদা সতর্ক ছিলেন, কবিতায় যেন অতর্কিত কিছু না ঘটে। কখনো তিনি প্রহরীদের নিদ্রিত হ'তে দেন নি, সচেতন প্রভুত্ব আলগা হয়নি। শব্দগুলিকে তিনি অনবরত অসম্ভব সম্পর্কে বাঁধতে চেয়েছেন, মিশ্র চিত্রকল্পকে আরো সুদূর, ধ্বনিকে আরো অযৌক্তিক, বস্তুকে আরো বিভক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তার ফল হ'লো বিপরীত। আসলে, একেবারে নতুন কিছু লেখা যায় না। প্রাচীন ছাঁদ, পুরোনো কবিতার ঢং, কবিতা পড়ার ছেলেবেলার অভ্যাস—সব ঘুরে-ঘুরে আসে। সত্যই যা নতুন তার জন্য কবি ফাঁদ পাতবার কৌশল আয়ত্ত করতে পারেন, শিকারের অপেক্ষায় সজাগ হ'য়ে ব'সে থাকবার উপযোগী মেজাজ ধীরে-ধীরে গ'ড়ে তোলেন, ঈপ্সিত মুহূর্তে এলে তা যাতে চিনতে পারেন এমন শিক্ষা তাঁর থাকা উচিত। ইচ্ছামাত্রই নতুন

কবিতা রচনা করবার ক্ষমতা কারো নেই; এমনকি মালার্মেও যে তা পারতেন না তার প্রমাণ তিনি ঐ কয়টি কবিতামাত্র রচনা করেছিলেন এবং বন্ধ্যাত্বের ভয় কখনো তাঁর ঘোচেনি। যা জানা আছে তাই শুধু ইচ্ছা করা চলে। সেহেতু বিনীত কবি ছন্দ, উপমা ও মিলের আশ্রয় নেন। ছন্দ ও মিলের কাঠিন্য, এমনিতে, আধুনিক. কবির কাছে খুব দামি মনে হয় না; আসলে, তিনি ঐ সমস্ত কৌশলের আশ্রয় নেন যাতে অভাবনীয় সংযোগগুলি আবিষ্কৃত হ'তে পারে, মিলের জন্য যাতে চিন্তার লক্ষ্য বদলে যায়, আর উপমা—আধুনিক কবির সেই দিব্যাস্ত্র, তাঁর কিমিয়ার সেই গোপন দ্রাবক যাতে সব-কিছু গ'লে যায়—কোনো-কোনো পরম মুহূর্তে এমন প্রশস্ত ইঙ্গিত ছড়িয়ে দেয় যা কবি ভাবতে পারেন নি, শুধু উপমার দায়ে প'ড়ে ভেবেছেন। কিন্তু গটফ্রীড বেন্ তাঁর কবিতাকে এ-সব সুযোগ গ্রহণ করতে দেন নি। তাঁর কবিতায় ছন্দ আর মিল সেই অটল নিয়ম, যার উপস্থিতি তিনি চরাচরে লক্ষ্য করেননি; উপমার সুপরিকল্পিত অভিনবত্ব তাঁর ইচ্ছার সফলতায় হিম হ'য়ে জ'মে থাকে, কবিতার গতি তাঁর চালনায় কখনোই বিপথগামী হ'তে পারে না, তাই প্রতি পদক্ষেপে আড়ষ্ট হ'য়ে থাকে।

বেন্ স্বাধীনতাকে ইচ্ছাপূর্তি ব'লে ভেবেছিলেন। কিন্তু ইচ্ছার পূরণ বহুভাবে সম্ভব হ'তে পারে। কবি মাত্রেই নতুন কবিতার অন্বেষণ করেন। সেজন্যই তিনি নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করেন যাতে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি প্রখর হয় এবং বোধে বিচিত্র অনুভূতিগুলির অন্বয় ঘটে; তিনি এমন কবিতা পাঠ করেন যাতে ভবিষ্যতের উৎকৃষ্ট কবিতা কী প্রকারের হবে তার কতকটা তিনি আঁচ করতে পারেন। কিন্তু সেই পরম আবিষ্কারটি আগে ঘটে না, রচনাটির প্রক্রিয়ার মধ্যেই আকস্মিকের সম্ভাবনা নিহিত। যিনি শুধু ইচ্ছার আক্ষরিক পূরণ চান তিনি দেখবেন যে পুনরাবৃত্তি ছাড়া তাঁর গতি নেই।

টোব্রিয়াণ্ড দ্বীপবাসীগণের মধ্যে মানুষের যে-জন্মবৃত্তান্ত প্রচলিত আছে সেই পুরাণে বেন্-এর অপরাধের এক উপমা মেলে। কথিত আছে যে

আদিমাতা পৃথিবীতে নেমে এলেন সন্তানের আকাঙ্ক্ষায়। কখনো পাহাড়ের চুড়োয়, কখনো বা প্রবালদ্বীপে সমুদ্রের উপকূলে, গভীর আলস্যে তিনি শয়ান থাকতেন। নগ্ন দেবীর গর্ভে বায়ু ও ধূলিকণা, সূর্যরশ্মি ও সমুদ্রের লবণাক্ত জল প্রবিষ্ট হ'লো। সেই বিচিত্র বস্তুগুলির মিলনে প্রাণের ভ্রূণ গ'ড়ে উঠলো। বৎসরের পর বৎসর নতুন-নতুন প্রাণী তিনি গর্ভে ধারণ করলেন। এই ভাবে প্রাণীকুলের জন্ম হ'লো। শেষে, এক চন্দ্রগ্রহণের সময় যখন তিনি এক গুহায় শয়ানা, তখন সেই গুহার আবদ্ধ গন্ধ ও বাতাসের প্রভাবে মানুষের ভ্রূণ জন্মালো। দশম মাসে এক কন্যা ভূমিষ্ঠ হলেন। সেই কন্যার যৌবন আগত হ'লে, তাঁকে গর্ভধারণের রহস্য বুঝিয়ে দিয়ে, আদিমাতা পৃথিবী ত্যাগ করলেন। প্রথম বৎসরেই কৌতূহলী নারী সেই গুহায় প্রবেশ করলেন, এবং স্বীয় মাতা তাঁর জন্মকালে যা-যা. করেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করলেন। বৎসরান্তে প্রথম পুরুষ জন্মালো, দ্বিতীয় মানবী নয়। আশাহত রমণী তখন মাতার মতো নির্বিচার হলেন, কিন্তু তিনি আবিষ্কার করলেন অন্য কোনো প্রাণীধারণের ক্ষমতা তাঁর লুপ্ত হয়েছে। এইভাবে সৃষ্টিপর্বের সমাপ্তি হ'লো, পুনরাবৃত্তির পালা শুরু হ'লো।

প্রাচীনেরা জানতেন যে আলস্য বিরতি নয়। যে-মানুষ কখনই অনায়াস হ'তে পারে না, ও যার সকল শ্রম এক পরিচিত অভীষ্টসিদ্ধির জন্য, সে যা চাচ্ছে তাই শুধু পাবে, এবং এর চেয়ে কঠিন অভিশাপ আর-কিছু নেই। মধ্যযুগের রাসায়নিক সোনা চেয়েছিলেন, তাঁরা তা পাননি এটা পরবর্তী মানুষের সৌভাগ্য। কিমিয়া এমন এক বিদ্যা যার মধ্যে বিষয়বুদ্ধির অথবা তাড়াহুড়োর স্থান নেই। 'আধ চামচ সাপের বিষ, নীলাচূর্ণ ও কর্পূরের সঙ্গে মিশিয়ে, অমাবস্যার রাত্রে হিরাকসে জ্বাল দেও···' এই হ'লো সেই ফরমূলা যার ফলে আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের জন্ম হ'লো। কলম্বস ভারত না-ভাবলে আমেরিকা যেতেন না। ঈথারের বদলে বৈজ্ঞানিকেরা মহাশূন্যজয়ে সমর্থ হলেন। আদিকন্যা ভেবেছিলেন তাঁর মাতা যা করেছিলেন তিনি আবার তা-ই করবেন। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হ'লো কিন্তু অসীম জন্মের স্রোত গেলো

বন্ধ হ'য়ে। তাঁর দৈব ক্ষমতা ক্ষ'য়ে গেলে তিনি মানবী হলেন। একই অপরাধে বেন্‌-এরও সৃষ্টিক্ষমতা লুপ্ত হ'লো। যে-মানুষ প্রাকাম্য ঈশিত্ব ও বশিত্ব আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি কাব্যের আসল সম্পদ—অণিমা, লঘিমা ও সাফল্য লাভে বঞ্চিত হন।

অথচ কাব্যে যে-বশিত্ব চাওয়া তাঁর অন্যায় হয়েছিলো, তা স্বদেশবাসীর হৃদয়ে তিনি না-চেয়ে পেলেন। মহাযুদ্ধের পর জর্মানি বিভক্ত হ'লো, গর্বিত বিদেশী সেনাদল ঐহিক পরাজয়ের সংবাদ প্রচার করলো এবং নৈতিক অধঃপাতের দায়ে প্রত্যেক জর্মানকে বিড়ম্বিত করবার জন্য দেশী-বিদেশী অসংখ্য নীতিবাগীশের আবির্ভাব হ'লো। যুদ্ধে পরাজয় বহু রাষ্ট্রের ভাগ্যেই ঘটে, কিন্তু এমনভাবে বিশ্বনিন্দিত কোনো জাতি হয়নি। যখন প্রত্যেকে নিন্দা ও অভিসম্পাত করেছেন তখন জর্মানগণের আপনার বলতে শুধু একজনই ছিলেন যিনি অপর সকলের মতো আরম্ভে অল্প একটু অন্যায় করেছিলেন, মধ্যে ভুল বুঝতে পেরে, আত্মনিগ্রহে প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা করেন ও অন্তে সবার সঙ্গে জাতির লজ্জার ভাগী হয়েছিলেন। যখন সমুদ্রের ওপার থেকে টমাস মান্‌-এর কঠিন বিচারকের কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল, যখন বিদেশ থেকে গেঅর্গে জানালেন যে জর্মানির সঙ্গে সংযোগ রাখবার প্রয়োজন আর তিনি বোধ করেন না, যখন গ্রোপিয়াস ও ব্রেখ্‌ট আমেরিকায় চ'লে গেলেন, তখন আর কে ছিলেন যিনি অন্তত উপস্থিতির আঁচে শীতার্ত পাপীজনদের উষ্ণতা জুগিয়েছিলেন। তাই, যদিও বেন্‌-এর গদ্যে এমন জমকালো আত্মময়তা, প্রাকৃতজনের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা এতো সুপরিচিত, তরুণ জর্মান তাঁকে এমনকি রিলকের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। তাঁর আচরণে জর্মানগণ সেই আত্মীয়তা অনুভব করেন যার লেশ তাঁর কবিতায় অথবা রিলকের চরিত্রে পান না। কবিতায় যিনি দৈব ক্ষমতা চেয়েছিলেন, জীবনে তিনি অন্যান্য মানুষের মতোই অসংখ্য ভুল করেছিলেন। হয়তো সেজন্যই তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত পত্রাবলি তাঁর কবিতার চাইতে অধিক পাঠক লাভ করেছে।

এমন পরিণতির সংকেত ঐ পুরাণে নিহিত আছে। অনন্ত সমুদ্রে ভাসমান

প্রবালপুঞ্জে মহাদেশের ব্যাপ্তি তো নেইই, অন্যান্য দ্বীপের স্থিতিও নেই। ঐ নারিকেল-শোভিত ভেলায় চ'ড়ে যখন আদিমাতা লোকান্তরে চ'লে গেলেন তখন কন্যা দেবীত্বের ক্ষমতাই শুধু পেলেন, সাহচর্যের উষ্ণতা পেলেন না। ঐ নিঃসঙ্গ রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার তুল্য অভিজ্ঞতা শুধু আধুনিক কবি লাভ করেছেন। কবির অভিযান সমুদ্রযাত্রার চেয়ে বিপজ্জনক, তাঁর চৈতন্যের তরী ভেলার চেয়েও ক্ষীণ ও আন্দোলিত, ছন্দ উপমা ও মিলের অনিশ্চিত হাওয়ায় তাঁর গতি। চতুর্দিকের শূন্যতা ভ'রে তোলবার জন্য তিনি যে-সব ছায়ার আকৃতি গড়েন তাদের চরিত্র কিংবা অবয়ব ঠিক মানুষের মতো নয়, তারা শুধু মানুষের উপমেয়। তারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র, তাদের সংখ্যা অগণ্য ও বিবর্তন অন্তহীন। যিনি এই ছায়ার সংসারে বাস করেন তাঁর অস্থিরতার শেষ নেই। যখনই শূন্যতা পীড়াদায়ক মনে হয়, অন্য কোনো মানুষ—নগ্ন নারীর উষ্ণতা, সবল পুরুষের আশ্রয় প্রয়োজনীয় মনে হয়, তখন তিনি শুধু আবার একটি ছায়ার পুতুল গড়েন, আরেকটি অতিরিক্ত কণ্ঠে শূন্যতার আর্তনাদ জাগে। সেই আদিকন্যার মতো তাঁরও দৈব ক্ষমতা অভিশাপ মাত্র। 'ফুল নেই, পাখি ডাকে না, নাম ধ'রে ভরা গলায় ডাকে না কেউ। অচেনা দেশ, অস্থায়ী ঘর, শূন্য ঘরে নিঃসম্বল প্রাণ।'—কে আছে যার কোনো-কোনো দুর্বল মুহূর্তে এই শূন্যতার দেয়ালগুলি ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে না করে, যে দেবতার বদলে মানুষ হ'তে না চায়।

গটফ্রীড বেন্‌, ঐ আদিকন্যার মতো, এক মানবোচিত দৌর্বল্যের জন্য ঈশিত্ব থেকে বঞ্চিত হলেন। কারণ, আসলে, তাঁর কাব্যে ঐ পশুত্বের বন্দনা ও বিবেকের বিরুদ্ধাচার মনে হয় যেন দুর্বল মানুষের অজুহাত, তাঁর যুগের ও দেশের সপক্ষে আরেকটি যুক্তিসংগ্রহের চেষ্টা। তাঁর জীবন ও কাব্যের মধ্যে যে-আপতিক বৈসাদৃশ্য দেখা যায়, ক্রমশ তা এক গভীরতর সংযোগের আবরণ ব'লে প্রতিভাত হয়। আমরা আবিষ্কার করি যে তিনি নিতান্তই এক কালবদ্ধ মানুষ; যে-কঠিন বিশ্বাস তিনি প্রচার করেছেন তা আসলে নিজের সাফাই; পুরুষকারের বন্দনা ঘটনালাঞ্ছিত মানুষের ইচ্ছাহীনতার প্রমাণ।

কারণ, যে-পশুশক্তির বিস্তার তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তা নিষ্ঠুরতার পক্ষে কোনো যুক্তি নয়। তিনি বললেন যে বিবেকবান ব্যক্তির এ-যুগে বাঁচা কঠিন; যেন বিবেকের সমর্থন শুধু কার্যকারিতায় পাওয়া যায়। তিনি বললেন, প্রকৃতি নিষ্ঠুর; যেন সে-সংবাদ নতুন, যেন, যেহেতু কোনো-কোনো জন্তু তাদের সন্তান ভক্ষণ করে সেহেতু মানুষের নিয়মও বদল করা উচিত। জগতে যদি নিষ্ঠুরতার বৃদ্ধি ঘটে তা থেকে প্রমাণ হয় না যে এই পরিবর্তন কল্যাণকর, অথবা পশুত্বের বন্দনা মানুষের কৃত্য।

আসলে যে-একমাত্র বদল একালে হয়েছে তার নমুনা গটফ্রীড বেন্ স্বয়ং। গত যুগেও খাদ্য ও আচ্ছাদনের সন্ধানে মানুষ হয়রান হয়েছে, অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়মে পৃথিবী লাটিমের মতো ঘুরেছে, অরণ্যে শ্বাপদ ও নগরে দ্বিপদ জন্তু সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। কিন্তু যা ঘটছে তা-ই উচিত, এমন কথা কারো মনে হয়নি। একালে, এমন কি রাষ্ট্র গড়া হয় ঘটনাকে নৈতিক ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়ে। ঘটনাকে সমর্থন করবার জন্যেই আজ চৈতন্যের প্রয়োজন; বুদ্ধি আজ কল্পতরু, যে-কোনো নিষ্ঠুরতা—জাতির ও ব্যক্তির স্বাধীনতা অপহরণ, মৃত্যুদণ্ড, সাম্রাজ্য ও মুনফা, কারাগার ও গুপ্তচর—সব-কিছুর সমর্থনেই যুক্তি থরে-থরে সাজানো। যদিও মানুষের সকল আচারই পরিবর্তনীয় (আর, সেহেতু, শোধনীয়), তবুও প্রত্যেকটির সমর্থনে অসংখ্য অজুহাত আবিষ্কার করা চলে; অবশ্যম্ভাবী, প্রাকৃতিক, সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়—এ-রকম বিশেষণ মৃত্যুদণ্ড, বর্ণাশ্রম, বহুবিবাহ, যুদ্ধ এবং আরো অনেক এবম্বিধ আচার ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। এক অদ্ভুত জড়বাদের প্রভাবে আমরা ভাবতে শিখেছি যে, যেমন অটল নিয়মের প্রভাবে জীবনদাত্রী জল কালক্রমে হিমধারায় ভূপৃষ্ঠ নিমগ্ন করে, এবং সময় হ'লে আবার আপনা থেকেই অপসৃত হয়, যেমন এই প্রসার ও সংকোচনের জন্য আমরা আক্ষেপ করতে পারি না, তেমনি, একদিকে, কালক্রমে সমাজের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী; অন্যদিকে, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান কোনো-না-কোনো কালে প্রয়োজনের অমোঘ তাগিদে যুক্তিপূর্ণ।

বেন্-এর মতে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে একটি ছাড়া অল্পই প্রভেদ আছে। মানুষেরা কখনো-কখনো কল্পনার পরিচয় দেয়; যন্ত্র, বিজ্ঞান, সমরকৌশল, পুরাণসৃষ্টি,—এই সব প্রমাণ করে যে কোনো-কোনো মুহূর্তে মানুষ পুরোনো আচার ত্যাগ ক'রে ভিন্ন উপায় গ্রহণ করে। কিন্তু, এমনিতে, মানুষের ব্যবহারে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না। তার সামাজিক চিন্তা নিতান্তই প্রাকৃতিক। এমন কি দাসপ্রথা মানুষের আগে পিঁপড়েরা আবিষ্কার করেছে। শিল্পবিপ্লব যে চৈতন্যহীন শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি করেছে তাদের তুলনাও দক্ষিণ আমেরিকার সেই আশ্চর্য পিঁপড়েদের মধ্যে পাওয়া যায়, যারা যুদ্ধে ধৃত অপরদলীয় পিঁপড়েদের ক্ষুধা ও যৌন ক্ষমতা নাশ ক'রে দেয়, পরে সেই নিরাসক্ত বন্দীদের আহার্য গ্রহণ করতে বাধ্য করায় এবং অভাবের কালে তাদের জীবন্ত ভাঁড়ার হিশেবে ব্যবহার করে।

সুতরাং মানুষের সভ্যতাগুলি যদি একের পর এক বিকশিত ও বিনষ্ট হয়, তবে এই প্রক্রিয়াকে প্রাকৃতিক ছাড়া আর কী-ই বা বলা যেতে পারে, এবং তাদের বিনাশে আক্ষেপেরই বা কী আছে? এবং সভ্যতাগুলির ক্ষয়ের কারণ বুদ্ধির অভাব কিংবা নৈতিক পতন নয়। একটি গাছের রস বৃদ্ধি পেলে তবে পাতা সবুজ, বাকল সজল হয়; সে-গাছের ফল রসনায় তৃপ্তিকর, সে-ফলের মুকুল ঘ্রাণে মোহাবেশ সঞ্চারে সমর্থ—এই কারণে গাছের আয়ুবৃদ্ধি ঘটে না। তেমনি, বুদ্ধি ও নীতিবোধ সভ্যতার জীবনের প্রকাশ, সে-জীবনের কারণ নয়। সুতরাং সামাজিক নীতিরক্ষার্থে কড়া পাহারাওলীর ব্যবস্থা ক'রে, অথবা বুদ্ধিতে শান দিয়ে, কোনো মৃতপ্রায় সভ্যতাকে বাঁচানো যায় না; মরা পাতায় সবুজ রং ঢেলে কে আর গাছকে বাঁচাতে পারে? কয়লার একটি ঢেলায় যতোটুকু তাপ তা পুড়িয়ে ফেললে ফেরৎ পাওয়া যায় না। প্রত্যেকটি সভ্যতা সৃষ্টিমুহূর্তে যেটুকু শক্তি আহরণ করেছিলো তা ফুরিয়ে গেলে রোদন ক'রে লাভ নেই। বরং পুরোনো সব নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে সভ্যতা যদি স্বেদ ও শোণিতের সরোবরে অবগাহন করে, তবে ব্যক্তি যে-উপায়ে শিল্প সৃষ্টি করেন ঠিক সে-উপায়ে সভ্যতাও নতুন তেজ লাভ করতে পারে।

লক্ষ্য করা যাবে যে সভ্যতার এই নতুন বিজ্ঞানের আড়ালে জাদুমন্ত্রে বিশ্বাস লুকিয়ে আছে। এক দার্শনিক মতে কয়েকটি মানুষ নিয়ে গড়া একটি প্রতিষ্ঠান হঠাৎ এক অলৌকিক মুহূর্তে ইতিহাস, প্রাকৃতিক নিয়ম, সব-কিছুর প্রতীক ও প্রভুতে পরিণত হয়। সমান অলৌকিক উপায়ে, বেন্‌-এর সমাজদর্শনে, যা ধ্বংস তা-ই নবজন্মের উৎসে পরিণত হয়। এবং আমরা লক্ষ্য করি যে যেমন বেন্‌-এর নতুন কবিতার খোশা ছাড়ালে সেই এক পুরোনো কবিতার আঁঠি বেরিয়ে পড়ে, তেমনি ধ্বংসের তাণ্ডবে পুরোনো স্বেচ্ছাচারই ক্ষমতাবিস্তার করে; নতুন সভ্যতা নয়—মধ্যযুগীয় চার্চ, কনস্তান্তিনোপলে ঐহিক প্রভুর কর্তৃত্ব—এই সব প্রাচীন আধারের কঠিন আঁটো বাঁধুনিতে ধরা পড়ে নৈরাজ্য। যেমন মিল, উপমা, পূর্বতন কবিদের দৃষ্টান্ত আসলে নতুন হ'তে সাহায্য করে, তেমনি পুরোনো সমাজের বিশ্বাসগুলি—অন্যায়ের প্রতি বিদ্বেষ, ব্যক্তির স্বাধীনতা, ভাষার সততা ও যুক্তির বহুত্বের উপর আস্থা—এগুলি সভ্যতার বৃদ্ধিরই সহায়ক। এগুলিকে বিসর্জন দিলে স্বেচ্ছাচারের আদিম প্রকৃতিকে শুধু মুক্তি দেওয়া হয়।

বেন্‌ অবশ্য শেষ জীবনে তাঁর যুক্তির নিষ্প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিলেন। যে-কোনো মত পুরোপুরি কাজে খাটালে কেমন হয় তার উদাহরণ আমাদের শতকে বহু আছে। এবং সে-রকম একটি তুমুল দৃষ্টান্ত যে-দেশ, সে-দেশে তিনি প্রলয়তুল্য দুই দশক অতিবাহিত করেছিলেন। বেন্‌ দেখলেন চতুর্দিকে স্বেদ ও শোণিতের বর্ষণ শুরু হ'লো। বৃদ্ধ বেন্‌ সেই হত্যালীলার সপক্ষে সোচ্চার হবার দায় এড়াবার জন্য সেনাবাহিনীতে চিকিৎসকের কাজ নিলেন, এবং, কিছুকাল পরে ছাড়া পেয়ে, এমন নিঃশব্দ নির্জনতায় প্রবেশ করলেন যে সেই নতুন বেন্‌কে জর্মানগণ তুষারসমুদ্রে নিমগ্ন হিমশৈলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বৃদ্ধ বয়সে বেন্‌ ইউরোপের আত্মাকে নতুন ক'রে চিনলেন—যে-ইউরোপ সাম্রাজ্যের বিস্তার ও বিরোধিতা করেছে, মারণাস্ত্র ও পেনিসিলিন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে, বিশ্ববাসীকে রাউলাট আইন ও হেবিয়াস কর্পাস-এর আস্বাদ দিয়েছে, যন্ত্রের সৃষ্টি ক'রে সেই যন্ত্রকেই ভেঙেছে, নিজেদের পাদ্রিকে

বিদেশে পাঠিয়েছে আবার নিজের সংস্কৃতিকে অস্বীকার ক'রে দেশত্যাগী হয়েছে।

বেন্‌ লক্ষ্য করলেন যে তাঁর বিদ্রোহও নতুন নয়। সেই সব আশ্চর্য বিদ্রোহীদের দৃষ্টান্ত তাঁর মনে এলো,—পোপের শত্রু দান্তে, চার্চের শত্রু মিকেল-আঞ্জেলো এবং ইস্পানি সন্ত জন, কৃপণ মধ্যবিত্তের শত্রু রেমব্রান্ট, পাদ্রিদের শত্রু গইয়া, 'প্রগতি'র শত্রু বোদলেয়ার,—যাঁদের কৃপায় তিনি তাঁর নেতিবাদের আর-এক অর্থ খুঁজে পেলেন। 'ঐ নেতিবাদ কতো ভিন্ন প্রকারের ভূমি থেকে সংগ্রহ করেছে! ড্যুরার ধর্মে যা লাভ করলেন টলস্টয় মানুষের নীতিতে তা-ই পুষ্টি পেলেন, ভাবনায় ও অভিধায় কাণ্ট যা আহরণ করেছিলেন গ্যেটে মানুষের চরিত্রে তাই সংগ্রহ করলেন, আর বালজাক সমাজের রীতির মধ্যে আত্মার পুষ্টি খুঁজে পেলেন। তাঁদের প্রত্যেকের চৈতন্য এই নেতিবোধে আচ্ছন্ন ছিলো। কিন্তু কী অসীম যত্নে তাঁরা এই পরম শূন্যতাকে গোপন রাখতে চেয়েছেন, কতো দ্ব্যর্থক প্রশ্নের বর্ম দিয়ে ঢেকেছেন নিজেদের, বহু শতাব্দী ধ'রে শ্বেতজাতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিগণ এই গোপনতাকে নিজেদের দায়িত্ব ব'লে ভুল করেছিলেন (ইউরোপে শিল্প)।' বেন্‌-এর মনে হ'লো যে তাঁর নেতিবাদ ইহজগতের কোনো সম্রাটের গড়া শ্মশানের সমর্থন করে না, আসলে তা সৃষ্টিশক্তির প্রকারান্তর। 'অথচ তাঁরা জানতেন কোন গভীর এবং শীতল এবং শূন্য গহ্বর থেকে আত্মা তার সৃষ্টির রসদ সংগ্রহ ক'রে আনে, নেতিবোধ সেই অজৈব বস্তুর উপস্থিতির স্বীকৃতিমাত্র।' কোনো ধর্ম নয়, শক্তিমান প্রভু নয়, শুধু সৃষ্টির ঐ সব উজ্জ্বল দেবতাদের দৃষ্টান্ত তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে সাহায্য করলো। যৌবনে তিনি অনেক পরিব্রাজনে বিত্ত খুইয়ে ফেলেছিলেন; কিন্তু কবির কী অধিকার আছে জগৎকে উদ্ধার করবার? মিল্টন কি ঈশ্বরের সাফাই গাইতে গিয়ে নিজের ক্ষতি করেননি? গ্যেটে কি সব বিপরীতের সমন্বয় খুঁজতে গিয়ে এক মহৎ কবিতার হানি করেননি? তিনি নিজের পূর্বকৃত অপরাধে লজ্জিত হলেন না; আরো বড়ো কতো মানুষ একই ভুল তো করেছেন। অবশ্য, শেষ বয়সে সময় অল্প। কিন্তু দৌড়বার কোনো

দরকার নেই। তাড়াহুড়ো করা অন্যায়—তিনি নতুন ক'রে বললেন। এখন শুধু কাজের সরোবরে স্থির হ'য়ে ডুবে থাকা। শেষ বয়সের কোনো কবিতাই প্রায় প্রকাশ করলেন না। কিন্তু মধ্যবয়সে লেখা কবিতাটি এখনই শুধু সত্য হ'লো।

'A word, a gleam, a fire, a flight,
flame-jet and darting star in sky,
then monstrous dark resumes the night
in empty space : the World and I.'

অবশ্য, অনেকে এখন দর্শন চায়, অপরিচিতেরা চিঠি লেখেন—তরুণ কবিরা পরামর্শ চান, কেউ-কেউ অকারণেই বিরক্ত করে। বেন্ এ-সব কমিয়ে দিলেন, কিন্তু রূঢ়ভাবে নয়, ধীরে-ধীরে। চিঠিগুলির ভাষা নরম ও সংক্ষিপ্ত; ভালোমন্দ বিচারের দায়িত্ব এককালের এই নিষ্ঠুর সমালোচক ছেড়ে দিলেন। কৌতূহলী ব্যক্তিরা, এবং যারা শুধুমাত্র একটু মজা পেতে চায়, আর তাঁকে খুঁচিয়ে কোনো উষ্ণ উক্তি বের করতে পারে না। ভক্তেরা আর প্রেরণা পায় না। কয়েকটি প্রবন্ধ যা প্রকাশিত হ'লো তাতে জগতের উল্লেখ বিশেষ নেই। এবং শেষে, তাঁর প্রায়-বিপরীত কবি মালার্মের মতো, জগৎকে সম্পূর্ণ-ভাবে পরিত্যাগ করবার ক্ষমতা তাঁর হ'লো। ভালেরী ও জয়েস-এর মৃত্যুর এগারো বছর পরে ইউরোপের 'শেষ' শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে স্বেচ্ছাচারী যুবক ও পরিপূর্ণ বৃদ্ধ লোকান্তরে যেতে সমর্থ হলেন।

'The lively eyes that prod
the contents of my clothes
shuck me out of those
and I go bare as a god.'

—মালার্মে (ম্যাকিণ্টায়ার-এর অনুবাদ)

অগ্নিপ্রাণ

মৃণালকান্তি

রৌদ্র চাই—কীটদষ্ট শিশুশাখা অবিরল নীলে,
বৃষ্টির ধারায় ধুয়ে নিতে চাই। আমার নিখিলে
বিষণ্ণ দুঃখের শীত ঝরে; পাখি কিংবা নই প্রজাপতি,
দিন মাস বর্ষ যায়—ইটের দেয়ালে স্তব্ধ অবারিত গতি।
ঈশ্বরের আশীর্বাদ নামে: রৌদ্র ঝরে—সোনা হয় ধূলি,
দূর মাঠ মাটি ঘাস অশ্বত্থের পীত পাতাগুলি।
এইখানে বাসি অন্ধকার, ইটের ধূসর ধু-ধু মরু:
বিশাল তৃষ্ণার দাহ—আমি এক অভিশপ্ত তরু।
উই, ধুলো, ক্লেদকীর্ণ অন্ধকারে আছি আর নিরবধি
বিশীর্ণ আমার দেহে তীব্রবিষ বহে নীল যন্ত্রণার নদী।—
এর থেকে মুক্তি আছে, আমার আত্মায় তাই
অনির্বাণ মুক্তির বাসনা—
কী এক আশ্চর্য মন্ত্রে মাটি হয় ফুল, মেঘ হয় পাখি,
আমিও অমৃত-নভে মেলে দেবো ডানা।

চতুরঙ্গ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

খুব বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না,
শস্য ফুটলে আমি নেবো তার মুগ্ধ দৃশ্য,
নিজস্ব গৃহে প্রজা বসিয়েছি, প্রায়ান্ধকার,
কিছু-কিছু নেবো কিছুদিন, বেশি বাঁচতে চাই না।

এই অপরূপ পৃথিবী সেদিকে যাবো না মিথ্যা,
বাসনা যেমন চঞ্চল তার বিশাল জানি না,
রমণী কখন প্রিয় করে, হা রে হৃদয় জানে কি,
তবু বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না।

শুধু যা দৃশ্য ; অন্তঃস্থল যে খোঁড়ে খুঁড়ুক,
ভাসমান নদী ভাসাও নৌকা ভাসাও নৌকা···
যৌবন যায়, চ'লে যাবো আমি, চাষা বা ডুবুরি।
খেতে সংসারে অক্ষয় বাঁচো দৃঢ় জলৌকা।

আহা বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না,
কে চাইবে রোদ আচিতা অনল, কে চিরবৃষ্টি ?
অনভিজ্ঞতা বাড়ায় পৃথিবী বাড়ায় শান্তি,
প্রাচীন বয়সে দুঃখের শ্লোক গাইবো না আমি, গাইতে চাই না।

দায়

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

চোখ নেই তেমন আকাশে—
তোমাকে ছুঁয়েই সব শান্ত হ'য়ে আছে,
প্রপিতামহের কণ্ঠ আমার গলায়
সেও কি তোমায় ভালোবেসে !

যেতে হ'লে, ঢের দূরে যেতে হয়
অদ্ভুত কুঠুরি ঘর অলীক অচেনা,
নেহাৎ আলস্য নয় আমার বিনয়
বস্তুত, তুমি এক দেনা।

না হ'লে, লাফানো যেন আকাল কি পাথর জড়িয়ে
কর্কশ, করুণ মাটি রাত্রে ভিজে-ভিজে,···
কিন্তু যে-কোনো মৃত্যু স্পষ্ট বরণীয়
বিশেষত, রোমাঞ্চসিরিজে ;

দৃশ্যছবিগন্ধময় প্রণয়ীবহুল জনপদে
ভেবেছি কখন যাবো হাওয়া, কিংবা নেতার দাপটে—
কিন্তু ততোবার তুমি বাধা দাও ত্রস্ত পদে-পদে

পুরোনো চাবির রিং, হায়, বেজে ওঠে ॥

শবযাত্রার শেষে

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কেউ কি জানতো তারা
ফিরবে? হয়তো আশা করেছিলো কেউ-কেউ:
দূরের শীর্ণ নদীতীরে যেমন ছিলো
মৃতদেহের ধ্বংসাবশেষ, থ্যাঁতলানো হাড়ের মতো বালি,
তেমনি ছিলো সারি-সারি চাকার দাগ, না শেয়াল,
না শকুন, কেউ যা মুছে নিতে পারেনি।
অন্তত তারা তো উন্মাদ, ভেবেছিলো
জয়গান গেয়ে ফিরবে।
শবযাত্রার গান
মুহ্যমান করলো পরদিনের আলোকিত উপক্রম।

আসলে, সন্ধেবেলায় যখন শীতের দাঁতালো অরণ্যে
মারাত্মক তলোয়ারের ঝঞ্চনার প্রতিধ্বনি বেজেছিলো,
যখন সোনালি সমভূমি আর নীল হ্রদের উপর দিয়ে
ভীষণ সূর্য গড়িয়ে গিয়েছিলো মাতাল শকটের মতো,
দুয়ার বন্ধ ক'রে তখন অনেকে বলাবলি করেছিলো, হয়তো
তারা ফিরবে।

২
হয়তো তারা ফিরতো, কিন্তু রাগি কালো একটানা রাত্রি
এসে আলিঙ্গন করলে মৃত যোদ্ধাদের; পুনরুত্থানের
সম্ভাবনা গেলো তলিয়ে, আর কুচকাওয়াজের দামামা
যে বাজাতে পারতো, বিধ্বস্ত গলায় সে
মুখর হ'লো বন্য বিলাপে, যা কেবল শুনলো উৎকর্ণ অন্ধকার।

উপত্যকার নিবিড় হিজল বনের উপর
জড়ো হ'লো লাল মেঘ; গহ্বরের ভিতরে পথ গেছে পাতালে,
সেখানে থাকেন দেবতারা: চাঁদের মতো ঠাণ্ডা
উৎসারিত শোণিতধারা ব'য়ে গেলো স্তব্ধ, সকল পথ
মিশলো কালো মোহানায়।

৩
রাত্রির সোনালি শাখার নিচে নীল নক্ষত্রবৃন্দের
তরঙ্গময় আবছায়ায় স্তব্ধ অরণ্য
ঘাড়ের রোঁয়া ফুলিয়ে উঠে দাঁড়ালো
রক্তাক্ত শরীরগুলিকে অভিবাদন জানাতে, আর
নলখাগড়ার বনে এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়া হানলো
বাঁশির নরম গীতময় উচ্চারণ। তপ্ত
অগ্নিশিখা প্রথমে দীর্ঘ হ'লো প্রবল বেদনায়, তারপর আঁকাবাঁকা, অ[illegible]
গোপন বাসস্থান থেকে বেরিয়ে এলো জলজ্বলে বাঘ, অরণ্যের
সোনালি-ভীষণ সুষমা।
উন্মাদ,
তারা ভেবেছিলো জয়গান গেয়ে ফিরবে।

৪
ছিন্নভিন্ন শিবিরের উপর হা-হা ব'য়ে গেলো
প্রেতের নিশ্বাসের মতো এক ঝলক হাওয়া॥

ইতিকথা

তারাপদ রায়

এক

ফিরে যাওয়া যায়।
হঠাৎ পথে নেমে, জামতলা পার হ'য়ে
এক পা ধুলো আর হাতভরা শাপলার ফুল,
তোমার দরোজায় গিয়ে দাঁড়াতে পারি।

সন্ধ্যাবেলা। রান্নাঘরের ফাঁকে কেরোসিনের কুপি জ্বলছে
হলুদমাখা হাতে আলগোছে ঘোমটা টেনে
তুমি বললে,
'কতদিন পরে এলে।'
তখন সারা উঠোন জুড়ে বাতাবির ফুল ছড়িয়ে আছে।
মাঘের শুদ্ধ হাওয়া
পুকুরের জলে জোনাকির ছায়া।

কতদিনের কত ছবি।
তবু কি ফেরা যায়॥

দুই

পুরোনো সুরের গানে মন আর ভরে না।
সাবেকি সংসারের দেয়ালে-দেয়ালে
অনেক কালের অনেক কোলাহল জ'মে রয়েছে।
রান্নাঘরের কোনায়
পেতলের গামলার নিচে ঢাকা ঠাণ্ডা ভাত।

রোঁয়া-ওঠা বুড়ো বেড়াল ঘুরছে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে।
দিন আর রাত্রির ফাঁকে-ফাঁকে
একঘেয়েমির ক্লান্তি।
যদি পালিয়ে যাওয়া যায়।

কিন্তু ততদিনে হয়তো
অযত্নের কাঠচাঁপার ডালে আবার কুঁড়ি ধরেছে,
আর
ভিন্ন কালের গৃহবধূর মতো
লালচেলি, রঙিন শাঁখা, আলতা পায়ে
তুমি এই সাবেক দিনের উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছো॥

তিন

ফিরিয়ে এনো। আমাকে ডেকে ফিরিয়ে নিয়ো ঘরে।
কখনো যদি হারিয়ে যাই,
এ-পথ থেকে, এ-ঘর থেকে।
এই যে দিন জানলা ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে,
শালিক পাখি, কাঠবেড়ালির চলাফেরা
চিকন আলো কাঁঠালপাতার ফাঁকে।
কালকে যদি মেলার ভিড়ে হারিয়ে যাই;
ছবির মতো আমার বাড়ি
ফেরার পথ যদিই ভুলে যাই:
ফিরিয়ে এনো। ফিরিয়ে নিয়ো ডেকে॥

চার

শীতের চকিত প্রহর
চিলেকোঠার আলসেতে হেলান দিয়েই উঠে পড়ে।

দীর্ঘ, দীর্ঘতর হিজলের ছায়া,
হেমন্তের বাতাসে ধানভানার গন্ধ,
খড়ের জালায় পায়রাবধূর মানভঞ্জনের পালা।
এলোমেলো কুয়াশায়
হিম-হিম বিকেলের নীল-ছায়া।
অনেক দূরের দিনে, অনেক দূরের গ্রামে—
স্মরণের পাঁচিলে পাতা হ'য়ে দোলে
অঘ্রানের নিরুদ্দেশ কুয়াশা।

পাঁচ

একগুচ্ছ রজনীগন্ধার মতো কোমল উজ্জ্বল
আমার যৌবনের এই দিনগুলি
আমি তোমাকে হাত ভ'রে দিতে পারি।
ছাখো কী আশ্চর্য
পুরোনো দিঘির শ্যাওলা-জমা জলে
স্পর্ধিতগ্রীবা মরালের মতো আমার যৌবন
অনায়াস ভেসে চলেছে,
ছাখো আকাশ তার সুদূরতার পর্দা ছিঁড়ে
সোনার মুকুট প'রে আঙিনায় এসে দাঁড়ালো।

বাসনার রঙে উজ্জ্বল এই আমার দিনগুলি
তোমাকে দিতে পারি,
তোমাকে সাজাতে পারি এই দিনগুলোয়।
কেবল অনেকদিন পরে আরেক দিন
মৃত্যুর শুদ্ধ শুভ্রতায়
তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো
বাসি রজনীগন্ধার করুণ ভালোবাসা
আমার যৌবনের এই দিনগুলি ॥

আলো-শরীর

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

আমারই দেহের ছায়া, কোন আলোয় দীর্ঘতর হয়?
পাশেই রয়েছো তুমি; যতো কাছে ততোই নির্ভয়
ছায়ার মানুষ আমি। বিস্মিত প্রদীপ নিয়ে হাতে
কাছে যাই, প্রপাতের গান শুনি দৃশ্যের পশ্চাতে,

মনে হয়। তুমি নও, অন্য কেউ শরীরের ঋণ
শোধ ক'রে দিতে আসে। সকালে দুপুরে প্রতিদিন
টিকটিকি-হৃদয় থাকে দেয়ালের শূন্যে ঝুলে একা;
যে-আলোতে ছায়া দীর্ঘ হয় সেই আলোকের দেখা

সন্ধ্যায় কখন পাবে? প্রতিটি মুহূর্তে বেড়ে ক'মে
অর্ধনারীশ্বর ছায়া তৃপ্ত হবে পার্থিব নিয়মে।
ছায়ার অরণ্য আমি, আলোর শরীরে তুমি দূর
নক্ষত্রের গান আনো; সকালে হারায় তার সুর;

ক্রমে ছায়া হ্রস্ব হয়, আমি নিঃস্ব হই একেবারে;
পিপাসার্ত, হিংস্র স্নায়ু ভেঙে পড়ে অব্যক্ত চিৎকারে।

দুটি কবিতা

শোভন সোম

এক

জল ছুঁয়ে হাওয়া ওল্টালো পদ্ম পাতা
সব পদ্ম ম্লান হ'য়ে রইলো একটি পদ্ম
ঢেউ ভেঙে-ভেঙে বৃত্ত থেকে বৃত্ত আঁকলো
—তুমি যখন নাইতে নামলে ॥

দুই

এক ফোঁটা—দু ফোঁটা—বৃষ্টির দুরন্ত ফোঁটায় জল কেঁপে উঠলো
টিপটিপ নূপুরধ্বনি কিশোর সবুজ পাতায়-পাতায়
কণা-কণা মুক্তোর মতো হাওয়ার দু হাতে বৃষ্টির ফোঁটা

একটি—দুটি—ভালোবাসার মুহূর্ত আমার বুক ভ'রে দিলো
বৃষ্টির দুরন্ত ফোঁটার মতো ॥

দুটি কবিতা

দেবতোষ বসু

শূন্যতা

অদূরে ভূমিষ্ঠ রাত্রি, মহাশূন্যে তারকা স্বর্গত
মূর্তছবি ক্রমে অবসান ;
সুরজ মুরলী স্থির, নীলিমার বুকে তন্দ্রাহত
শব্দহীন সে-গীতবিতান।

অথচ এখনো পাশে শুয়ে আছে ঘনিষ্ঠ আবেগ
নশ্বরতা শুদ্ধ এ-প্রহরে।
গত যা নিমিত্ত মাত্র ; বর্তমানে অন্ধ কালো মেঘ
মৃত্যু ডাকে চতুর্ভুজ ঘরে।

প্রসিদ্ধ স্মৃতির দেশে সুসংগত এখন প্রস্থান—
দ্বারে মূর্ত অতনু মরণ।
একাকী ঘূর্ণিত বিশ্ব, কক্ষপথে আমি ধাবমান
সহযাত্রী শুধু মৃত মন।

পূর্বাভাস

মধ্যদিনে নিরুদ্দেশ মেঘে
ছেয়ে গেলো দৃশ্য ত্রিভুবন।
শুরু হ'লো দুরন্ত আবেগে
তুষারের বাষ্পীয় ভবন।

কম্পমান মাটির সন্ত্রাসে
ঝোড়ো দিনে সাক্ষী মহীরুহ—
তারো ঊর্ধ্বে ভূমধ্য আকাশে
মেঘাবর্ত রচে চক্রব্যূহ।

এইবার বৃষ্টি শুরু হবে—
শুদ্ধ মেঘ, জলভারানত।
আমি ঋদ্ধ ছায়ার বৈভবে
অন্তরীক্ষে সে তড়িতাহত।

স্মৃতি ও সে

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

গেরুয়া বিকেলে ক্লান্ত হাটুরের মতো
তারা আসে চিন্তার ধূসর রাস্তা ধ'রে;
শৌখিন, সুভদ্র মুখ থেকে রং চ'টে গিয়ে তারা
অধুনা জলের মতো বর্ণহীন, ধরা-পায়ে আসে:
সারি-সারি ছায়া।

মুচুকুন্দ-চাঁপার গা ঘেঁষে নিচে নীল হ্রদে
শালুকের সংক্ষিপ্ত পাড়ায় ঘুরতো জল-ঢোঁড়া,
সে কখন রোদে জলে ম'জে প'চে গেছে,
নরম শরীর তার বলের মতন লুফে নেবে
খেলোয়াড় কাক, চিল অথবা শকুন:

অত্যন্ত সহজ এই প্রতিপাদ্য। তবু সমাধানে
সন্তুষ্ট হয় না কেউ: না তুমি, না তারা।
অথচ সুস্পষ্ট কোনো প্রশ্ন নেই, নেই প্রতিবাদ।
শুধু আসে চিন্তার ধূসর রাস্তা ধ'রে, তুমি দেখো,
আঁকাবাঁকা সারি-সারি ছায়া—
জলের মতোই বর্ণহীন।

সমুদ্রের তলদেশে বারুণী কন্যার নাচঘরে
স্ফটিক স্তম্ভের মধ্যে লাল, নীল, সবুজ আলোর
মশগুল মজলিশ। কোনো তীব্র ঘূর্ণি, ভূকম্পে কাঁপে না,
দোলে না, ভাঙে না কিছু। হঠকারী অবাধ্য বাতাস
ভুল বুঝে মাথা-নিচু ফিরে যায়। ছায়াও পড়ে না।

সকাল : কুমারহট্ট

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

বহুদিন পরে এখানে কে এলো ?
সকাল বললো—শুভদিন ভেল ;
প্রতীক্ষা ক'রে আছে বুঝি এক অমূল্য অর্জন।
সূর্যের হাত পড়েনি বাগানে—আবছায়া নির্জন।
হলুদ ঠোঁটের শালিকেরা চরে পুকুরপাড়ের ঘাসে—
তৃণ খুঁটে-খুঁটে কী যে খুঁজে পেলো ?
তারাও বললো—শুভদিন ভেল !
জল-ছলছল ঠাকুর-দিঘিতে আকাশের ছায়া ভাসে—
উড়ো-উড়ো শাদা মেঘের আড়ালে সকালবেলার চাঁদ
যাই-যাই ক'রে তবুও যায় না উপভোগ করে কুড়েমির আস্বাদ।
ঝরা পাতা যত ঝাঁট দিয়ে-দিয়ে জড়ো করে দেখি মালি,
আনমনা চোখ চেয়ে থাকে আর মন হ'য়ে যায় খালি।
আড়ালের ঐ গাবগাছটায় ভাঙা পাঁচিলের পাশে
কোঁচানো ডুরেটি ঝুলিয়ে রেখে কে সোজা ঘাটে চ'লে আসে ?
গোরোচনা গোরী নবীনা কিশোরী কে ধনী মাজিছে গা,
হালিশহরের পুরোনো ভিটের ভাঙা ও-জানালাটা।
মো-যদি-সিনাই-আগিলা-ঘাটে-আর-ঘাটে-পিয়া-নায়
এমনি একটি দিঘির সকাল জানালায় ডেকে যায়।

দুটি কবিতা

নবনীতা দেব

মিথ্যে

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আয়না তুমি কার, পারুল তুমি কার, ইচ্ছে তুমি কার। ওরা বললে, কেন, তোমার। আমি বললুম, কক্ষনও না। ওরা হাসলো।

আবার বললুম, আয়না তুমি কার, পারুল তুমি কার, ইচ্ছে তুমি কার। ওরা বললে, শুধু তোমার। আমি বললুম, বিশ্বাস করি না। ওরা কাঁদলো।

যেদিন ডাকলুম, আয়না তুমি আমার, পারুল তুমি আমার, ইচ্ছে তুমি আমার,—সেদিন রুপোলি ঝড় গোঁ-গোঁ ক'রে রেগে বললে, মিথ্যে কথা। আমি বললুম, না, না—ঝড় বললে, মিথ্যে কথা। আমি কাঁদলুম, আমার, আমার। ওরা সাড়া দিলে না।

রুপোলি ঝড় হা-হা ক'রে হেসে ব'লে গেলো, মিথ্যাবাদী॥

দ্বন্দ্ব

একবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকাও
আমি তোমার চোখের মধ্যে একটু হাসি।
সে-হাসির আদরে তোমার চোখ কাঁপুক
তোমার চোখ কাঁপুক
তোমার চোখ লাজুক
আমি কাঁপি, আমি কাঁদি, আমি দাঁড়াই।
তোমারই মতো একা, ব্যাপ্ত,
সহস্রাক্ষ, সহস্রবাহু,
অনাদি, অনন্ত, অজর
নিজের অস্তিত্ব নিয়ে অনুক্ষণ লীলায়িত
আমি
তোমার আশ্চর্য অনিবার্য সঙ্গী।

ওপরে ফাঁকা নিচে ফাঁকা সামনে ফাঁকা পিছনে ফাঁকা
সময় যখন আপনি ফাঁকি দেয়
সেই তো ইচ্ছার লগ্ন।
আমি এসেছি, তুমিও এইবার এগিয়ে আসবে
রাগ কোরো না ত্যাগ কোরো না আশা কোরো না, শুধু তাকাও
আমার নির্মল আকাশে তোমার সোনালি রোদ্দুর
ভয় কোরো না জয় কোরো না ছল কোরো না, শুধু তাকাও
তোমারই মতো উজ্জ্বল আর নিষ্ঠুর, দর্পিত আর মায়াবী,
পবিত্র আর করুণ আঁখির অরণ্যে
শ্রাবণের বৃষ্টির মতো তাকাও
ভৈরবী স্বপ্নের মতো
বৈরাগী মৃত্যুর মতো
নিশ্চিত
আর মনে করো তুমি আমার জন্যে
বৃষ্টি আমার জন্যে, বকুল আমার জন্যে, শস্য আমার জন্যে
মনে করো, দুঃস্বপ্ন আমার, নৈবেদ্য আমার, চৈতন্য আমার
আর তখন আমি তোমার হই, তখন
আমি তোমার হই
তুমি
আমার কোলের শিশু হ'য়ে আমাকে বরণ করো
আমাকে হরণ করো
পূরণ করো ॥

রুক্‌মিণী বাঈ

সন্দীপ সরকার

তুমি কি কখনো শুনেছো
হারমনিআম? অবশ্যই শুনেছো।
শাদা কালো রীডের ওপর
হাতের সুন্দর আঙুল চালিয়ে
তুমি ব্যাকুল গলায় আকুল করেছো
আমায়। কতবার···ক-ত-বা-র।

কিন্তু ওই পর্যন্ত।
আজ যে-কাহিনী বলবো,
তা অন্য ধরনের।

গিয়েছিলাম কুখ্যাত গলির মধ্যে
রুক্‌মিণীর ওখানে। সে আমায় গান শোনালো
ভাঙা হারমোনিআমে। তবু তারই মধ্যে
শুনলাম মানবাত্মার যন্ত্রণা। সে পারেনি ইলেক্‌ট্রিক-বিল
শোধ করতে, তাই
মোমবাতি জ্বেলেছে। তারই আলোয় কাঁচুলি-বাঁধা
চালশে রুক্‌মিণীকে যেন প্রেতিনী মনে হচ্ছে।
গজল-ঘেঁষা সুরে সে বারবার গাইছে,
'সারে দুনিয়া ঘুম আয়িঁ
তাবিভি পেয়ার না মিলি···'

আমি সারা বিশ্বে ঘুরেছি অনেক,
তবুও ভালোবাসা পাইনি···
গাইছে রুক্‌মিণী বাঈ, সে-গলা নেই,
যে-গলা শুনতে

একদিন ভক্তের নিত্য আনাগোনা ছিলো।
সে-দেহ নেই।
হারমনিআম পর্যন্ত বেসুরো হয়েছে।
তবলচিও নেই, তাই বোধ হয় বৃষ্টি
সঙ্গত ক'রে চলেছে টিনের চালে।
তবু মনে হ'লো এমন গান শুনিনি
কখনো।

আধো আলোয় আধো অন্ধকারে
দেয়ালে কাঁপছে রুক্মিণীর ছায়া,
মনে হ'লো এমনিভাবে একাকীত্বের বাঁধন ভাঙতে না-পেরে
কাঁপছে, হ্যাঁ, কাঁপছে, কাঁপছে রুক্মিণী নিজে।

সমালোচনা

শোহিনী : সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত। আনন্দ পাবলিশার্স। দু টাকা
মনঝাউ : বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স। দু টাকা
নাবী ফসল : সুনীল চট্টোপাধ্যায়।
অমল দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। দু টাকা
একা এবং কয়েকজন : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্যপ্রকাশক।
দু টাকা
অন্তর্গতি : পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য। শতভিষা। দেড় টাকা

একজনের কবিতা থেকে অন্যের কবিতা আলাদা ক'রে চেনা যায় না—এ-রকম যে-অভিযোগ সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে প্রচলিত আছে, এই পাঁচটি কবিতার বই তার প্রতিবাদ করবে। আমার এই উক্তির উদ্দেশ্য নিছক প্রশংসা নয়, কেননা কবিতাগুলো নিজেরা ভালো না-হ'লে, শুধুমাত্র পারস্পরিক পার্থক্য নিশ্চয়ই তাদের সুনামের সাহায্য করবে না। এবং, পরস্পরের সঙ্গে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের পর যে চার-পাঁচজন জ্যেষ্ঠ কবির কথা আধুনিক বাংলা কবিতার প্রসঙ্গে এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করা হয়, তাঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব, এমনকি স্পষ্ট অনুকরণ পর্যন্ত, এঁদের কবিতায় অনায়াসে চোখে পড়ে। তাছাড়া, শব্দব্যবহারের ধারণায় এই পাঁচজন কবি এমন কোনো মৌলিক পার্থক্য ঘটান নি, যাতে এঁদের কাব্যচর্চা কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত হ'তে পারে। তৎসত্ত্বেও, এঁদের কবিতা প'ড়ে মনে হ'লো যে, ধীরে-ধীরে, প্রায় চোখে-না-পড়বার মতো আস্তে, বাংলা কবিতার বিবর্তনকে এঁরা নিঃসন্দেহে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, এমন একটা-কিছু এঁরা করেছেন বা করছেন, যাতে অন্তত ন্যূনতম একটি সুরুচির দাবি আগামী যে-কোনো কবিযশঃপ্রার্থীর কাছে নির্দিষ্ট হ'য়ে রইলো।

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্তের 'শোহিনী'তে, অবশ্য, সাম্প্রতিক কবিতার লক্ষণ কমই মেলে। এমনকি, কলাকৌশলের যে-প্রচলিত চরিত্রটি প্রায় হাতের

কাছে পাওয়া যায়, তারই একটি সধর্মী সংস্করণ ছাড়া, সমকাল বা সমকালীন বাংলা কবিতার সঙ্গে তাঁর কবিতার সম্পর্ক খুব স্পষ্ট নয়। তাঁর কবিতায় দার্শনিকতার আভাস আছে, স্নিগ্ধ নির্লিপ্ততা আছে, কিন্তু তাঁর কাব্যাদর্শ উচ্চাকাঙ্ক্ষী নয়। কোনো-কোনো সুন্দর মুহূর্তে আমাদের মন উদ্দীপ্ত হয়, প্রবুদ্ধ হয়, এবং, হয়তো বা, অনন্তের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট হয়—এটুকু ছাড়া তাঁর বক্তব্য নেই। এবং এ-কথা তিনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে লেখেন নি, এবং অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে কিংবা নির্মল কোনো মুহূর্তে, কারো মানসিক অবস্থা বোঝাতে তিনি যে-সব কবিতা রচনা করেন, তাদের নাম, 'সবুজ চেতনা, 'চেতনা: পলাশ', ও 'চেতনা-দীপ'। এই কবিতা তিনটি তিনি পর-পর রেখেছেন বইতে, এবং তিনটিতেই 'চেতনা' শব্দটির ছড়াছড়ি। অথচ, ঐ শব্দটিকে বর্জন ক'রেও কবিতা তিনটির উদ্দেশ্য সফল হ'তে পারতো; হ'লে, কবিতাগুলো যে আরো ভালো হ'তো, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

পূর্বোক্ত কবির তুলনায় বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক বেশি সমকালীন। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস, আত্মবিশ্লেষণ,—সাম্প্রতিক জীবনের অনেক লক্ষণই তাঁর কবিতা স্পর্শ ক'রে গেছে। কিন্তু এঁর কবিতায় নিপুণ ও অক্ষম পংক্তি পাশাপাশি স্থান পেয়ে থাকে। যেমন, "দেয়ালের ছবিগুলি দূর দেশ থেকে। আমাকে আশ্চর্য হ'য়ে দেখে—(আকাশ-প্রদীপ)"—ভালো, কিন্তু তার দু-লাইন পরেই "অনেক প্রাচীন সুর ব'য়ে-ব'য়ে আজ। মহাকাশে বুঝি হায় নেই কোনো কাজ"! (বিস্ময়-চিহ্নটি আমার।) বইয়ের প্রথম কবিতাটিতে "রবিঠাকুর, পেঙ্গুইন, আর। রাজনৈতিক ইস্তাহার।—বাজার ভরতি দেনা। (খোলা ঘর)"—কবির একটি বিশেষ মেজাজ পাওয়া যায়, কিন্তু তার পরের কবিতাটিতেই চোখে পড়ে "সুপ্ত অভিষ্যন্দে সে-ও অতল অধরা।"

'শাল ফুল' এবং 'সাঁওতালি সুর' কবিতা দুটির ভূমিকা হিশেবে কিছুটা ক'রে গদ্য লেখা আছে। এই গদ্যাংশের তাৎপর্য আমি বুঝতে পারি নি—শালফুল এবং সাঁওতালি সুর কবির পরিচয়পত্র ছাড়াও আমাদের কাছে খুব অজানা থাকতো ব'লে মনে হয় না। বইটির অনেক কবিতাতেই, যেমন

'বর্ষার পাখি', 'বক' কি 'পথ-চাওয়া দিনের কবিতা'—লেখকের সহজ কবিত্বের পরিচয় পেলাম।

কিন্তু 'মনঝাউ' নামটিকে কি এখন আর কবিত্বময়ও বলা যাবে?

'নাবী ফসলে'র কবিতার ত্রুটিবিচ্যুতি পাতা ওল্টালেই চোখে পড়ে, কিন্তু তা ছাড়াও যা চোখে পড়ে, তা হচ্ছে একটি স্পর্শসহ, তপ্ত পদার্থ, যার সঠিক সংজ্ঞার্থ হয়তো দেয়া চলে না, কিন্তু কবিতার পক্ষে যাকে একটি গুণ ব'লে চেনা যায়। 'কথা দিয়ে কিছু ছোঁয়ার প্রয়াস করি'—তাঁর কবিতায় এই উক্তিটি এই সূত্রে তাৎপর্যময়। প্রথমত, তাঁর অধিকাংশ কবিতায় একটি শরীরিণী নায়িকার দেখা পাওয়া যায়; দ্বিতীয়ত, তিনি কখনোই নায়িকার অঙ্গবর্ণনায় তাঁর কবিতা শেষ করেন না—চিত্রকল্পের সাহায্যে একটি নির্বেদে পৌঁছতে চেষ্টা করেন। আমার বক্তব্যের সপক্ষে কবিতাংশ:

'আসবেই ভেসে সেই দ্বীপ;
খোঁপা ভেঙে ঢেলে দাও চুল;
বুক-পোড়া ধোঁয়ানো প্রদীপ
ফেলে দিই; তিথি অনুকূল।' (তিথিসম্পাত)

'ফিরে আসি তোমার আলোকে,
হই ধাতুমূর্তি-উপাসক।
তুমি এসো, আমাকে বাঁচাও।
এই অব্যবহিত পলকে
তোমাকেই জানি নিয়ামক;
সব যাক; তুমি ফিরে চাও!' (পৌত্তলিক)

লক্ষণীয়, তিনি শব্দব্যবহারে সাবধানী নন, কিন্তু একে অনবধানতা না-ব'লে অব্যবস্থিতচিত্ততা বলা উচিত—যা মাঝে-মাঝে অত্যন্ত পীড়াদায়ক ব'লে মনে হয়। 'তৃষ্ণা বা'র সঙ্গে 'আভা'র মিল, 'চৈত্রের ঝুমঝুমি', কিংবা 'যোনিমূলের' বিশেষণ হিসেবে 'মাইক-ফাটানো'—এই সবই কাব্যরুচির বিরুদ্ধে

সাক্ষ্য দেয়। 'হেবজ্র' 'ডোমিনি' প্রভৃতি তান্ত্রিক শব্দ তাঁর কবিতাকে সাহায্য করেনি, চেষ্টাকে প্রকট ক'রে তুলেছে। গদ্যে লেখা যে-দুটি দীর্ঘ কবিতা ('শীতের আঙুল' ও 'পিছল সুর') আছে 'নাবী ফসলে', তাতে ভালো লাগবার উপকরণ, নিঃসন্দেহে, ছড়িয়ে আছে, কিন্তু অসুবিধে এই যে গদ্যটি কখনোই নির্ভার ও স্বচ্ছন্দ হ'য়ে উঠতে পারে নি—সর্বদাই বক্তব্যের ভারে নুয়ে পড়েছে। তবু, 'ঘরণী' 'হৃদয়ের প্রতি' প্রভৃতি কোনো-কোনো কবিতায় উপায় এবং উপকরণের ঈপ্সিত সামঞ্জস্য ঘটেছে ব'লে এই লেখকের ভবিষ্যৎ বিষয়ে আশান্বিত হওয়া যায়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার বইটি নানা দিক দিয়ে তৃপ্তিকর। নতুনভাবে লেখবার কোনো প্রচেষ্টা নেই তাঁর কবিতায়, অথচ তাতে নতুনত্বের স্বাদ মেলে। তার কারণ, আমার মনে হয়, পূর্বসূরীর শব্দের ধারণার তিনি সদ্ব্যবহার করেন; নতুন কোনো শব্দচেতনার জন্ম দেয় না তাঁর কবিতা, অথচ পুরোনো শব্দধারণাকে তিনি সুদে না-খাটিয়ে ব্যবহার করেন না। তিনি সেতু বেঁধে-বেঁধে অগ্রসর হ'তে জানেন, এবং তাঁর কবিতায় যে-গুণটি প্রথমেই চোখে পড়ে, তা হচ্ছে সংযম এবং শৃঙ্খলা। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু প্রেম, এবং প্রেমের নানাবিধ অনুষঙ্গ; এই প্রেম যৌবনের, সবল এবং সফল যৌবনের, কখনো বা চতুর নায়কের, যে-অংশে বিরহ ও বিচ্ছেদ, তাকেও খুব নৈরাশ্যজনক ব'লে মনে হয় না। তাঁর কবিতা নায়িকানির্ভর। একটি উদাহরণ:—

'কিছু উপমার ফুল নিতে হবে নিরুপমা দেবী
যদিও নামের মধ্যে রেখেছেন আসল উপমা,
ক্ষণিক প্রশ্রয়-তুষ্টি চায় আজ সামান্য এ কবি
রবীন্দ্রনাথেরও আপনি চপলতা করেছেন ক্ষমা।'

('চতুরের ভূমিকা')

এবং নায়িকা অন্তর্হিত হয়েছেন যেখানে, যেমন 'উপলব্ধি' কিংবা 'দুই হৃদয়' কবিতায়, সেখানেই কবিতার ভাগ্য স্পষ্টত বিপর্যস্ত হয়েছে। 'বিবৃতি', 'মঞ্চ' প্রভৃতি কবিতায় পরীক্ষানির্ভর নতুনত্বের আভাস আছে—কিন্তু, হসন্ত-শব্দের

আধিক্য ছাড়া, নতুন হিশেবে যেটা সর্বাগ্রে চোখে পড়ে, তা হচ্ছে এই কবিতা দুটির ভিতরকার গল্পটা। কবিতা দুটির উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বস্তুত, ঐ গল্পাংশ দুটির উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কিন্তু, আরেকটি কবিতা—যেখানে গল্পের একটা আভাস আছে, কিন্তু গল্পটা কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র, এবং একটি নাটকীয়তায় নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে আছে, যে-অংশটুকুকে কখনোই কবিতা থেকে ছেঁকে নিয়ে আলোচনা করা যাবে না—সেটি আমাদের অনেক বেশি ভালো লাগে। কবিতাটির নাম 'মিনতি'। এই কবিতাটিকে আমি সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার একটি মূল্যবান সংযোজন ব'লে মনে করি।

যাকে দুর্বল বা শিথিল পংক্তি বলা যায়, পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্যের 'অন্তর্গতি'তে তা তিনটি কি চারটির বেশি নেই। [যেমন 'বৃথা বাপুজীর বাণী জ্বালো মণিদীপা।' ('পোড়ামাটি'), 'বধ্যভূমির ডাক পড়লেই যেতে হবে তাকে চট ক'রেই', ('যাজ্ঞসেনী')]। দ্রুতরেখার সুন্দর ছবি ফোটাতে তিনি সিদ্ধহস্ত, বুদ্ধিদীপ্ত উপমার সংখ্যা তাঁর কবিতায় কম নয়, এবং 'অন্তর্গতি'তে একটিও অপাঠ্য কবিতা নেই, তৎসত্ত্বেও, যে-বস্তুটির অভাববোধ তাঁর কবিতাপাঠে অধিকাংশ সময়েই থেকে যায়, তাকে স্বকীয়তা ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। 'মরীয়া বৃষ্টি' 'রাত্রে কৃষ্ণকলাপে' প্রভৃতি শব্দব্যবহারেই নয়, শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে-কে উৎসর্গ ক'রে তিনি যে দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন, সেই 'সূর্যমুখীর' বিষ্ণু দে-র কাব্যভঙ্গিকে সর্বদাই স্মরণ করিয়ে দেয়। 'অকালবোধন' কবিতাটিও। অন্যদিকে, 'কয়েকটি মুহূর্তে'র তিন নম্বরটির 'দুঃখশোকের ছায়াছবি সারা স্টেশন। নীল আলোয় সংকেতিত। ট্রেনের চাকা। রুমাল ওড়ে'—এই ছবি অমিয় চক্রবর্তীর চিত্রবর্ণনারীতিকে নিশ্চয়ই স্মরণ করিয়ে দেবে। এবং, অন্তত 'আরো একটি ইচ্ছা' প'ড়ে মনে হয়, বুদ্ধদেব বসুও তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত।

তত্রাচ, পূর্ণেন্দুবিকাশের দশমাত্রা ছন্দের ব্যবহার ঈর্ষণীয়; এবং 'সে যেন জালের মাছি, কাতরায়: আসবো, বেরিয়ে আমি আসবো,' ('অনৈয়ায়িক'), কিংবা '—নির্বেদ স্নায়ু উপড়িয়ে ফেল তাকে। দূষিত দাঁতের মতো।' ('একটি

ইচ্ছা')—এ-সব কবিতায় কথ্যরীতির বিশিষ্ট ব্যবহার তিনি করেছেন। বিশেষত, 'কয়েকটি মুহূর্তে'র চারটি কবিতার মধ্যে একটি :

'পৌর সমিতির ডোম ফেলে যায় মরা সাপটাকে,
কয়েকটা কাক জুটে সেইখানে চালায় দরবার,
হঠাৎ শকুন এলে তাড়াবেই, তারি শলা আঁটে,
নিস্তেল কুপির মতো নিবে আসে শীতের দুপুর।'

সুন্দর। 'অন্তর্গতি'র কবির দেখবার চোখ আছে, অন্তর্লীন হ'য়েও তিনি আশে-পাশের ভূগোল ইতিহাস থেকে রস সংগ্রহ করতে পারেন, এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, পড়বার পর মনে তাঁর কবিতার একটা রেশ থেকে যায়। এই অনুরণনের ক্ষমতা সমসাময়িক বাংলা কবিতায় আপাতত দুর্লভ বলা চলে।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

স্থিতি

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে তুলসীতলায়
সমর্পিত সন্ধ্যার প্রণামে,
রোমাঞ্চিত অন্ধকার নক্ষত্রের প্রথম চুম্বনে ॥

সুপেয় শহরে নয়, প্রাগুক্ত গ্রামের ভালোবাসা ;
ঘরে-ফেরা পাখিদের কলকণ্ঠ নীড়ে
তন্দ্রালীন শিশির-পিপাসা ॥

ধ্রুবকের অন্ধকার সারাৎসার তারার আলোয়
রহস্যের কালো নদী আঁকে,
রাত্রির গহন থেকে আরো-দূর তিমির গহনে
চেতনার শুকতারা থাকে ॥

তুমি থাকো তারই আশে-পাশে,
সন্তাপে, সুখে ও প্রেমে শোণিতের নীল সর্বনাশে ॥

তিনটি ট্রিওলেট

সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

এক

তোমার দু-চোখে রাত্রি যে নিলো বাসা—
উদ্ধত মূঢ় সূর্যের পরাজয় !
অন্ধকারের অতল তরল ভাষা—
দু-চোখে তোমার রাত্রির ভালোবাসা।
বুক দুরুদুরু, থরোথরো কাঁপি ভয়ে—
তবু জাগে প্রাণে সর্বনাশের আশা।
তোমার দু-চোখে রাত্রি নিয়েছে বাসা—
উদ্ধত মূঢ় সূর্যের পরাজয়।

দুই

এখানে-ওখানে যেখানেই যাও—
সে আছে তোমার সঙ্গে-সঙ্গে।
এলোমেলো হাওয়া, কম্পিত ঝাউ,
ঝাউয়ের কান্না, যেখানেই যাও।
শুনবে শোণিতে প্রতি তরঙ্গে
তার কথা, স্থির।…হও না উধাও ;
কী ক'রে এড়াবে, যেখানেই যাও—
সে আছে, থাকবে, সঙ্গে-সঙ্গে।

তিন

তুমি যখন কাঁদো আমার ভালো লাগে।
তাকিয়ে দেখি, দু-চোখ ভ'রে নিটোল মুক্তোফল !

দুঃখে শোকে রাগে কিংবা অনুরাগে
যখন তুমি কাঁদো আমার ভালো লাগে।
মনে করো মেঘলা বেলা বৃষ্টিতে বিহ্বল
তখন যদি ঝিকমিকিয়ে সূর্য জাগে—
তেমনি তোমার কান্না আমার ভালো লাগে—
তাকিয়ে দেখি, কাজল-চোখে টলোটলো নিটোল মুক্তোফল॥

রতিবিলাস

সুভাষকুমার মিত্র

মিথুন-লগ্ন হ'তে রতিবিলাপের আর কত দেরি,
হে সুন্দরী।
দিনরাত তোমাকে ঘিরে
রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলা।
আকাশের দূতী দেহনদীর দু-তীরে তার স্বর্ণ ছড়ায়।

বিস্মৃতি হ'তে স্মরণে তুমি কতবার
আমার অনুভূতিগুলিকে কুড়িয়ে নিয়ে
মালা গাঁথো, পরো, আর ফেলে দাও।

প্রেম প্রকৃতি শিল্প

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

হঠাৎ উঠলো জ্ব'লে ঝুমকো-জবায় সেই আলো
বিদেশের ; যেতে-যেতে মনে হ'লো তার
গণিকা, হুইস্কি, তবলা, চতুর ইয়ার
কিছু নয় : তার চেয়ে প্রার্থনীয়
সংসারের পেয়ালায় শান্ত সুখদুঃখের অমিয়,
একটি নির্মল স্বচ্ছ শুভ্র সুর ; অথচ সেদিন
সিঁদুর ঘোমটা শাঁখা, বুকের সহজ উৎসারণ
শীতল লাগলো তার, নিজের বৌয়ের কাছে বেশ্যার রঙিন
কামকলা চায় যারা—সে-ও ছিলো তাদেরি একজন।

হৃদয়ের উপস্থিতি অনুভব করেনি কখনো
জঘনের অন্ধকারে। ময়দার ডেলার মতো নিতম্বমন্থনে
ছিলো তার একমাত্র সুখ। হেসেই উড়িয়ে দিতো অন্য কোনো
সুগভীর অভিপ্রায় শারীরিক রাত্রির বয়নে
কত সুন্দরীর চুলে খুঁজে-খুঁজে ঝর্নার জল
পেয়েছে যে এই অনুশীলিত শরীর ;
সুগন্ধি রুমাল, ধূপ, মন্ত্রপূত ফুল কিংবা ফল
কিছুই লাগে না তাঁর (ভেবেছিলো) যার হাতে আগুনের তীর।

কতদিন মদ গিলে ডুবে যেতো অতল গহ্বরে,
পরাভূত অধীশ্বর, শয়তান বাস করে যেখানে ভৌতিক
আরকের ঝিলিমিলি রঙে। হয়তো বা অলৌকিক
তখনো জেলেছে দীপ হলিহক অথবা টগরে।

বিস্মিত চোখের সামনে খুলে গেলো অন্য এক লোক
যেখানে পার্থিব মুখ সবুজ সৌরভে অনশ্বর ;
গাছ পাখি কুঁজো লোক সব-কিছু অম্লান সুন্দর,
বিশুদ্ধ আনন্দ এক : যেন কোনো মৃত কোঁচবক
সে-আশ্চর্য গানে উড়ে গেলো—হলদে পঞ্জিকার
যৌন উপাখ্যানে কোনো চিহ্ন নেই যার।

কবর-খোঁড়ার গান

শামসুর রাহমান

মদের নেশা খাঁটি সারা জাহানে,
বাকি যা থাকে তার বেবাক ঝুট্‌।
বাঘিনী যেন সেই মেয়েমানুষ,
যার আঁধারে কাল কেটেছে রাত।

যার আঁধারে কাল কেটেছে রাত
নেশার মতো তার স্মৃতির জ্বালা।
আলিঙ্গনে তার দুনিয়াদারি
নিমেষে ভুলে যাই অতল মোহে।

নিমেষে ভুলি সাধ অতল মোহে।
মোহিনী ও-মুখের মিথ্যা বুলি
সত্যসার ভাবি, এবং আমি
ধারি না ধার কোনো মহোদয়ের।

ধারি না ধার কোনো মহোদয়ের,
আমরা তিনজন খুঁড়ছি গোর।
নিপুণ বিদ্রূপে অন্তহীন
দূরের আসমানে জ্বলে দিনার।

দূরের আসমানে জ্বলে দিনার।
কোদালে অবহেলে উপড়ে আনি
মাটির ঢেলা আর মড়ার খুলি।
শরিফ কেউকেটা কী ক'রে চিনি ?

শরিফ কেউকেটা কী ক'রে চিনি ?
মাটির নিচে পচে অন্ধ গোরে
হয়তো সুন্দরী, কুরূপা কেউ।
কোরো না বেয়াদবি বান্দা তুমি !

কোরো না বেয়াদবি বান্দা তুমি !
বাদশা নেই কেউ, গোলাম সব,
বেগম চায় পেতে বাঁদির সুখ :
আউড়ে গেছে কতো সত্যপীর।

আউড়ে গেছে কতো সত্যপীর :
সমরকন্দ্ আর বোখারা তার
রূপসী মাশুকের যোগ্য নয়।
সে-সব ছেঁদো কথা, মস্ত ফাঁকি।

সে-সব ছেঁদো কথা, মস্ত ফাঁকি।
বিবেক বিলকুল লক্ষ্মীছাড়া,
মনের পশুটাও চশমখোর।
আমরা তিনজন খুঁড়ছি গোর।

আমরা তিনজন খুঁড়ছি গোর।
হয়তো রুটি আর গোলাপ-কুঁড়ি
যুগ্মতায় জ্বলে চাওয়া-পাওয়ায়,
নেশার মতো খাঁটি নেই কিছুই।

নেশার মতো খাঁটি নেই কিছুই,
সাচ্চা শুধু এই দেহের দাবি।
মানতে নয় রাজি বেয়াড়া মন
দীন্ ও দুনিয়ার ধাপ্পাবাজি॥

'ল্য ফ্ল্যর দ্যু মাল' থেকে

শার্ল বোদলেয়ার

তার চুল

কুন্তলরাশি, গ্রীবায় স্খলিত কোঁকড়া ফেনায়,
হে অলকদাম, আলস্যময় ঘ্রাণে মাতাল !
কী পুলক ! যবে সান্ধ্য কোঠাতে আঁধার ঘনায়
কেশরগুচ্ছে ঘুমোনো স্মৃতিরা আসর জমায়,
তুলে নিয়ে নাড়ি হাওয়ায় তাদের, যেন রুমাল।

এশিয়ার শ্লথবিলাস, দীপ্তি আফ্রিকার,
সুদূর জগৎ, অনুপস্থিত, লুপ্তপ্রায় !
গন্ধগহন সেই অরণ্যে প্রাণ আমার—
অন্যেরে যথা ঠেলে নিয়ে চলে সুরবাহার—
তেমনি তোমার সুবাসে, প্রেয়সী, ভেসে বেড়ায়।

যাবো আমি, যেথা মানব এবং তরুলতাও
আপন রসে ও রৌদ্রে বিবশ দীর্ঘ দিন,
প্রবল অলক, হও ঢেউ, যাতে আমিও উধাও !
হে আবলুশের সাগর, স্বপ্নে চোখ ধাঁধাঁও ?
মাস্তুল, পাল, মাল্লা, আগুন যাতে বিলীন :

প্রতিধ্বনিত বন্দর, যেথা আমার প্রাণ
বর্ণ, গন্ধ, শব্দের ঘন ঝাপটে মাতে ;
জলীয় কনকে ভঙ্গিমগতি সাগরযান
বিশাল বাহুর বিস্তারে এক বেপথুমান
শাশ্বত-তাপ-বিদ্ধ আকাশে চায় জড়াতে।

অন্যটি যাতে বন্দী, সে-কালো সাগরজলে
ডুবে যাক মাথা, নেশার লালস যাকে মাতায় :
আমার সূক্ষ্ম সত্তা, ঢেউয়ের আদরে গ'লে
অনন্ত অবসরের স্নিগ্ধ দোলায় দুলে
ফের খুঁজে পাক অন্তঃসত্তা অলসতায়।

নীল চুল, যেন আঁধারের বিস্তীর্ণ চাতাল,
গগনগোলকে ক'রে দাও তুমি আরো গভীর ;
ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ঐ কোঁকড়া কোমল পক্ষ্মজাল
আমি, অস্থির, মিশ্র সুবাসে হই মাতাল
নারিকেল-তেল, আলকাৎরা ও কস্তুরীর।

দীর্ঘপ্রহর ! চিরকাল ! ঐ কেশে আমার
অঞ্জলি দেবে ছড়িয়ে মুক্তা, পান্না, হীরা—
আমার রতির মন্ত্রে বধির র'বে না আর,
স্বপ্নমুখর হে মরুকানন, হে ভৃঙ্গার,
মহাগণ্ডূষে পান করি যাতে স্মৃতির সুরা !

তবু অতৃপ্তা

শ্যামাঙ্গী, নিশার মতো, ওগো দেবী অদ্ভুতের দূতী,
ডাকিনী, আবলুশগাত্রী, তুমি মধ্যরাত্রি সন্তান,
অঙ্গে মেশে মৃগনাভি আর দূর হাভানার ঘ্রাণ—
আফ্রিকার কোন ওবি, সাভানার ফস্টাসের কৃতি !

আফিম, মদের নেশা ফেলে দিয়ে—আমার আকূতি
মানে তোর কামলিপ্ত ওষ্ঠাধরে অমৃতসমান ;
নয়নের কূপে তোর নির্বেদের তৃষ্ণা অবসান,
ধায় যবে তোর দিকে কারাভাঁয় সারিবদ্ধ রতি।

আত্মার চুল্লির মতো, ঐ লোল, কালো চক্ষু থেকে
অগ্নি হেনে, রে পিশাচী, কত আর পোড়াবি আমাকে !
আমি সেই স্টিক্স নই, যা তোকে জড়াবে নয় বার,

আর, হায়, মেগীরা-লম্পট আমি, কিছুতে পারি না
দর্প তোর চূর্ণ ক'রে, ফিরে পেতে নিজ অধিকার,
যেহেতু নরক তোর শয্যা, আর আমি প্রসার্পিনা।

আত্ম-প্রতিহিংসা

মারবো আমি তোকে, যেন কশাই,
ঘৃণার লেশ নেই, শূন্য মন,
কিংবা শিলাতটে মূসা যেমন !
তাহ'লে আঁখি তোর যদি খসায়

আমার সাহারার সান্ত্বনাতে
দুঃখধারা এক উচ্ছ্বসিত ;—
আমার অভিলাষ, আশায় স্ফীত
সে-লোনা জলে পারে ভাসতে যাতে

নোঙর-তুলে-নেয়া তরী যেমন।
মাতাল এ-হৃদয়ে কান্না তোর
শব্দ তুলে ক'রে দিক বিভোর,
ঢাকের নাদে যেন আক্রমণ !

নই কি আমি এই দিব্য গানে
স্বরের অন্বয়ে এক বেসুর,
যেহেতু ব্যঙ্গের মুঠি চতুর
আমার সত্তারে নিত্য হানে ?

আমারই কণ্ঠ সে—কী জঞ্জাল!
আমারই কালো বিষ রক্তে মাতে!
আমি সে-উৎকট মুকুর, যাতে
আপন মুখ দ্যাখে সে-দজ্জাল!

আমিই চাকা, দেহ আমারই দলি!
আঘাত আমি, আর ছুরিকা লাল!
চপেটাঘাত, আর খিন্ন গাল!
আমিই জল্লাদ, আমিই বলি।

ছন্নছাড়া আমি শূন্যবাসী
আপন হৃদয়ের রক্ত গিলে,
কখনো প্রীত হ'তে শিখিনি ব'লে
আমার আছে শুধু অট্টহাসি।

এখনো ভুলিনি তাকে

এখনো ভুলিনি তাকে—নগরের গা ঘেঁষে, নির্জন,
আমাদের শাদা বাড়ি, ছোটো, কিন্তু শান্ত সারাক্ষণ।
পমোনা, পাথরে গড়া, আর এক স্থবির ভেনাস
বিরল ঝোপের পিছে ঢাকে নগ্ন অঙ্গের আভাস।
আর সূর্য, সন্ধ্যাবেলা, প্রপাতের মতো বাতায়নে
অবিরল চূর্ণ হ'য়ে প্রজলিত রশ্মির বর্ষণে,
অদ্ভুত আকাশ থেকে, স্ফারনেত্রে, চেয়ে দ্যাখে যেন
আমাদের সান্ধ্যভোজ, দীর্ঘায়িত, শব্দ নেই কোনো।
সেই দীপ্তি, মোমের আলোয় মিশে করেছ উজ্জ্বল
বনাতের ছেঁড়া পর্দা, আমাদের স্বল্প অন্নজল।

মহাপ্রাণ সেই দাসী

মহাপ্রাণ সেই দাসী, তুমি যাকে ঈর্ষা করেছিলে,
মগ্ন হ'লো ঘুমে আজ তুচ্ছ তৃণপল্লবের তলে।
তবু চলো, কিছু ফুল দিয়ে আসি তাকে একদিন,
আহা, মৃত, মৃত ওরা, কী বিরাট সন্তাপে বিলীন!
যবে রিক্ত তরুদল নিশ্বসিত ম্লান অক্টোবরে,
মর্মরফলক ঘিরে খেদময় বায়ু ঘুরে মরে,
তখন ঘুমোই যারা বেঁচে থেকে, উষ্ণতায় লীন,
কী কঠিন ভাবে ওরা আমাদের, কী হৃদয়হীন!
এদিকে বিকট কালো স্বপ্নেরা ওদের ছিঁড়ে খায়,
সদালাপ, শয্যাসঙ্গী, কিছু নেই; হিমেল হাওয়ায়
জ'মে-যাওয়া বুড়ো হাড়, পরিশ্রমী কৃমির সম্ভার,
টের পায় শীতের তুষার গ'লে ঝ'রে পড়ে, আর
খ'সে পড়ে শতাব্দী, তবুও কোনো বন্ধু বা স্বজন
ছেঁড়া ফুল ফেলে দিয়ে সে-মণ্ডপে রাখে না নূতন।

ধরো, কোনো সন্ধ্যায় যখন কাঠ অগ্নিকুণ্ডে ফোঁশে,
যদি তাকে দেখি, শান্ত, অস্পষ্ট চেয়ারে আছে ব'সে;
যদি ডিসেম্বরে, কোনো হিমস্রব নীল যামিনীতে
দেখি, সে কুঁকড়ে আছে এক কোণে, ঘরের নিভৃতে;
যদি উঠে আসে, মৌন, চিরন্তন শয্যাতল ফেলে;
তার বুড়ো ছেলেকে আশ্রয় দিতে মাতৃচক্ষু মেলে—
তাহ'লে, স্খলিত অশ্রু দেখে তার পল্লবের তলে,
সেই পুণ্য আত্মাকে উত্তর দেবো কোন কথা ব'লে?

ডুয়েল

ছুটে এলো যুগপৎ দুই যোদ্ধা ; অস্ত্রের সংঘাত
দ্যুতি আর শোণিত ছিটিয়ে দেয় আহত বাতাসে।
এই খেলা, লৌহনাদ যৌবনের—যখন হঠাৎ
উচ্চতানে ধরা পড়ে প্রণয়ের চীৎকৃত উচ্ছ্বাসে।

গেছে ভেঙে তলোয়ার !—আমাদেরই যৌবনের মতো,
প্রিয়তমা ! কিন্তু আজ দাঁত আর নখের উৎসাহ
কৃপাণের বঞ্চনার প্রতিশোধে সবেগে উদ্যত।
—হা রে বৃদ্ধ হৃদয়ের ব্রণদুষ্ট প্রণয়ের দাহ !

ত্যাখো বীরদ্বয়ে, তারা বদ্ধ হ'য়ে ক্রূর আলিঙ্গনে
গড়ায় গহ্বরে, যেথা চিতা আর নেকড়ে দেয় হানা,
তাদের বিদীর্ণ ত্বক ফুল ফোটে শুকনো কাঁটাবনে।

—এই তো নরক, বহু বন্ধুদের নির্দিষ্ট ঠিকানা !
আয় রে অমানুষিক আমাজনী, গড়াই দু-জনে
মনস্তাপ ছুঁড়ে ফেলে, জ্বালাময় ঘৃণার বন্ধনে !

শত্রু

আমার যৌবন ছিলো শুধু এক আঁধার তুফান,
তির্যক সূর্যেরা যাকে কদাচিৎ করেছে উজ্জ্বল ;
বজ্র আর বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হ'য়ে, আমার বাগান
ফলিয়েছে কেবল একটি-দুটি রক্তরঙা ফল।

এদিকে, মনের প্রান্তে, হেমন্ত যে আগত এখনই,
শাবল, কোদাল নিয়ে ব্যস্ত হ'তে হবে এইবার—

তবে যদি রক্ষা পায় ধারাজলে ভেসে-যাওয়া জমি,
ফাটা কবরের মতো খানাখন্দ খুলে আছে যার।

যে-নূতন ফুলদলে স্বপ্নে আমি নিরন্তর দেখি,
তারা, এই প্লাবিত তটের মতো ভূমিতলে, কখনো পাবে কি
অলৌকিক সেই পথ্য, যা তাদের শক্তির সঞ্চয় ?

—আক্ষেপ, আক্ষেপ শুধু ! সময়ের খাদ্য এ-জীবন,
যে-গুপ্ত শত্রুর দাঁতে আমাদের জীবনের ক্ষয়
বাড়ায় বিক্রম তার আমাদেরই রক্তের তর্পণ।

আবেশ

তোর কাছে ভীত আমি, মহাবন, যেন ক্যাথিড্রাল ;
অর্গ্যানগর্জন তোর ; আমাদের শাপাক্ত হৃদয়—
শোকের প্রকোষ্ঠ ; সেথা নাভিশ্বাস নিত্য দেয় তাল—
তোর 'অন্ধকার থেকে' স্বননের প্রতিধ্বনিময়।

তোকে ঘৃণা করি, সিন্ধু ! যত তোর লম্ফ, চ্যাঁচামেচি,
খুঁজে পাই আমার আত্মার তলে। যে-তিক্ত উল্লাস
অপমানে ক্রন্দনে নিবিড় হ'য়ে বলে, 'হেরে গেছি'—
সে-বিরাট অট্টহাসি ফিরে দেয় তোর জলোচ্ছ্বাস।

কত সুখী হবো আমি, যদি চেনা ভাষায় প্রকট
নক্ষত্রকিরণে, রাত্রি, লুপ্ত ক'রে দিস একেবারে !
কেননা আমি যে খুঁজি কালো আর নগ্ন শূন্যতারে !

কিন্তু ঘোর অন্ধকার—সে নিজেই হ'য়ে ওঠে পট
যেখানে আমার চক্ষু জন্ম দেয় বিপুল সংখ্যায়
সে-সব অতীতে, যারা চেনা চোখে এখনো তাকায়।

অন্ধেরা

ভেবে ছাখো, হৃদয়, নিশার স্বপ্ন যাদের চালক!
অনন্য, অস্পষ্ট ওরা, হাস্যকর, আতঙ্কে অতুল;
কিংবা যেন দোকানের জানালায় সাজানো পুতুল;
কে জানে কোথায় হানে নিরালোক চক্ষুর গোলক।

ঐ সব চোখ, আর ঐশ্বরিক ফুলকি নেই যাতে,
তবু করে, আকাশে উত্থিত হ'য়ে, দূরের সাধনা,
একলক্ষ্য, অর্থহীন; গুরুভার মাথার ভাবনা
কখনো, স্বপ্নের তলে ডুবে গিয়ে, নামে না ফুটপাতে।

চিরন্তন স্তব্ধতার সহোদর, অনন্ত শর্বরী
পার হ'য়ে ধীরে-ধীরে চলে তারা। হে মহানগরী!
তুমি যবে নেচে, কুঁদে, চারদিকে তুলে উচ্চতান্

হ'য়ে ওঠো প্রমোদের যন্ত্রণার প্রেমিক প্রহরী—
আমিও প্রগাঢ়তর মূঢ়তায় পথে-পথে ঘুরি,
আর ভাবি: আমরা অন্ধেরা ঐ নভতলে কী করি সন্ধান?

যাত্রী বেদেরা

কাঁধে সন্ততি, দৃষ্টিতে দুর্মদ,
দল বেঁধে কাল বেরিয়েছে দৈবজ্ঞ,
ঝুলিয়ে, শিশুর হিংস্র ক্ষুধার ভোগ্য
স্তনবিস্ফারে অফুরান সম্পদ।

যানে পরিজন গচ্ছিত; পুরুষেরা
হাঁটে পাশে-পাশে, অস্ত্রঝলকে দীপ্ত,

আর্ত নয়নে খোঁজে নভতলে লিপ্ত
অনুপস্থিত অলৌকিকের ডেরা।

পতঙ্গ, তার রুক্ষ বিবর থেকে,
চৌদুনে তান লাগায় ওদের দেখে;
এবং সিবেলী যেহেতু প্রণয়াসক্ত,

ঘাস হয় আরো সবুজ, ফুলে ও স্রোতে
ফোটে মরু, শিলা; আঁধার ভবিষ্যতে
পথিকের চেনা মহাদেশ উন্মুক্ত।

এক পথচারিণীকে

গর্জনে বধির ক'রে রাজপথে বেগ ওঠে দুলে।
কৃশতনু, দীর্ঘকায়, ঘন কালো বসনে সংবৃত,
চলে নারী, শোকের সম্পদে এক সম্রাজ্ঞীর মতো,
মহিমামন্থর হাতে ঘাঘরার প্রান্তটুকু তুলে—

সাবলীল, শোভমান, ভাস্করিত কপোল, চিবুক।
আর আমি—আমি তার চক্ষু থেকে, যেখানে পিঙ্গল
আকাশে ঝড়ের বীজ বেড়ে ওঠে, পান করি, কম্পিতবিহ্বল
মোহময় কোমলতা, আর এক মর্মঘাতী সুখ।

রশ্মি জলে…রাত্রি ফের!—মায়াবিনী, কোথায় লুকোলে?
আমাকে নতুন জন্ম দিলো যার দৃষ্টির প্রতিভা—
আর কি হবে না দেখা ত্রিকালের সমাপ্তি না-হ'লে?

অন্য কোথা, বহু দূরে! অসম্ভব! নেই আর সময় বুঝি বা!
পরস্পর-অজ্ঞতায় স'রে যাই—আমারই যদিও
কথা ছিলো তোমাকে ভালোবাসার, জানো না তুমিও!

নরকে ডন জুয়ান

যেদিন ডন জুয়ান, শারনেরে কড়ি গুনে দিতে
নেমে এলো পাতালসলিলে, এক গম্ভীর ভিক্ষুক
আন্তিস্থিনীসের মতো দৃপ্ত চোখে, বলিষ্ঠ বাহুতে
দাঁড়ের কর্তৃত্ব নিয়ে হ'লো প্রতিহিংসায় উৎসুক।

ঘোর কালো আকাশে কাৎরে ওঠে মেয়েরা উত্তাল,
ছিন্নভিন্ন গাত্রবাস, উন্মোচিত স্তনগুলি ঝোলা ;
বিরাট মিছিলে চলে যূপকাষ্ঠে বধ্য পশুপাল,
দীর্ঘায়িত ক্রন্দন পশ্চাতে টানে, ফুরোয় না পালা।

সিনারেল্লে, দেঁতো হেসে, খেসারৎ চায় ফিরে পেতে ;
এদিকে ডন লুইস—মৃত যারা ঘোরে এলোমেলো,
তাদের দেখিয়ে দেন, অঙ্গুলির কম্পিত সংকেতে,
যে-পাপিষ্ঠ পুত্র তাঁর শুভ্র কেশে ব্যঙ্গ করেছিলো।

একদা প্রেমিক, আর তার পরে প্রতারক পতি
যে ছিলো, গা ঘেঁষে তার সাধ্বী, রোগা এলভিরা ঘনায়,
যেন ফের দাবি করে, যে-পরম হাসির আরতি
মন্ত্রঃপূত প্রতাতেরে মেখেছিলো কোমল সোনায়।

বর্মধারী, ঋজু এক শিলাময় বিরাট পুরুষ
হাল চেপে ধ'রে চলে কালো জল দুই দিকে চিরে ;
কিন্তু বীর, অসিতে হেলান দিয়ে, নিস্তব্ধ, বেহুঁশ,
বিদীর্ণ জলের রেখা ত্যাখে শুধু, তাকায় না ফিরে।

আত্মস্থতা

হে আমার দুঃখ, তুমি প্রাজ্ঞ হও, স্থৈর্য নাও শিখে।
চেয়েছিলে সন্ধ্যারে ; আসন্ন সে যে, এই তো আগত :
ধূমল মণ্ডল এক নগরীকে ক্রমে দেয় ঢেকে,
শান্ত কারো মন, আর অন্য কেউ দুশ্চিন্তায় নত।

এখনই ছুটুক ওরা—ক্ষমাহীন জল্লাদ, প্রমোদ,
চালায়, চাবুক মেরে, যে-কুৎসিত, ক্লিন্ন জনগণে,
ফুর্তির গোলামি ক'রে অনুতাপে তার পরিশোধ
দিক তারা ;—দুঃখ, এসো, হাত রাখো হাতে। চলো দুইজনে

যাই বহুদূরে। চেয়ে ত্যাখো, আকাশের বারান্দায়
নিঃশেষ বৎসর সব ঝুঁকে আছে প্রাচীন সজ্জায় ;
দন্তময় মনস্তাপ জল থেকে ধীরে তোলে মাথা ;

এদিকে মুমূর্ষু সূর্য শয্যা নেয় মেঘের তোরণে ;
আর, যেন পূর্বাকাশে দীর্ঘায়িত শববস্ত্র পাতা,
সেইমতো, শোনো প্রিয়, রাত্রি নামে মধুর চরণে।

মধ্যরাত্রির পরীক্ষা

মধ্যরাত্রি প্রতিধ্বনিতে লীন :—
ঘড়ির ঘণ্টা, কুটিল ব্যঙ্গভরে
শুধায়, বলো তো, কাটালে কেমন ক'রে
এ-ক্ষণে হ'লো নিঃশেষ যেই দিন ?
—আজ, হায় আজ, নিয়তিবিধুর তিথি,
ত্রয়োদশ দিন, অশুভ শুক্রবার,
নিষ্ফল ক'রে সর্বজ্ঞানের ভার
জাগ্রত শুধু পাপাচরণের স্মৃতি।

যীশু, ভগবান, সব সংশয়াতীত,
তাঁর বিরুদ্ধে রটিয়েছি বিদ্রোহ !
ভোজনশালায় হয়েছি গলগ্রহ
বিকট ধনীর প্রাচুর্যে পরিবৃত।
আমরা, যোগ্য অসুরসেবকগোষ্ঠী—
যাকে ভালোবাসি তাকেই অসম্মান,
যা-কিছু ঘৃণ্য তাকেই অর্ঘ্যদান
করেছি, জাগাতে জন্তুর সন্তুষ্টি ;

ঘাতকের মতো—কাপুরুষ, চাটুকার—
দুঃখী দীনের হয়েছি অত্যাচারী ;
বিরাট, কঠিন, ষণ্ডমুণ্ডধারী
নির্বুদ্ধিরে করেছি নমস্কার ;
জড়পদার্থে চুম্বন ক'রে ধন্য
মহানিষ্ঠায় আমরা নির্বিকার
পচা, গলা, পুঞ্জিত জঘন্যতার
পাংশুল বিকিরণেই মেনেছি পুণ্য।

অবশেষে, যাতে প্রলাপে আত্মহারা,
ডুবে যায় এই ঘূর্ণিত সংবিৎ,
আমরা, বীণার গরীয়ান পুরোহিত,
মাতাল মরণে রত্নে সাজায় যারা—
ক্ষুৎপিপাসার উৎসাহ ব্যতিরেকে
আমরা করেছি উৎকট পানাহার !...
—নিবে যাক বাতি, অতল অন্ধকার
আমাদের সব লজ্জাকে দিক ঢেকে !

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

গট্‌ফ্রীড বেন্‌-এর কবিতা

আলাস্কা

শস্যপ্রান্তরের উপান্তে দাঁড়িয়ে সে বলেছিলো :
ঘাসফুলের আনুগত্য আর বায়বীয়তা
রঙিন মহিলাদের কাছে চমৎকার এক নকশার মতো।
আমি কিন্তু বেছে নেবো আফিমফুলের গভীর গানের গলা,
তা জ'মে-যাওয়া রক্ত আর রজঃস্রাবের কথা মনে পড়িয়ে দেয়,
মনে পড়ায় চাপ, শ্বাসকষ্ট, ক্ষুধা আর পটল তোলার কথা—
অর্থাৎ, পুরুষের ধূমল পথটাকে।

বৃত্ত

একটি গণিকা তার অনন্য দাঁত
—সে মারা গিয়েছিলো আত্মপরিচয় গোপন রেখে—
বাঁধিয়েছিলো সোনা দিয়ে।
(অন্যগুলি আচমকা পালিয়েছিলো
যেন এক নিঃশব্দ চুক্তি ক'রে।)
সেই দাঁতের সোনা ছিনিয়ে নিলে শবমণ্ডকের স্যাঙাৎ,
আর বন্ধক রেখে নাচঘরে গেলো ফূর্তি করতে,
কারণ, তার মত অনুযায়ী :
'শুধু মাটিরই ফিরে যাওয়া উচিত মাটিতে।'

উত্তরসাগরের তীরে

আত্মার বিষাদ—,
একটি গৃহ, একটি কণ্ঠের গান,
একটি গৃহ, নিষ্কলঙ্ক,
যেখানে ইংরেজি মুদ্রার ঝনৎকার,
ভাগ্যবানদের একটি গৃহ,
সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যে উজ্জ্বল,
রুপোলি আর গোলাপি চারটি দেয়াল
উত্তরসাগরের তীরে।

সে-মেয়ে গাইছে গান :—আর উচ্চবর্ণের লোকেরা —
ভাইকিং আর ইংরেজ পুরুষ,
লোভী শ্বেতজাতির বংশধর—
রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে শোনে।
ঠিক তেমনি উৎকর্ণ তাদের সপ্রতিভ নারীগণ
পশুচর্মে আর জড়োয়া গয়নায় যারা আবৃত,
আর সারি-সারি মুক্তোয়
যা ডুবুরিরা বাহ্‌রীন দ্বীপপুঞ্জের চারপাশ থেকে তুলেছে।

বাজে কণ্ঠ—নিষ্কলঙ্ক,
বিদেশী শব্দ ভ'রে তোলে ঘর
'শান্তিতে বিশ্রাম করে, আত্মা,
'অবশেষে এলো তোমার শান্তি'—
এলো! আর সকলে উৎকর্ণ হ'য়ে পান করে
শুবার্টের স্তোত্র
আর কেপটাউন থেকে সাংহাই পর্যন্ত
হাঙর-পৃথিবী ডুবে যায় দৃষ্টি থেকে।

চোরাই, পোড়া, ছাল-ছাড়ানো,
কুঠুরিতে, বাঁশের তাঁবুতে,
আফিম, নিগ্রোদের ঘা, সেণ্ট্ আর ডলার—
এ-সবের মধ্য দিয়ে উপার্জিত চাবুক,
মহীয়ান নর্ডিক জাতি,
প্রতীচীর একশিলা
সারা ঘরে স্তব্ধ হ'য়ে গেলো
লুপ্ত হ'লো শক্তির পুরাণ।

দূরে, রুপো আর গোলাপের মধ্য থেকে,
গান গায় এই গৃহ, এই কণ্ঠ,
যে-গানের কোনো সীমান্ত নেই,
এক ভিন্ন জাতি যা ঋণ দিয়েছে,
যা শক্তিকে এক প্রবলতর প্রভাবের
বন্দী ক'রে নেয় :
মানুষ চিরন্তন, আর সে অর্চনা করছে
সুদূর দেবতাদের।

ব্রিটিশ দেয়াল, ফিনিশ দেয়াল—
বাড়িঘর—কণ্ঠ গেয়ে চলে গান—
সীমানাহীন জর্মানি
যতক্ষণ জর্মান গান প্রবহমান ;
শুধু এমনি সব ধ্বনি থেকে আসে
তার পীড়িত সন্তানদের জন্য
শ্বেত জাতির নিশ্চল নির্বেদ
আত্মার বিষাদ থেকে
নিষ্কৃতি।

একটি শব্দ, একটি বাক্যবন্ধ

একটি শব্দ, একটি বাক্যবন্ধ :—শূন্যের মধ্য থেকে উঠে আসে
অনুভূত জীবন, আকস্মিক চেতনা,
সূর্য নিশ্চল, স্তব্ধ সকল বৃত্ত,
কেবল সব-কিছু এগিয়ে আসছে একটি শব্দের কেন্দ্রে।

একটি শব্দ—আলোর এক ঝলকানি, পাখা-মেলা এক উৎক্রান্তি, এক আগুন,
আগুনের এক ঘোরানো শিখা, ছিটকে-বেরিয়ে-আসা একটি নক্ষত্র,—
এবং অন্ধকার আবার, বিশাল আর দানবিক,
পৃথিবীর আর আমার চারপাশের শূন্য প্রান্তরে।

ছাখো, নক্ষত্রবৃন্দ

ছাখো, নক্ষত্রবৃন্দ, আলোর তীক্ষ্ণ বিষাক্ত বাঁকানো
দাঁত, আর আকাশ আর সমুদ্র,
এই সব গীতময় রাখালিয়া উচ্চারণ,
ধূসর, অস্পষ্ট; তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সামনে,
তুমিও তেমনি, যে-তুমি আহ্বান করেছো একরাশ কণ্ঠস্বরকে,
এবং যার ভাবনাগুলি মেপে নিয়েছে তোমার বৃত্তকে,
অনুসরণ করো রাত্রির সেই ডাকহরকরাকে
নিঃশব্দ পায়ে-পায়ে।

পুরাণ, নানা কিংবদন্তী এবং শব্দসমষ্টিকে
যখন তুমি শূন্য ক'রে ফেললে,
তোমাকে যেতেই হবে তাহ'লে,
দেবতাদের অন্য কোনো সেনাবাহিনী
আর তুমি দেখতে পাবে না,

দেখতে পাবে না ইউফ্রাতিসের উপর তাদের মসনদ,
তাদের রচনাপুঞ্জ এবং দেয়ালও না—
ঢালো, মিরমিদন, ঢালো,
ঢালো অন্ধকার সুরা ভূমিতলের উপর।
হয়তো সময় আসতো, এসে হয়তো ডাক দিতে পারতো;
জন্ম নেবার কি হ'য়ে-ওঠার যন্ত্রণা আর কান্না
সব-কিছু কুসুমিত হবে
এই রাত্রিময় সুরার প্রবহমানতায়,
দীর্ঘ দীর্ঘ কাল—হয়তো যুগ—ঝরনার মতো ব'য়ে যাবে শুব্ধ,
হয়তো কিছুই থাকবে না তীরভূমির :
সেই ডাকহরকরাকে ফিরিয়ে দাও মুকুট,
ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও তোমার স্বপ্ন, এবং তোমার দেবতাদের॥

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সংশোধন

'কবিতা'র বর্তমান সংখ্যার ১৭১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'দায়' কবিতাটির নবম পংক্তির প্রকৃত পাঠ এই—

'না হ'লে, লাফানো যেত আকাশ কি পাথর জড়িয়ে'

গত পৌষ সংখ্যার ৯২ পৃষ্ঠার প্রথম পংক্তিতে 'পুণ্য ঘরে' ভ্রমক্রমে 'শূন্য ঘরে' ছাপা হয়েছে, ও দ্বাদশ পংক্তিতে 'মার্কিদেশ' শব্দটি যে আসলে 'মার্কিনদেশ' তা আশা করি পাঠকরা অনুমান করতে পেরেছিলেন।

লেখকদের বিষয়ে

* 'কবিতা'য় প্রথম প্রকাশ

জীবনানন্দ দাশ-এর একটি নূতন কাব্যগ্রন্থ 'রূপসী বাংলা' নাম দিয়ে কিছুদিন আগে প্রকাশ করেছেন সিগনেট প্রেস। **জ্যোতির্ময় দত্ত** আধুনিক কবিতা বিষয়ে একটি পুস্তক রচনার পরিকল্পনা করেছেন। **গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়** সাঁৎরাগাছিতে থাকেন, কর্ম করেন রেলওয়ে আপিশে, নানা পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হ'য়ে থাকে। ***তারাপদ রায়** 'পূর্বমেঘ' পত্রিকার সম্পাদক, তাঁর আদিনিবাস পূর্ববঙ্গে, ঢাকায় বাংলা ভাষা-সংক্রান্ত আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। **দেবতোষ বসু** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনবিজ্ঞান অধ্যরন করছেন। ***নবনীতা দেব** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছেন। **পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য** বনহুগলির ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন কলেজে ইংরেজির অধ্যাপনা করেন। **বুদ্ধদেব বসু**-র নতুন কাব্যগ্রন্থ 'যে-আঁধার আলোর অধিক' এম. সি. সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হ'লো। **মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**-এর সম্পাদনায় বাংলা আজগবি গল্পের একটি সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে। **শক্তি চট্টোপাধ্যায়** তাঁর প্রথম কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করছেন। ***সন্দীপ সরকার** জন্মেছিলেন এক খৃষ্টান পরিবারে, পড়াশুনো করেছেন রাঁচিতে, বর্তমানে কৃষ্ণনগরে ব্যবসা করেন। ***সুভাষকুমার মিত্র** স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত ও ১৪১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-১৩ মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড-এ মুদ্রিত।
সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক : বুদ্ধদেব বসু। সহকারী সম্পাদক: নরেশ গুহ।

কবিতা
আষাঢ়, ১৩৬৫
বর্ষ ২২, সংখ্যা ৪
ক্রমিক সংখ্যা ৯৪

যত সব টেকো মাথা

বিষ্ণু দে

Bald heads forgetful of their sins—Yeats.

যত সব টেকো মাথা নিজেদের পাপ ভুলে গিয়ে
জরজরে পণ্ডিত যত মান্য মোটা মাথা
থীসিসে ডাক্তার হয় সাহিত্যের থাইসিস ছড়িয়ে,
বই সম্পাদনা করে, টীকাভাষ্য লিখে যায় যা-তা,
কবিতার নাটকের, লিখেছে যা যুবকেরা সুখনিদ্রা ত্যেজে
প্রেমের ব্যথায়—যদি সুন্দরীর মন তাতে ভেজে।

এদের এক রা, এরা কালি ছোঁড়ে কাশির ছিট্টায়,
এদের জুতোর তলা ক্ষ'য়ে যায় একটি পাপোশে ;
সকলে যা ভাবে বোঝে এরা সেই ভাবনা পেটায়,
একটি গোয়ালে সেই একটি এঁড়েই এরা পোষে।
হে বিধাতা, এরা সব কী মন্তব্য করত হতাশ
এদের পথেই যদি চলতেন কবি কালিদাস?

স্টীভন স্পেণ্ডর : দুটি কবিতা

বেঠোফেনের অন্তিম মুখচ্ছদ

মনশ্চক্ষে দেখি তাঁকে, ভারাক্রান্ত এখনও ললাট।
মহাকায়, তাম্রকৃষ্ণ, নতশির, বিস্রস্ত অলক,
সমস্ত নিসর্গে তিনি ল্যাঙল চালান। তাঁর মুখ
দেয়ালে ঝোলানো এই একটি মুখোশ, অন্তরিত রূপ,
মৃত্যুর ঢালাই মুখ, শাদা-শাদা আলোয় তাকিয়ে আছে নিষ্পলক।

দেখি স্থূল হাত দুটি বাঁধা; সেই কাগতাড়ুয়ার কোট;
আলো উঠে ধাক্কা দেয় দুই গর্তে চোখের ফাটলে;
পশুটা বসেছে চেপে ঐ মুখবিবরে, যার ফাঁকে
অর্গানের নলে-নলে ফাঁপা যত বায়ুভুক্ মুখ;
ওখানে বাতাস গায়, তীক্ষ্ণ সাধ কাঁদে উচ্চরোলে।

আমার দৃষ্টির পথে তিনি যান জাহাজের মতো।
তিনি ছাড়া আর কিবা লোহা? দুই ভাগে মাঠক্ষেতবন
ভেঙে চুরে হ'য়ে যায় ফু'লে-ফু'লে সমুদ্রের পরিপ্লব জল।
তিনি বন্দী, মুখোশে প্রচ্ছন্ন, তিনি সত্তা থেকে নির্বাসিত;
ফোয়ারার মতো ওঠে জীবন, দেখেন তিনি—ঐ বাইরে জীবন।

অথচ ও-মাথাতেই জট বাঁধে গর্জমান মেঘ,
পাক খায়, যেমন শামুকে শাঁখে পাক খায় গর্জমান ঢেউ।
ভিজা পাতা চুপি-চুপি কথা কয়, নিচু হ'য়ে নেমে বৃষ্টিজলে
চৈত্র জাগে তাঁর মধ্যে, ফুসফুস নিরুদ্ধ করে তাঁর,
আর তাঁর মস্তিষ্কের যন্ত্রণার সিঁড়ি বেয়ে চলে।

তারপরে ঢাকীরা বিদায় নেয়, হয় দুরন্ত উদ্ভাস;
এবারে মেঘলা সব চূড়া নগ্ন; ঔপনিষদ একম্
দিগন্ত বিলীন করে; নীলিমা আরতি করে আকাশের,
শান্তি, শান্তি···তারপরে কঙ্কালকরোটি আর স্বপ্ন চিরে ফুঁড়ে
ঐ আসে আমাদের সব বাতি মুছে দিয়ে, তূর্যমুখে, সূর্যই স্বয়ম্॥

প্রাতঃস্মরণীয় তারা

সর্বক্ষণ তাঁদের চরিত ভাবি যাঁরা প্রকৃতই মহৎ ছিলেন।
যাঁরা, মাতৃগর্ভ থেকে, মনে রেখেছেন মানবমনের ইতিহাস,
আলোকের দালানে-দালানে, যেখানে প্রহরগুলি সূর্য সব
অন্তহীন এবং সংগীতে উন্মুখর। যাঁদের উচ্চাশা কমনীয়,
যাঁরা শুধু চান যে তাঁদের ওষ্ঠাধর, তখনও আগুনে রাঙা,
বলুক আত্মার কথা গানে-গানে ঢেকে দিয়ে আপাদমস্তক।
এবং সঞ্চয় যাঁরা করেছেন বসন্তের ডালপালা থেকে
সাধ ইচ্ছা, ঝরেছে যা তাঁদের শরীর বেয়ে মঞ্জরীর মতো।

মহামূল্য নীতি হ'ল কখনও না ভুলে যাওয়া
রক্তের মৌলিক হর্ষ, অক্ষয় নির্ঝর থেকে ভরা,
ভেদ ক'রে বহু শিলা আমাদের পৃথিবীর কালেরও আগের।
সকালের সরল আলোয় কখনও না অস্বীকার করা তার সুখ
অথবা কদাচ তার সুগভীর সায়ন্তন প্রেমের প্রার্থনা।
কখনও না ক্রমিক অভ্যাসে ট্রাফিকের গোলমালে ধোঁয়া কুয়াশায়
মানসের মরশুমের মুখ চেপে ধরা।

তুষারের সন্নিকটে, সূর্যের সান্নিধ্যে, সর্বোচ্চ প্রান্তরে
চেয়ে দেখ কেমন এঁদের নাম সংবর্ধনা পায় ঘাসের হিল্লোলে

আর শুভ্র মেঘে-মেঘে পতাকা নিশানে
এবং নিবিষ্ট নীলাকাশে বাতাসের আনম্র মর্মরে।
তাঁদের সবার নাম, যাঁরা আজীবন লড়েছেন জীবনের তরে,
যাঁরা নিজেদের হৃদয়ের পাশে রেখেছেন অগ্নিকেন্দ্র।
সূর্যের সন্তান তাঁরা, কিছুকাল যাত্রীও ছিলেন সূর্যলোকে,
এবং ভাস্বর হাওয়া ভ'রে দিয়ে গিয়েছেন নিজেদের গৌরবস্বাক্ষরে।

অনুবাদ: বিষ্ণু দে

চারটি নিবেদন ও একটি প্রশ্ন

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

চোখ
(মালার্মে-কে)

চোখগুলো ছিল ভালো, এখন তেমন
উজ্জ্বলতা নেই ; দিলে মন
দেখা যায় কুয়াশা ধূসর
বহু ব্যবহারে পরপর।
যত্তোটুকু আলো থাকে তাকে
কাচের খাঁচায় পুরে রাখে।
এই তো নিয়ম। তাই ভাবি
ক্ষয়ের লক্ষণ বুঝি এই।
আমার থয়েরি চোখও দাবি
করেছিল কতোই না—ইয়ত্তা তো নেই!

স্বপ্নোদ্ধার
(হাইনে-কে)

স্বপ্নে নয় বাস্তবিক
তেমন দেশের পাত্তা ঠিক
জানতাম যে আঁজ তা দিক
করছে মন হে হাইনে!
আজকে আর তা চাইনে
চম্পা-ভাই পারুল-বোন
তাদের সব প্রেমের কোণ
তীরের ফলা, স্বপ্ন নিক।

কবিতা
(রিল্‌কে-কে)

তোমাকে দিইনি আমি সবটুকু মন
আরো দাবি ছিল ব'লে মনের উপর।
সব দাবি মিটে যায় যখন তখন
তোমাতেই ফিরে আসি পাই নিজ ঘর।
আমরা সবাই মিলে কী মধুর স্বর
ঐকতান যেন, জানো, কবিতা আমার?
না বুঝুক কেউ সেই মেঘ-আড়ম্বর
আমি জানি বজ্র-অগ্নি, শীতলতা তার।

স্থির বিন্দু
(এলিঅট-কে)

একটি স্থির বিন্দুতে যেতে চাই আমি।
আকাশ যেখানে এসে মেশে একটি ঘাসের ডগায়
হাওয়ায় নড়ে না যে ঘাস
তার স্থির বিন্দু যেমন তেমন বিন্দু দাও আমায়
হে আমার মন-পবন!
তুমি স্থির হ'লেই তা পাব
আমার পাবন তা-ই।

র‍্যাঁবোর প্রতি

মেয়েটি কীর্তন গায় তারস্বরে কীর্তনের দলে
ভোর হ'লে আসে আমাদের ছোটো রান্নার মহলে
রানী যেন যদিও সে কুটনোবটিতে।
মেশামেশি বাঙালে-ঘটিতে
এ-বস্তির এ-মেয়েটি কী হবে বলো তো, র‍্যাঁবো, ভেবে—
কোন সৈন্যাবাস তাকে নেবে?

চুম্বক

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আমি ছুঁতে চাই কাঠের প্রাণ, আমি ছুঁতে চাই ফুলের প্রাণ, আমি তোমাকে ছুঁতে চাই যুগে যুগান্তরে।

আমি তোমাকে ছুঁতে চাই হাওয়ায়, আমি তোমাকে ছুঁতে চাই জলে, আমি তোমাকে ছুঁতে চাই আলোয় অন্ধকারে, ছুঁতে চাই আমার বেদনায়।

ছুঁতে চাই যেখানে নদীরা মিললো না, ছুঁতে চাই যেখানে নদীরা মিলবে, ছুঁতে চাই যেখানে বৃথাই কেঁদে মরলো মৃত দুর্গের পাষাণ, তবু এগিয়ে এলো না দূরে-স'রে-যাওয়া সমুদ্র।

আমি আমাকে চাই না শোনাতে, আমি আমাকে চাই না দেখাতে, ওগো আমি তোমাকে ছুঁতে চাই, শুধু আমাকে ছোঁওয়াতে চাই যুগ হ'তে যুগান্তরে, প্রাণ দিয়ে প্রাণে।

আর কী-সে দুঃসহ প্রেম যাতে এই ফুল, এই কাঠ, এই প্রাণ-হাওয়া-অন্ধকার আমরা সকলে হলাম একে অন্যের তুমি, সবাই হলাম চুম্বক এই পৃথিবীর অপরিচিতের ভিড়ে।

দুটি কবিতা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

কাকতাড়ুয়া

জানি না, ভয় ডানায় আছে কিনা
দুঃস্থ হাত পাথর জড়ো করে,
নগদ দেবো বিদায়ে দক্ষিণা—
সয় না ডাক পাখির, কালোপাখির !

চ্যাঁচায় কেন ? চেঁচিয়ে পাবে কাকে ?
মৃত্যু যদি লুকিয়ে থাকে ডালে
ফলের বোঁটা খসাবে হাঁকডাকে—
মিশিয়ে দেবে ছড়ানো জঞ্জালে !

কী ক'রে হয়। আমার চোখে হাঁটে
হাতটি ধ'রে শিশুর, এলোচুলে
একদা যার বাড়ানো চৌকাঠে
আমিই হবো গৃহস্বামী ভুলে।

তবুও কেন চেঁচিয়ে ওঠে ভোরে
রুগ্ন কাক, কাতর ডানা ঝাড়ে--
সয় না ডাক পাখির, কালোপাখির,
স্বস্তি কই আ-বাঁধা সংসারে।

পূর্বাপর

প্রথমে কিছুই নেই : অনুজ্জ্বল রাত্রি ভ'রে আছে
নক্ষত্রবিহীন স্বপ্নে। মৃতবৎসা গাভীটির ডাকে
দয়ার্দ্র হয়েছে কেউ। আর, আনাচে-কানাচে
নির্ভয়ে জেগেছে নারী হাত-বদলের কোনো ফাঁকে ;
সবাই সন্তুষ্ট, সুখী, বড়োজোর ব্যর্থপ্রেমে গাঢ়,
রেস্তোরাঁয় কীর্তিমান, উপলক্ষে জ্যোতির্ময় নেতা—
কিন্তু তাতে কতোটুকু ! তুমি হারো, অথবা না হারো
কোথায় কখন কেন—কেউ আর খোঁজে না প্রণেতা।

পরে সব কাছে এলো। বস্তুত, পাল্টে এলো ব'লে
কন্যার জননী আর ব্যস্ত নন, দূরের আকাশে
আসবাব, গোলাপ, সব ডুবে যায় মগ্ন কোলাহলে—
যেন বৃষ্টি হবে ব'লে, তাড়া নেই ইতর প্রকাশে,
অদ্ভুত, নরম, ধীর, অলস ঘণ্টার গলা ধ'রে
বাষ্পের প্রথম শিশু খেলা করে। খেলার প্রহরে
নির্লোভ শ্বাপদ, কিংবা রুদ্ধকাম মেয়েটির চোখে
অন্য রং নেমে আসে। সবটুকু চায় এক ঢোঁকে ॥

তিনটি কবিতা

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

বাঁশি

বাঁশি-বাজানো আঙুলে আছে বিষ।
আগুনে নয়, আঁধারে নয়, গানে
পল্লবিত প্রেমিক, তুমি জাগো
ফুল-ঝরানো সান্ধ্য অভিমানে।

বুকের বোঝা নামিয়ে এই বেলা
অর্ধমৃত সাপ-নাচানো দেশে
যেয়ো না। তুমি নিভৃত-হওয়া নীলে
মগ্ন থেকো নিজেকে ভালোবেসে।

পথিক, তুমি প্রবাসী ঘরে-ঘরে ;
এই বিষাদে বাজে তোমার বাঁশি :
অমৃত নয়, গরল ; তাই দিয়ো।
প্রেমিক, আমি তোমায় ভালোবাসি।

স্মৃতি

বিষাক্ত স্মৃতি চিরদিন রেখো বুকে ;
যেহেতু তারাই জীবনের যৌতুক।
ঝলকে-ঝলকে রক্ত-ঝরানো মুখে
থাকে যেন কিছু মৃত্যুরও কৌতুক।
স্বপ্নবিলাসী প্রতি মুহূর্তে মরে,
তা নিয়ে দুঃখ কারো নেই দৃশ্যত ;

উনপঞ্চাশ বায়ুর আঘাতে, ঝড়ে
পার্থিব সুখে মহাজন হয় হত।
রৌদ্র-নাচানো রঙ্গে, পাগল হাওয়ায়
ধুলোবালি দেয় দু'চোখের দক্ষিণা,
সেই বেদনার আনন্দে দু'বেলায়
প্রেমিক, তোমার স্মৃতিকে করি না ঘৃণা।

নাম

ফুলের নাম বকুল
প্রেমিক তাকে জানে।
তোমার কোনো নাম
নেই তো কোনোখানে।
নদীর জলে ঢেউ
সেখানে এক তান,
বনে হাওয়ার বীণা
সেখানে এক গান।
পথে প্রেমের স্থিতি
পথিক তাকে জানে,
তোমার কোনো নাম
নেই তো কোনোখানে।

হে তৃষ্ণা

তন্ময় দত্ত

পুরোনো চৌকো ধুলোমাখা মুখ কৃষ্ণ স্ফটিক
অবলীন মুখ বিরাগ এড়ায়ে তুষার কাড়ে
জলপথে শোনো কী গভীর গান, জলপথে চলো হাওয়া ঠেলে মুখ
আমরা এখানে নিবিড় জনতা ধুলোমাখা মুখ।

বৃষ্টির পট নেহারি ঝুরেছে শরীর এখানে ত্বরিত ক্ষুর
গরম পাথর লাফালাফি করে মরীচিকা নেই, বালুকা মৃত,
দূরে বৃষ্টির বড়ো-বড়ো চোখ যেন মনে হয় অলীক দেখি'
হে তৃষ্ণা, তুমি লৌহের স্তূপ কোনোদিন ছেড়ে যেয়ো না চ'লে।

হাত খুলে পড়ে, গোড়ালি ঝরেছে, দূরে হাঁস যেন, গাভীরা চরে
জলে ভাসে দেখ পাহাড়ের রাশি দল বেঁধে দেখ নেমেছে জলে
হাঁটু ছুঁয়ে-ছুঁয়ে নেমেছে আকাশ, নিচু হ'য়ে দেখে পাহাড়রাশি
আমার আনন ধূলি-'পরে লোটে, হে তৃষ্ণা, তুমি যেয়ো না চ'লে।

আমি মুখ দেখি হ্রদজলমুখে মাঠের ললাটে পোড়াটে মুখ
পাহাড়ের ঢালে গুঁরু ধারাপাত বৃষ্টিছায়ায় মড়ক ওড়ে,
পুরোনো চৌকো ধুলোমাখা মুখ অলীক, অলীক স্ফটিক কৃষ্ণ,
তৃষ্ণা, আমায় কিছু প্রাণ দাও, কিছু বেদনায় বাঁচার ভিক্ষা।

আরশি-নগর

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

আরশি-নগরে পড়শি বসত করে।
ধান ভেসে গেছে, মানুষ মড়কে মরে॥

লতাপাতা জামা, চিত্রিত দুটি ভুরু,
সূর্য হাসায় গুপুরির গরিমাকে ;
শাঁখের শব্দে আলিপুরে ফেরে হাঁস,
পড়শি আমার উঠলো পন্টিয়াকে।
(৬-২৯) মনুমেণ্টের নিচে
জনসভা তাকে ডাকে।

ডুবে গেছে কত শান্তির সংসার।
ত্রস্ত গোরুর দুটি চোখ দেখে ভয়,
ধ'রে আছে লোক উঁচু বাড়িটির চুড়ো,
সাহায্য দরকার।

জলে ভাসে ঘর—সান্ত্বনা দরকার।
কাপড় অন্ন নিয়ে উড়ে যায় প্লেন,
তারায়-তারায় অনন্ত শাদা রোদ,
গুনতে পারিনে আর।

গণক প্রেমিক ভিক্ষুকে গুলজার
রূপসী শহর—কোথায় আরশি তার ?

একটি কবিতা

অর্চন দাশগুপ্ত

রুপালি ওক-এর ফুলে তরাইয়ের উজ্জ্বল সকাল
একটি আশ্চর্য নদী নির্জন নিজেকে মেলে দিয়ে

এখানে খোলস কেন? নগ্নতায় নির্ভার শরীরে
অত্যন্ত সহজে নামি। জলের উপরে মুখ রেখে
ঠোঁটের আস্বাদ এলো, শিরশিরে এ-নদীর ঠোঁট
অদ্ভুত নরম আর মোলায়েম জলজ আঘ্রাণ,
হাওয়ায় নিশ্বাস কারো, রোমে-রোমে স্রোতের আঙুল
চোখে ঘুম এনে দিলো, অনুভবে অন্য এক নদী :

একদা বলিষ্ঠ রোদে এ-জলের প্রথম প্লাবনে
যে-দুরন্ত তাগাদায় প্রাণগুলি বহুধা হওয়ার
অনিশ্চয়ে ভেসেছিলো, ফিরে এলো জলের আশ্লেষে
হিংস্র হাঙরের মতো স্বাস্থ্যবান শিকারি শরীরে।

আমার সমস্ত শিরা ডুবে গেলো ক্রমশ কখন
বরফের মতো এক আগুনের নীলাভ ঠাণ্ডায়॥

সনেট

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

জটিল পাহাড় তুমি বেদনার্ত ঝর্না পাঠিয়েছো ;
দুধারে সবুজ রেখা, আরেক সবুজরেখা জলের ভিতরে
খেলা ক'রে, রুপালি বা রক্তিম মাছের পুঞ্জ, জল স'রে স'রে···
অবিরল বুকে লাগে অবিরল কোথাও শুনেছো ?

জটিল পাহাড় তুমি নদী জাগে নদীর ভিতরে
মগ্ন পান্থজন, তার তরঙ্গিত নখে ছেঁড়ে বেড়ালের মতো
তীর বা বিচ্ছিন্ন কাঁটা, দ্বীপ আর ভাসমান যত
ভোজ্যবস্তু—প্রণয়ী ; সে হাহাকার উন্মোচিত করে।

ঐ মাছগুলি, গুল্ম হৃদয়ের কাছে ছিলো স্মরণীয় কাল—
হৃদয় কর্তাল কোন সুসঙ্গত বনাবেশে নীল মৃদু ক্ষরে
কালো জ্যোৎস্না, আলোকিত কালো জ্যোৎস্না চারিদিকে ঝরে···
তার মগ্ন অন্ধ চলা দৃষ্টিহীন অন্ধ চলা চূড়া ক্ষুব্ধ হাসে—
লালসা বহায় দূরে অতিদূরে অভ্র-উর্ণাজাল
চূড়ার চরণ থেকে স'রে যেতে পারবে না প্রভাসে।

'ল্য ফ্ল্যর দ্যু মাল' থেকে

শার্ল বোদলেয়ার

সে-রাতে ছিলাম…

সে-রাতে ছিলাম কদাকার ইহুদিনীর পাশে,
পাশাপাশি ছুটো মৃতদেহ যেন এ ওকে টানে;
ব্যর্থ বাসনা; পণ্য দেহের সন্নিধানে
সে-বিষাদময়ী রূপসী আমার স্বপ্নে ভাসে।

মনে প'ড়ে গেলো সহজাত রাজভঙ্গি তার,
দৃপ্তললিতে সে-কটাক্ষের সরঞ্জাম,
গন্ধমদির মুকুটের মতো অলকদাম—
যার স্মৃতি আনে প্রণয়ের পুনরঙ্গীকার।

ও-বরতনুতে চুম্বনরাশি দিতাম ঢেলে,
শীতল পা থেকে কালো চুল পর্যন্ত
ছড়িয়ে গভীর সোহাগের মণিরত্ন,—

বিনা চেষ্টায় যদি এক ফোঁটা অশ্রু ফেলে
কোনো সন্ধ্যায়—নিষ্ঠুরতমা হে রূপবতী!—
ম্লান ক'রে দিতে ঠাণ্ডা চোখের তীব্র জ্যোতি।

বারান্দা

প্রেয়সী, স্মৃতির মাতা, দয়িতার ঈশ্বরীপ্রতিমা,
হে তুমি, সর্বস্ব সুখ, বাসনার সর্বস্ব আমার!
মনে কি পড়ে না সেই সোহাগের স্নিগ্ধ মধুরিমা,
সন্ধ্যার উদার মায়া, অগ্নিকুণ্ডে আতিথ্যবিস্তার,
হে তুমি, স্মৃতির মাতা, দয়িতার ঈশ্বরীপ্রতিমা।

চুল্লির জ্বলনে দীপ্ত সেই সব সন্ধ্যার প্রয়াণ!
সন্ধ্যা নামে বারান্দায়, রক্তিম গুণ্ঠনে রমণীয়—
পেলব তোমার বক্ষ, অন্তরে কী অমল কল্যাণ!
কত কথা আমাদের—ধ্বংসহীন, অবিস্মরণীয়—
চুল্লির দহনে দীপ্ত সেই সব সন্ধ্যার প্রয়াণ!

কোমল সন্ধ্যার তাপে কী সুন্দর সূর্যের সম্ভার!
কী গভীর অন্তরীক্ষ! স্ফীত প্রাণ কেমন বিশ্বাসে!
তোমার আননে ঝুঁকে, ওগো রানী, আরাধ্যা আমার,
মনে হয় তোমার শোণিতগন্ধ পেয়েছি নিশ্বাসে।—
সেদিন, সন্ধ্যার তাপে, কী সুন্দর সূর্যের সম্ভার!

নেমে আসে রাত্রি, যেন অবরুদ্ধ অন্দরমহল,
তোমার চোখের তারা অন্ধকারে আমার উদ্ধার,
নিশ্বাসে তোমার ঘ্রাণ—কী মধুর, তীব্র হলাহল!
ঘুমায় আমার হাতে, ভ্রাতৃভাবে, পা দুটি তোমার
যবে রাত্রি নামে, যেন অবরুদ্ধ অন্দরমহল।

জানি আমি মন্ত্র, যাতে আনন্দিত মুহূর্তেরা ফেরে,
আমার অতীত, দেখি, তোমার জানুতে রাখে মাথা,
আর কোথা খুঁজে পাই লাস্যময় তোমার রূপেরে
যদি না তোমারই প্রাণ সুন্দর তনুতে রয় গাঁথা?—
জানি সেই মন্ত্র, যাতে আনন্দিত মুহূর্তেরা ফেরে!

সেই সব অঙ্গীকার, গন্ধ, আর অনন্ত চুম্বন,
অগম্য গহ্বর থেকে আবার কি জন্ম নেবে তারা,
অতল সিন্ধুর তলে স্নান ক'রে সূর্যের যৌবন

যেমন নূতন হ'য়ে আকাশের প্রান্তে দেয় সাড়া ?
—হায়, সব অঙ্গীকার, গন্ধ, আর অনন্ত চুম্বন !

ভূতে-পাওয়া

আজ কম্বলে আবৃত সূর্যে তোমার মিল।
জীবনের চাঁদ ! তারই মতো মুখে টানলে ছায়া ;
হও ঘুমন্ত, গম্ভীর, মূক, ঝাপসা ধোঁয়া,
বা নির্বেদের অতলে ডুবিয়ে দাও নিখিল ;

তেমনি তোমাকে ভালোবাসি ! তবু, মরজি হ'লে
এসো না বেরিয়ে গ্রহণমুক্ত তারার মতো
প্রগল্‌ভতার প্রলাপ যেথায় বিঘূর্ণিত,
ওঠো খাপ থেকে দীপ্ত ছুরিকা হঠাৎ ঝ'লে !

জ্বেলে নাও ঝাড়লণ্ঠনে ঐ চক্ষুজোড়া !
লুব্ধ চোখের লালসে জলুক বখাটে ছোঁড়া !
আখুটে, অসুখী—যা তুমি, আমার সুখ তাতেই ;

যা-ই হও, কালো রাত্রি অথবা রঙিন ভোর,
আমার কম্প্র তনুতে একটি তন্তু নেই
যা বলে না : "প্রিয় রাক্ষসী, আমি পূজক তোর !"

সান্ধ্য সুর

এই তো সেই লগ্ন, যবে বৃন্ত-'পরে দুলে
প্রতিটি ফুল মিলিয়ে যায় যেন ধূপের ধোঁয়া ;
গন্ধ আর শব্দ নিয়ে ঘূর্ণমান হাওয়া ;
করুণ ভাল্‌জ্‌-নাচের তাল ফেনিয়ে ওঠে ফুলে।

প্রতিটি ফুল মিলিয়ে যায় যেন ধূপের ধোঁয়া ;
বেহালা, যেন আতুর প্রাণ, তীব্র তান তোলে ;
করুণ ভাল্‌জ্‌-নাচের তাল ফেনিয়ে ওঠে ফুলে ;
বেদীর মতো আকাশে নামে বিষাদঘন মায়া।

বেহালা, যেন আতুর প্রাণ, তীব্র তান তোলে ;
কোমল প্রাণ, ঘৃণ্য তার শূন্য কালো বাওয়া।
বেদীর মতো আকাশে নামে বিষাদঘন মায়া,
রক্তঝরা উদ্‌গিরণে সূর্য যায় গ'লে।

কোমল প্রাণ, ঘৃণ্য তার শূন্য কালো বাওয়া,
কুড়িয়ে নেয় অতীতে যত আলোর কণা জ্বলে ;
রক্তঝরা উদ্‌গিরণে সূর্য যায় গ'লে···
তোমার স্মৃতি আমার বুকে তর্জনীর ছোঁওয়া।

বিতৃষ্ণা

হাজার বছর যেন বেঁচে আছি, এত স্মৃতি জমেছে আমার।

ভারাক্রান্ত প্রকাণ্ড দেরাজ এক, খোপে-খোপে যার
রয়েছে দলিল, পদ্য, প্রেমপত্র, শস্তা উপন্যাস,
হলুদ রশিদে মোড়া কবেকার দীপ্ত কেশপাশ—
তারও বেশি গুপ্ত আছে মগজের বিষণ্ণ কোটরে।
সে যেন গহ্বর এক, পিরামিড ; বিরাট জঠরে
যত শব ধরে, তত গোরস্থানে কখনো পড়ে না।
—আমি এক আঁধার কবরখানা, চাঁদের অচেনা ;
মূর্ত যেন মনস্তাপ, দীর্ঘায়িত কৃমিরা সেথায়
যে-মৃত আমার প্রিয়, তাকে নিত্য খুঁটে-খুঁটে খায়।

বিবর্ণ গোলাপে ভরা আমি এক জীর্ণ অন্তঃপুর,
সেকেলে কাঁচুলি, জামা ঝুলে আছে বিস্রস্ত, প্রচুর,
আর শুধু করুণ পাস্টেল-চিত্র, দুটি ম্লান বুশে*
অন্তঃসারশূন্য এক করঙ্কের গন্ধ নেয় শুষে।

এই খঞ্জ দিবসের দীর্ঘতায় কে পারে ছাড়াতে—
যখন, তুষারময় বৎসরের হিমার্ত কারাতে
ব্যাপ্ত হয় নির্বেদ—চেতনারিক্ত জড়ের সন্তান—
ব্যাপ্ত হয় অমরত্বে, অন্তহীন যার পরিমাণ।
—আজ থেকে সপ্রাণ পদার্থ, তোর স্বরূপ নিশ্চিত
শুধু এক শিলাখণ্ড, নামহীন ত্রাসে পরিবৃত,
পুরাতন স্ফিংক্স এক সাহারার অস্পষ্ট অকূলে
তন্দ্রায় বিলীন, তাকে উদাসীন বিশ্ব রয় ভুলে,
মানচিত্রে নাম নেই, পাশবিক ভঙ্গিমায় তার
ক্ষণিক সূর্যাস্তরাগ গান গায় শুধু একবার।

বিতৃষ্ণা

আমি যেন রাজা, যার সারা দেশ বৃষ্টিতে মলিন।
ধনবান, নষ্টশক্তি, যুবা, তবু অতীব প্রবীণ,
শিক্ষকের নমস্কার প্রত্যহ যে দূরে ঠেলে রেখে,
শিকারি কুকুর নিয়ে ক্লান্ত করে নিজেই নিজেকে।
কিছুই দেয় না সুখ—না মৃগয়া, না শ্যেনচালন,
না তার অলিন্দতলে মৃতপ্রায় তারই প্রজাগণ।

*ফ্রাঁসোয়া বুশে (Francois Bouchet): ১৭০৩-১৭৭০। ফরাশি চিত্রকর, সমকালীন অভিজাত-সমাজের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

মনঃপূত বিদূষক প্রহসনে যত গান গাঁথে,
আনত ললাট থেকে রোগরেখা পারে না সরাতে;
ফুলচিহ্নে আঁকা, তার শয্যা, তাও নেয় রূপান্তর
কবরে, এবং যায় সাধনায় রাজারা সুন্দর,
জানে না সে-মেয়েরাও, লজ্জাহীন কোন প্রসাধনে
আমোদ ফোটানো যায় এ-তরুণ-কঙ্কালের মনে।
করেন কাঞ্চনসৃষ্টি, সে-মুনির মেলেনি সন্ধান
কোন বিষময় দ্রব্যে অহোরাত্রি নষ্ট তার প্রাণ।
এমনকি রক্তস্নান, লিপ্ত যাতে সব ইতিহাস,
পুরাতনী রোমকের, অর্বাচীন দস্যুর বিলাস,
তাও এই মূঢ় শবে তাপলেশ পারে না জোগাতে,
লিথির সবুজ স্রোত—রক্ত নয়—বহে যে-শিরাতে।

কবর

আজকে তোমার যে-তনুর অভিমান,
কোনো গভীর নিশার অন্ধকারে
দয়া ক'রে এক নোংরা নালার ধারে
তাকে গোর দেবে কোনো সৎখৃষ্টান।

সাধ্বী তারার অধিকৃত সেই ক্ষণে
জ্যোতিষ্কদের চোখেও ঘুমের চাপ
নেমে আসে, আর মাকড়শা জাল বোনে,
বিষাক্ত ডিমে বাচ্চা ফোটায় সাপ।

অভিশাপে সংবিদ্ধ মাথার 'পরে
শুনবে কেবল, সকল বছর ভ'রে
তরক্ষুদের চীৎকার অশ্রান্ত,

কাঁদে আধপেটা ডাইনি বুড়ির গোষ্ঠী
হাবা লম্পট বুড়োর ফষ্টিনষ্টি,
চোর, গুণ্ডার শয়তানি চক্রান্ত।

ধ্বংস

দামাল পিশাচ, নিত্য আমার পাশে
বাতাসের মতো অতনু, সাঁৎরে ফেরে,
তাকে পান ক'রে জ্বালা ধরে ফুশফুশে
শাশ্বত পাপলিপ্সায় যাই ভ'রে।

আমি শিল্পের প্রেমিক, সে-কথা জেনে
মোহিনী নারীর মূর্তি কখনো ধরে,
মজায় অধর অকথ্য অনুপানে
ধর্মধ্বজ নানা ছলছুতো ক'রে।

গাঢ় প্রান্তর, নির্বেদে অফুরন্ত,
সেদিকে ছুটিয়ে করে সে আমাকে ক্লান্ত,
যেথা ভগবান দেন না কখনো দৃষ্টি,

আর বিহ্বল আমার চক্ষু জুড়ে
হানে ধ্বংসের রক্তলোলুপ গোষ্ঠী
কাটা ঘা, পুঁজের নোংরা ন্যাকড়া ছুঁড়ে।

এক শব

কী আমরা দেখেছিলুম হঠাৎ পথের মোড়ে
গ্রীষ্মমধুর দিনে,
শিলার শয়নে গলিত জন্তু রয়েছে প'ড়ে—
প্রেয়সী, পড়ে কি মনে ?

আর্দ্র নারীর ধরনে শূন্যে পা দুটি তোলা,
তাপে, ঘামে বিষ কীর্ণ,
লজ্জাবিহীন উদাসীনভাবে উদর খোলা,
বিকট বাষ্পে পূর্ণ।

প্রকৃতির দান এ-পূতিপুঞ্জে রাঁধবে ব'লে
রৌদ্ররশ্মি জ্বলছে,
ফিরে দেবে শত খণ্ডে, যা তিনি মহৎ বলে
মিলিয়েছিলেন গুচ্ছে ;

উত্তম শব, আকাশ দেখছে দৃষ্টি মেলে,
ফুটলো ফুলের মতো,
এমন তীব্র গন্ধ, ভেবেছো হঠাৎ ট'লে
ঘাসে প'ড়ে যাবে না তো ?

ঝাঁকে-ঝাঁকে মাছি প'চে-ওঠা গলা জঠর ছেয়ে ;
আর নামে, অবিরল,
ঘন, কালো স্রোতে সপ্রাণ ছেঁড়া টুকরো বেয়ে
কৃমির সৈন্যদল।

আর এই সব ওঠে আর পড়ে ঢেউয়ের মতো,
কাঁপে আচমকা স্বননে ;
যেন সে-শরীর শিথিল বায়ুতে নিশ্বসিত,
জীবিত পুনর্জননে।

সে এক জগৎ, অদ্ভুত সুর ঝরে তা থেকে,
যেন জল গতিমন্ত,
কিংবা বাতাস, কিংবা কুলোয় ঘুরিয়ে ঝেঁকে
শস্য বাছার ছন্দ।

যত আছে রূপ, স্বপ্নে সকলই বিলীয়মান ;
আর, বিস্মৃত পটে,
শিল্পীর কৃতি, বিকল্পহীন স্মৃতির দান,
ধীরে রেখা ফুটে ওঠে।

দূরে, অস্থির কুক্কুরী এক, রুষ্ট চোখে
আমাদের করে লক্ষ্য,
কখন ফিরিয়ে নেবে কঙ্কালপিণ্ড থেকে
তার খণ্ডিত ভক্ষ্য।

—আর তবু তুমি—তুমিও হবে এ-বিষ্ঠাধারা,
জঘন্য কীটপংক্তি,
আমার স্বভাবী সূর্য, আমার চোখের তারা
দেবদূত, সংরক্তি !

তা-ই হবে তুমি, অন্ত্যকৃত্য সাঙ্গ হ'লে,
ওগো লাবণ্যপ্রতিমা,
যবে, অস্থির আধারে, নধর ফুলের তলে
বিনষ্ট হবে তনিমা।

তাহ'লে, রূপসী, বোলো সে-কৃমির বংশে, যার
চুম্বন করে গ্রাস,
আমি বাঁচিয়েছি ধ্বস্ত প্রেমের আকৃতি, আর
স্বর্গীয় নির্যাস।

[এই গুচ্ছের কোনো-কোনো অনুবাদের প্রথম লেখন ইতিপূর্বে 'কবিতা'য় বা অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছিলো]

ভাষান্তরে আন্তিগোনে

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ফাদার রবার্ট আঁতোয়ানকে এই অনুবাদকর্ম উৎসর্গ ক'রে তাঁরই একটি কৌতুকঘন অভিযোগের উত্তর দিচ্ছি। যদিও এই অনুবাদচেষ্টার সঙ্গে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি সংলগ্ন ছিলেন, তবু বহুদিন আগে তাঁর মুখ থেকে শোনা 'traduttore traditore' ব'লে সেই ইতালীয় প্রবাদটি আমি কখনো ভুলিনি। দেখতে প্রায় একরকম এই দুটি শব্দের মধ্যে 'u' এবং 'i'-এর স্বর-বৈষম্য ছাড়া আর কোনো তফাৎ নেই, অথচ ঐ স্বরান্তরের মধ্যেই এমন একটি চূড়ান্ত শ্লেষ লুকিয়ে আছে, যার হুবহু ইংরেজি হ'লো: 'a translator is a traitor'—অনুবাদকমাত্রেই বিশ্বাসঘাতক। এ-রকম অভিযোগ সত্ত্বেও বিশ্বসাহিত্য অনুবাদের মধ্যস্থতায় সর্বগ সবার দায়িত্ব নিতে পারে। প্রসঙ্গত, আন্তিগোনে অনুবাদের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে জানাই।

গ্রীক সাহিত্যের অগ্রণী শিক্ষকের এই সাবধানবাণী স্মরণীয়: 'হোমারিক গ্রীক ভাষাকে তার অগ্রজা অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষের সাহিত্যে অনুসৃত ভাষার সঙ্গে তুলনা ক'রে তাদের ব্যবধান অনুধাবন করো। ধ্বনিমূল্যে অথবা রূপতত্ত্বে সংস্কৃত হ'লো আরো প্রাচীনপন্থী। যে-ভাষাপরিবারে এর জন্ম তার সঙ্গে এর স্বচ্ছ গঠনবৈশিষ্ট্যের যোগাযোগ ভাষাতত্ত্বের ছাত্রের অবধানযোগ্য। গ্রীক ভাষার আকর্ষণ অন্যত্র···সে হ'লো গ্রীক মনেরই মূর্তরূপ।' ('The Growth and Influence of Classical Greek Poetry': R. C. Jebb) তবু প্রতীচী-জগৎ ও হেলেনিক ভাবনার সম্পর্ক কন্যা ও জননীর, এবং প্রাচীন গ্রীক ও বৈদিক সংস্কৃতের সম্বন্ধ—উপরের ইঙ্গিতটিকে সম্প্রসারিত ক'রেই বলছি—আন্তিগোনে ও ইস্মেনের মতোই সহোদরাবন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে আছে। সেই সূত্রটিকে যথাসাধ্য কাজে লাগানোর আয়োজন করেছি। বিশেষত ঋগ্বেদের মন্ত্র সন্নিবিষ্ট ক'রে গ্রীস ও ভারতবর্ষের দূরত্ব সংকুচিত করতে চেয়েছি। এখানে কয়েকটি অনিবার্য দৃষ্টান্তের অবতারণা করি। দ্বিতীয় কোরাসের প্রথম আন্তিস্ত্রোফের প্রথম

দুই পংক্তিতে আগের স্ত্রোফের শেষ দুই চরণের রেশ রাখবার জন্যে এই মন্ত্রটি রেখেছি :

দ্যৌষ্পিতঃ পৃথিবি মাতরধ্রুগগ্নে ভ্রাতর্বসবো মৃলতা নঃ।
বিশ্ব আদিত্যা অদিতে সজোষা অস্মভ্যং শর্ম বহুলং
বিয়ন্ত॥ (৬-৫১-৫)

(হে পিতা স্বর্গ, মাতা পৃথিবী, ভ্রাতা অগ্নি ও বসুগণ আমাদের প্রসন্ন করো। অদিতির পুত্রগণ ও অদিতি, তোমরা সম্মিলিত হ'য়ে আমাদের পর্যাপ্ত প্রশান্তি দান করো।)

ষষ্ঠ কোরাসের প্রথমে মূলানুগ ভাবাসঙ্গে এই মন্ত্রের ঈষদংশ উদ্ধৃত করেছি :

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো
দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং
যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥
(১-১৬৪-৪৬)

(আদিত্যদেবকে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি ব'লে অভিহিত করেন; সুন্দর পাখায় তিনি গতিশীল। তিনি এক হ'লেও বহুধা ব'লে কথিত হন; অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা নামে এঁর পরিচয়।)

বিচলিত ভাবিকথক তাইরেসিয়াসের মুখে এই মন্ত্রটি বসানো হয়েছে :

তন্নো দেবা যচ্ছত সুপ্রবাচনং ছর্দিরাদিত্যাঃ
ভরং নৃপায্যং।
পশ্বে তোকায় তনয়ায় জীবসে
স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে॥
(১০-৩৫-১২)

(দেবসঙ্ঘ, তোমাদের প্রতি উদ্দিষ্ট যজ্ঞের সফলতা ইচ্ছা করো। আদিত্যগণ, বিত্তপূর্ণ রাজগৃহ দাও। আমাদের পশু, পুত্র, পৌত্র ও পরমায়ু প্রভৃতি বিষয়ে অগ্নির সমীপে স্বস্তিকল্যাণ প্রার্থনা করি।)

প্রসঙ্গসারূপ্যে, পোলুনাইকেসের মৃতদেহ সৎকারমুহূর্তে আবহ-আবৃত্তির জন্য দুটি শ্লোক সমাহৃত হয়েছে :

যত্তে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদ পিপীলঃ সর্প উত বা শ্বাপদঃ।
অগ্নিষ্টদ্বিশ্বাদগদং কৃণোতু সোমশ্চ যো ব্রাহ্মণাঁ আবিবেশ॥
উচ্ছ্বঞ্চস্ব পৃথিবি মা নি বাধথাঃ সূপায়নাস্মৈ ভব সূপবঞ্চনা।
মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম ঊর্ণাহি॥
(যথাক্রমে ১০-১৬-৬ ও ১০-১৮-১১)

(হে মৃতজন, কাক শকুন পিঁপড়ে সাপ কিংবা শ্বাপদ তোমার দেহের যে-সব অংশ আহত করেছে, সর্বভুক অগ্নিদেব সেই সমস্ত আঘাত নিরাময় করুন। পৃথিবী, এই মৃতজনকে তুমি যন্ত্রণা দিয়ো না, মর্যাদা দিয়ো। সুখসামগ্রী দিয়ো, সুন্দর প্রলোভন দিয়ো। মা যেভাবে নিজের আঁচলে সন্তানকে সংবৃত করেন, তুমিও তেমনি ওকে আবৃত ক'রে রাখো।)

দ্যুলোকদেবতা জিউস্ কালক্রমে জুপিটারে বিবর্তিত হয়েছিলেন ব'লেই যে প্রথম কোরাসে বৃহস্পতিবন্দনার ত্রিষ্টুপ-স্তোত্রটি (৪-৫০-৪) প্রথম কোরাসের সূচনায় গৃহীত হয়েছে, তা হয়তো নয়। সদ্য-শেষ-হ'য়ে-যাওয়া যুদ্ধের স্নায়ুস্পন্দন নিয়েই কোরাসটির আরম্ভ এবং সূর্যদেবকে সরাসরি স্তোত্রনিবেদন না-ক'রে সূর্যরশ্মিরই উল্লেখ সেখানে লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া সারারাত্রির দুর্যোগের পর সেখানে সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই সরল সূর্যপ্রণামী মনস্তত্ত্বসংগত না-হওয়াই স্বাভাবিক। অন্যদিকে, বৃহস্পতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের দেবগুরু হিসাবে রাত্রির যে-কোনো অংশে আবির্ভূত হ'তে পারেন, এই ধরনের ঐতিহ্য আমাদের মধ্যে প্রচলিত। সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁকে আগে এনে পরে সূর্যকে বন্দনা জানানো হয়েছে।

গ্রীক দেবতারা যত কঠোর ততই নমনীয়। 'দেল্‌ফিমন্দিরে থুয়াদ্-দের রোমাঞ্চকর মন্ত্রতন্ত্র একই সঙ্গে আপোলো ও দিয়নুসাসের উদ্দেশে পাঠানো হ'তো; এঁরা দুজনেই সংগীতজ্ঞ ও দৈবজ্ঞ। থেবাই ও স্পার্তার কোনো-

কোনো অঞ্চলে আপোলোর নামে যে-উৎসব অনুষ্ঠিত হ'তো, তা নামমাত্র আপোলীয় এবং বস্তুত দিয়নুসীয়। ক্রেতে দেশে তিনি জিউসের সঙ্গে সমীকৃত হয়েছিলেন, থ্রাকে দেশে সমর-দেবতা আরেসের সঙ্গে। আর্গোসের পুরাণে প্রোইতোসের কন্যাদের নিয়ে যে-কাহিনীটি আছে, সেটি সম্পর্কে প্রত্নতত্ত্বজ্ঞেরা এখনো মনস্থির ক'রে বলতে পারেন নি যে দিয়নুসাস্ ও হেরার মধ্যে কোনজন সেই মেয়েদের উন্মত্ত ক'রে তুলেছিলেন। এই সব অভিজ্ঞান যেখানে চরম সে-সব ক্ষেত্রে আপোলো কি দিয়নুসাস কি হেরা সবাই স'রে যান, আদি কৌমসমাজের ছন্দোময় ব্রতপার্বণ আস্তে-আ'স্তে আমাদের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে।'

('Æschylus And Athens' : George Thomson)

একাধিক স্থলে জিউস্ বা আরেস্ বা দিয়নুসাস্‌কে তাই আঞ্চলিক দুর্গমতা থেকে সরিয়ে এনে অনুষঙ্গে সদৃশ কোনো-কোনো ভারতীয় দেবতার পাশাপাশি বসিয়েছি। এ-ভাবে পাশাপাশি বসালে দুটি নামের সান্নিধ্যে সেই নাটকীয় মুহূর্তের ইষ্টার্থ সাধিত হয় এবং গ্রীস ও ভারতবর্ষ একটি মহাদেশের অভিন্ন আকাশের নিচে মিলিত হ'তে পারে।

আমার উক্তির সমর্থনকল্পে ইন্দো-গ্রীক রাজাদের দুটি মুদ্রার বিবরণী পর-পর এখানে তুলে দিয়ে পাঠকদের উপরে এর সম্ভাবনা-বিচারের ভার অর্পণ করতে চাই :

১। দ্বিতীয় দিয়দিতাস্, ব্যাকট্রিয়ার রাজা (২৪৫-২৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)
স্বর্ণমুদ্রা। ১৩০ ভাগ সোনা। সামনের দিকে রাজার নিটোল মুখাবয়ব।
উল্টোদিকে : বাঁ দিকে লম্বা পা ফেলে নগ্ন জিউস্।
ডান হাতে সজোরে বজ্রায়ুধ নিক্ষেপ করছেন।
বাঁ হাতে ঢাল ; বাঁপায়ের কাছে একটি ঈগল।
বাঁ দিকে মালা। মুদ্রালেখ ডানদিকে।

২। রৌপ্যমুদ্রা—আমুন্তসের মুখ : (আমুন্তস ৮৫-৭৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ ?)
সামনের দিকে : শিরস্ত্রাণসজ্জিত আমুন্তসের আবক্ষ মূর্তি ডানদিকে

তাকিয়ে ; উল্টোদিকে : সিংহাসনে জিউস্, পাল্লাস্ দেবীকে প্রসারিত ডান হাতে ধ'রে আছেন ; বাঁ হাতে রাজদণ্ড ও পাম গাছের পাতা। উপরে মুদ্রালেখ এবং নিচে আমুন্তসের নাম।

(প্রথমটির নিশানা : V. A. Smith P. 7 Catalogue of the coins in the Indian Museum, Calcutta.
দ্বিতীয়টির নিশানা : কাবুল মিউজিয়মে রক্ষিত ; এবং A. K. Narain-এর The Indo-Greeks বইয়ের শেষের দিকে পঞ্চম চিত্রফলকে মুদ্রিত)

গান্ধারশিল্পের মধ্যে গ্রীক শিল্পরীতি যে-অর্থে অনূদিত হয়েছিল, উপরে উদ্ধৃত দুটি মুদ্রা-পরিচয় সেই অর্থে গ্রীক দেবতাদের নবজন্ম ঘোষণা করছে না ; বরং মনে হয় প্রথম ছবিতে দিবস্পতি ইন্দ্রের সঙ্গে তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন, এবং দ্বিতীয় ছবিতে প্রজ্ঞাময়ী নগরলক্ষ্মী পাল্লাস্ দেবীকে তিনি যে ধ'রে আছেন, ভারতবর্ষীয় দেবদেবীর একান্ত পরিচিত মূর্তির সহযোগিতায় তাও চোখে লাগে না। গ্রীক দেবমণ্ডলেই এ-রকম সম্ভাবনা নিহিত ছিল এবং তাই উরেনাস্-ক্রোনোস্-জিউস্—এঁদের ভিতরে একটি নির্দিষ্ট কালপর্ব আছে। একজনের পর একজন আসছেন, রূপ থেকে রূপান্তরে তাঁর বৈশিষ্ট্য বাড়ছেই। এ-কথা মনে রেখে জিউসের পাশে, অবস্থা অনুযায়ী বিষ্ণু বা আদিত্য বা অন্য দেবতাকে সন্নিবিষ্ট করা সহজ হয়েছে। বেদে বিষ্ণুর যে-বর্ণনা আছে সেটি প্রধানত আদিত্য-বর্ণনা, এবং এই রকম আরো কয়েকটি সম্ভাব্য সাদৃশ্যের সূত্র নিয়ে ইন্দ্রের পাশে আরেস্, বা অতনুর পাশে এরোস্‌কে এনেছি। অবশ্য সর্বত্রই যে এই রকম অঙ্গাঙ্গী সন্নিবেশ করিনি, সে-কথা বলা বাহুল্য।

'আর্গোন' বা ঘটনাগতির সঙ্গে 'মুখোস' বা বিবৃতি গ্রীক নাটকের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য। বিবৃতির ও নাটকীয় ঘটনাবেগের মধ্যে 'কোরাসে'র কাজ

সবচেয়ে দরকারি। 'সাপ্লিকেস্' ও 'ইউমেনাইদেস' নাটকে ঈস্কাইলাস্ গীতি ও গতির পরিণয়সাধন করেছেন তাতে এক-এক সময় বোঝার উপায় থাকে না, কার প্রাধান্য বেশি আর কার কম। সোফোক্লেস্ সেই দিক থেকে আরো সচেতন এবং সে-অর্থে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকে ভৈরবপন্থীদের সমবেত সংগীত ও বাউলের গানের সঙ্গে আখ্যান-ঘটনার আশ্চর্য টানাপোড়েন স্মরণীয় এবং তুলনীয়। 'তাই আন্তিগোনের ছয়টি সমবেত সংগীতের ক্রমান্বিত বিষয় হ'লো আর্গবাসীর আক্রমণে থেবা নগরীর অতীত দুর্যোগ; আইমোনের মধ্যবর্তিতায় উদ্‌ঘাটিত প্রেমের শক্তি; দানাএ, লুকাউর্গোস্ ও ক্লিওপাত্রার কারাভোগ-যন্ত্রণার সঙ্গে প্রতিতুলনা ক'রে দেখানো যে পাথরে তৈরিকবর আন্তিগোনের জন্য অপেক্ষা করছে; সহৃদয় দেবতা দিয়নুসাসের কাছে তাঁর প্রিয় থেবা নগরীর প্রতীক্ষিত জয়োল্লাসে যোগদানের জন্য উদ্বেল প্রার্থনা···প্রত্যেকটি কোরাসের প্রত্যক্ষ প্রভাবে সেই-সেই নাটকীয় মুহূর্ত টল্‌মল্ ক'রে উঠেছে।'

(R. C. Jebb. 'The Growth and Influence of Classical Greek Poetry.')

এই 'কোরাস' গানগুলির ভাষান্তরকালে 'choral ode' শব্দের প্রতিশব্দ নিয়ে চিন্তিত হয়েছিলাম। 'সম্মেলকসংগীত' 'সমবেত ধ্রুবপদ' 'বৃন্দগান' 'চারণগীতি' ইত্যাদি অনেক শব্দ প্রলোভিত করেছিল। 'Harmony'র প্রতিশব্দে রবীন্দ্রনাথ 'সংধ্বনিসংগীত' ব'লে যে-অর্থময় শব্দটি গ্রহণ করেছেন তা এখানে কাজ করলো না। সুতরাং choral ode-এর সমার্থক শব্দ হিসাবে 'সংস্তব' কথাটি একটু দুঃসাহসের সঙ্গেই ব্যবহার করেছি। এই দুঃসাহসের তথ্যভিত্তি নীচের শ্লোকাংশ :

'সূতমাগধবন্দীনাং সংস্তবৈর্গীতমঙ্গলৈঃ' (মহাভারত, দ্রোণপর্ব)

Strophe-র সমার্থবহ শব্দ হিসাবে সামগানের 'স্তোভ' শব্দটি প্রথম প্রলোভন হয়ে এসেছিল, কেননা নিয়তির সঙ্গে ঐ শব্দের একটা যোগ আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতীয় রাগসংগীতের দুটি পরিভাষা গ্রহণ ক'রে 'strophe'-র জায়গায় 'স্থায়ী' ও 'antistrophe'র জায়গায় 'অন্তরা' প্রয়োগ করেছি। 'স্থায়ী

অংশে গানের প্রকৃত প্রস্তাবনা হচ্ছে এবং অন্তরা অংশে বিষয়ের পরিসমাপ্তি ঘটছে ও তৃপ্তিদায়ক হচ্ছে।' (অমিয়নাথ সান্যাল : 'প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা')

বিষয় বা বিন্যাসে গ্রীক নাটকের তন্ত্রীসংখ্যা ও তন্ত্রীসংকেত স্বরশৃঙ্গার যন্ত্রের মতোই, সাধারণত গম্ভীর, সংবৃতবাক্ এবং উঁচু পর্দায় বাঁধা। তার ছন্দ অমিত্রাক্ষর হ'লেও তার ভাষা লৌকিক হ'তে ভয় পায়। 'সোফোক্লেসের ভাষা যখন অত্যন্ত ঋজু, তখনো রূপকধর্মী। তবু তিনি পিণ্ডার বা এলিজাবেথানদের মতো যুবজনোচিত উৎসাহে শস্যের ঝুলি দিয়ে কাজ চালান না, হাতে-হাতেই বীজ বোনেন।···তাঁর মুখ্য পাত্রপাত্রীর দীর্ঘ সংলাপে কিংবা দূতদের সংবাদ পরিবেশনের সময়ে বর্ণনাধর্মিতার প্রয়োজনে আরো অলংকৃত ভাষা আশা করা অন্যায় ছিল না। কিন্তু কথোপকথনের ধর্মই সে-সব ক্ষেত্রে প্রকট। (F. J. H. Letters : The Life and Works of Sophocles)। সংস্কৃত নাটকের মতো গ্রীক নাটকে প্রাকৃতের কোনো স্বতন্ত্র বিধান নেই, সুতরাং সব চরিত্রই সেখানে একটি সমোত্তল জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে। তাই স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি, তদ্ভব ও তৎসম এক জায়গায় এনে সময়বিশেষে চলতি প্রবাদ জুড়ে দেওয়া অসংগত মনে করিনি। 'Stichomythia' বা এক-এক চরণে নিবদ্ধ দ্রুত সংলাপচালনা—মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ঈস্কাইলাস্' বইটিতে এর বাংলা করেছিলেন 'কথা-কাটাকাটি'—আন্তিগোনে নাটকেরও একটি আকর্ষণস্থল, এবং অনুবাদকালে বুঝেছি লেটার্সের 'হাতে-হাতে বীজ বোনা'র তুলনাটি কতো অব্যর্থ।

কথোপকথনে মূলের পংক্তিসংখ্যা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দু-এক পংক্তি বেড়েছে বা কমেছে।

গ্রীক স্থান ও পাত্রের নাম অবিকৃত রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে কখনো-কখনো শ্রুতিশোভনতার খাতিরে অদলবদল যে হয়নি এমন নয়।

এ-নাটকের উপসংহারে 'কোরাসে'র সংলাপ মাত্র ছয় ছত্রে সমাপ্ত। খসড়ায় সেখানে পর-পর এই তিনটি ঋকমন্ত্র সংলাপের ফাঁকে-ফাঁকে দিয়ে ঐ মিতকথনের আপাতদৃষ্ট অভাব পূরণ করতে চেয়েছিলাম :

(১) তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ (৩-৬২-১০ ঋগ্বেদ)

(২) যো বিশ্বতঃ সুপ্রতীকঃ সদৃঙ্ঙসি দূরে
চিৎসন্তলি দিবাতি রোচসে।
রাত্র্যাশ্চিদন্ধো অতি দেব পশ্যস্যগ্নে সখ্যে
মা রিষামা বয়ং তব (১-৯৪-৭)

(৩) আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্।
পরো যদিধ্যতে দিবি॥ (৮-৬-৩০)

আমার মনে এই ঋক্‌যোজনার পটভূমি ছিলেন সম্ভবত ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ। 'মুক্তধারা'র উল্লেখ আবার করছি। 'আন্তিগোনে' নাটকে দুই শ্রেয়োবোধের সংঘর্ষের মতো 'মুক্তধারা'তেও রণজিৎ বিভূতি ও অভিজিতের মধ্যে অনুরূপ দ্বন্দ্ব রয়েছে। আবার অভিজিতের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তিমে যে 'পরমা নিষ্কৃতি' (catharsis) হ'লো তাকে দৃঢ় করবার জন্য ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'চিরকালের মতো পেয়ে গেলি' কথাটির পরেও ভৈরবপন্থীর 'জয় ভৈরব, জয় শংকর' গানটির দরকার ছিল। অথবা 'নটীর পূজা'র কথা ওঠে। এর উপসংহারে শ্রীমতীর গান ও ভিক্ষুকদের গান, অস্মিতার বিষাদ ও মুক্তকণ্ঠ নৈর্ব্যক্তিকতা রত্নাবলীর তিন চরণের বুদ্ধশরণমন্ত্রে এসে যে-ভাবে সংহত অথচ অকূল সমুদ্রে মিশে গেছে, তার সুদূরতম আভাসও যে 'আন্তিগোনে'র উপান্ত্যে অসম্ভব ছিলো এ-কথা মানতে পারি না। কিন্তু তা হ'লে এ আর গ্রীক নাটক থাকতো না। গ্রীক নাটকের শেষে আঘাতের পর আঘাত আছে, নিপীড়নের পর নিপীড়ন, তারপর আর মুখ ফুটে বেশি কথা বলার সামর্থ্য অথবা সেই দুর্বিপাক শান্তরসে উত্তীর্ণ করার উপায় থাকে না। অঙ্কের শেষদিকে কোরাসকে রেখে সেনেকা যে-ভাবে তাকে স্বতন্ত্র করেছেন ও ঘটনাপ্রবাহের উপরে তার অনধিকার জারি করেছেন, সোফোক্লেস যে সেই অর্থে তাকে অক্ষম করেছিলেন তা নয়। নাটকীয় অভিঘাতের প্রয়োজনে এমন ঘটেছে। রাসীনের 'আথেলিয়া'র শেষটুকু (৫।৮) দেখে আবার সোফোক্লেসের উদ্দেশ্য বুঝেছি এবং সঙ্গে-সঙ্গে 'আন্তিগোনে'র শেষ দৃশ্যে মন্ত্রশান্ত পরিবেশ আরোপ করার অন্যায় প্রলোভন থেকে নিবৃত্ত হয়েছি।

আন্তিগোনে

—সোফোক্লেস—

মঞ্চে উপস্থিত পাত্রপাত্রী

আন্তিগোনে	থেবা নগরীর মৃত রাজা ও রানী ঈদিপাস ও জোকাস্তার কন্যা
ইসমেনে	তার সহোদরা
ক্রেয়োন	তাদের পিতৃব্য, বর্তমানে থেবা নগরীর একচ্ছত্র শাসক
আইমোন	তার সন্তান আন্তিগোনের দয়িত
তাইরেসিয়াস	একজন অন্ধ ভাবিকথক
একটি বালক	তাঁর সঙ্গী
ইউরুদিকে	ক্রেয়োনের রানী, আইমোনের মাতা

ক্রেয়োনের একজন পার্শ্বচর
একটি প্রহরী
অন্যান্য প্রহরী ও পার্শ্বচর
থেবা নগরীর পনেরোজন প্রবীণ ব্যক্তির একটি সম্প্রদায়, তাদের মধ্যে একজন সূত্রধার।

(প্রথম অভিনয় : আনুমানিক ৪৪১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, যখন সোফোক্লেসের বয়স অন্তত পঞ্চান্ন।)

দৃশ্যস্থল : থেবা নগরীর নতুন রাজা ক্রেয়োনের প্রাসাদপ্রাঙ্গণ। সদ্য উষার আলো এসে পড়েছে। আন্তিগোনে ইসমেনেকে আকর্ষণ ক'রে একপাশের দরজা দিয়ে দ্রুত প্রবেশ করলো।

আন্তিগোনে

ইসমেনে শুনেছিস, ইসমেনে, বোন রে আমার!
ব'লে দে এ-ভাবে আর কত ঋণ শুধে দিতে হবে
দেবতাকে, যে আমাকে আর তোকে পুতুল নাচায়,
তোকে আর আমাকে যে মরণকালের আগে মারে!

বলতে পারিস কোন্ দুঃখ কোন্ দৈবদুর্বিপাক
বাকি আছে? কিংবা কোন কলঙ্কের ক্লিন্ন অপমান?
হায় ঈদিপাস মোরা বয়ে মরি বিষবৃক্ষফল।
আর তুই শুনেছিস সিংহাসনে নতুন রাজার
নতুন বিধান? না কি কানা মেয়ে তুই কালা মেয়ে
প্রিয়জন যাক তবু দেখবি না, শুনবি না কিছু?

ইসমেনে

তোমায় মিনতি করি, একবার শোনো আন্তিগোনে
এর মধ্যে শুনিনি তো বাইরের নতুন জোয়ার
কার পাড় ভাঙে, কার ঘর গড়ে, কিছুই বুঝিনি,
হঠাৎ যেদিন গেল দুই ভাই একেবারে চ'লে
আত্মঘাতী যুদ্ধ ক'রে, তারপর কিছুই জানি না।
শুধু জানি কাল রাতে, একরাত্রে, আর্গবাসী যত
ছত্রখান হয়ে গেছে, তারপর কিছুই জানি না।

আন্তিগোনে। তা আমিও জানতাম, তাই তোকে সবার আড়ালে
এখানে এনেছি ডেকে চুপি-চুপি কিছু বলবো ব'লে।

ইসমেনে। কী জানি তুমি কী বলবে, ভাবনা যেন তোমার ভুরুতে
গুরুগুরু কেঁপে ওঠে দুর্ভাবনার কালো মেঘ।

আন্তিগোনে। আমাদের দু'ভায়ের কথা বলি, ক্রেয়োনের আদেশ
এক ভাই রাজকীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ হবে,
অন্য ভাই পাবে না সে অধিকার। এতেয়োক্লেসের
শবদেহ রাখা হবে মৃতদের রাজার মতন,
কিন্তু কী মর্যাদা পাবে আমাদের পোলুনাইকেস?
মৃত্যুর পরেও তার শান্তি নেই পথে রইবে প'ড়ে?
কেউ তাকে এককাঠা কবর কি একফোঁটা জল
দিতে পারবে না, ব'লে দিয়েছেন, মহান ক্রেয়োন।

তার মানে ওরে ভাই আমাদের পোলুনাইকেস
তুই শুধু খরচক্ষু শকুনিপাখির ভালোবাসা,
খরোষ্ঠী শকুনি পাখি তোর দেহ চিরে-চিরে খাবে
তোর আর আমার জন্য এ-আদেশ। ঐ যেন রাজা
এখনি এলেন ব'লে আদেশের মর্ম জানাতে;
যে নাকি অমান্য করবে, তাকে তিনি ইহলোক থেকে
স্থানান্তরে পাঠাবেন, ঢিল ছুঁড়বে রাস্তার মানুষ
তার গায়ে, তোর গায়ে কেমন বিঁধছে এ খবর,
জানতে চাই, জানতে চাই দিবি তোর জন্মপরিচয়,
রাজার ঝিয়ারি, নাকি দাসের ঘরের বাঁদি তুই!

ইসমেনে। এই যদি হয় তবে আমার কী করার রয়েছে?
আমি কে বাধা দেবার, কেবা আমি বাধা ভাঙবার?

আন্তিগোনে। শোনো তুমি এই কাজে সঙ্গে-সঙ্গে থাকতে পারবে?

ইসমেনে। কোন কাজে?

আন্তিগোনে। মৃতদেহ তুলে ধরতে হবে, মৃতদেহ
তুলে ধরবার কাজে হাতে-হাতে সাহায্য করবে।

ইসমেনে। কী, তুমি কবর দেবে তাকে? তুমি রাজাজ্ঞা মানবে না?

আন্তিগোনে। সে আমার সহোদর, আশা করি তোমারো সে ভাই,
বেআইনি হ'তে যদি ভয় করো, ভ্রূক্ষেপ করি না।

ইসমেনে। ক্রেয়োনকে মানবে না? তুমি কি পাগল হ'লে?

আন্তিগোনে। আমি
আমাকে মানতে চাই, তিনি কেন হাত দিতে যান?

ইসমেনে। মনে ভাবো আন্তিগোনে মোদের পিতার সর্বনাশ;
কী ক'রে গেছেন তিনি জন্মের মতন শেষ হ'য়ে,
নিজের কাছেই নিজে সাব্যস্ত করুন অপরাধী

ঘৃণিত, অসম্মানিত, হৃতদৃষ্টি ; তাঁর দুটি চোখ
নিজেরি দুহাতে উপড়ে নিয়েছেন তিনি, আর যিনি
একসঙ্গে তাঁর জায়া ও জননী, তিনি গাঁঠছড়া খুলে
ফাঁস প'রে অসময়ে ফেলেছেন শেষ নিশ্বাস।
মনে ভাবো আমাদের অসুখী দু ভাই—দুই ভাই।
ছারখার হয়ে গেছে আত্মঘাতী যুদ্ধের আগুনে।
আজ ছাখো আমরা দুজনা এক, রাজার বিধান
না মানলে আমাদেরো পরিণাম তাদেরি মতন।
আমরা দুজনা একা, আন্তিগোনে, মোরা শুধু নারী,
আমরা শুধু যে নারী, পুরুষের সঙ্গে পারবো না,
আমরা তাদের প্রজা, সর্বসহা, ধৈর্যমাত্রসার,
যারা পরলোকগত সবাকার ক্ষমা চেয়ে আমি
জীবিত প্রভুর কাছে ছায়ার মতন অনুগত ;
সাধ্যের বাইরে যাওয়া আমাদের পক্ষে যে মূঢ়তা!

আন্তিগোনে। অনেক হয়েছে, থামো। ভবিষ্যতে আর কোনোদিন
তোর সহায়তা চাই না, শুভেচ্ছার প্রয়োজন নেই;
আমার ভাইকে দেবো সমাধির শান্তি, সেইজন্য
মৃত্যু যদি প্রয়োজন হয়; তা-ও ভালো, তাই ভালো।
যাকে ভালোবাসি আমি তার পাশে নিশ্চিন্তে ঘুমাবো।
সে-মৃত্যু মহতী। যাকে ভালোবাসি সেও ভালবাসে;
আমি তো মাটির নিচে মরণের পরে চিরকাল
বাস করবো, তবে কেন মাটির উপরে যারা আছে
তাদের হুকুম শুনবো? তোমার যা অভিরুচি, করো,
যত ইচ্ছা ঘৃণা করো পবিত্র যা ঈশ্বরের কাছে।

ইসমেনে। ঘৃণা তো করিনি আমি, শুধু বলি সে-শক্তি সে-মেধা
একেবারে নেই যাতে রাজশক্তি অবহেলা করি।

আন্তিগোনে। আত্মপক্ষসমর্থন তুমি জানো, আমি তা জানি না,
আমি জানি একমাত্র যাকে ভালোবাসি তার ব্রত।

ইসমেনে। অসুখী, অভাগী ওরে, ভয় করে, বড়ো ভয় করে।

আন্তিগোনে। ঘোরাও নিজের চাকা, আমি থাকি ভাগ্যচক্র নিয়ে।

ইসমেনে। ঘুণাক্ষরেও তবে বোলো না তোমার এই কথা
কোনো মানুষের কাছে, আমিও কারোকে বলবো না।

আন্তিগোনে। যাও যাও ব'লে দাও আবালবৃদ্ধবনিতাকে,
যে-সৎসাহস থাকলে তোকে আর ঘৃণা করবো না।

ইসমেনে। আগুন তোমার বুকে; বরফ তোমার কাজে।

আন্তিগোনে। তাই
তর্পণের কাজে লাগে, স্বর্গতের আশীর্বাদ পায়।

ইসমেনে। এ এক অসাধ্য যজ্ঞ, এ-আগুনে হাত পুড়িয়ো না।

আন্তিগোনে। তবুও জোগাবো আমি আমরণ হোমের সমিধ।

ইসমেনে। আলেয়া তোমার লক্ষ্য, জেনে-শুনে কেন ভুল করো?

আন্তিগোনে। তুমি কি এখনো থামবে? কেবল আমার ঘৃণা নয়;
মৃত মানুষের তীব্র ঘৃণার বিষয় হবে তুমি,
মৃতদের ঘৃণা ঢের দীর্ঘস্থায়ী। আমি অজ্ঞতার
অন্ধকারে ডুবে মরি, যত অন্ধকারে ডুবে মরি
আমার নিয়তি মোর, সে-মরণ মহতী মরণ।

(আন্তিগোনের নিষ্ক্রমণ)

ইসমেনে। যাও, যদি যেতে হয়, ঋজুপথে মূর্ত একাগ্রতা,
ও যে ভালোবাসে, ও যে নিজেই একাগ্র ভালোবাসা।

(ইসমেনের নিষ্ক্রমণ)

সূর্যের আলো সমস্ত প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়েছে। থেবা নগরীর পনেরোজন প্রবীণ ব্যক্তির প্রবেশ ও সংস্তব-গান।

স্থায়ী : এক

বৃহস্পতি প্রথমং জায়মানো মহো জ্যোতিষঃ পরমো ব্যোমন্।
সপ্তাস্যস্তুবিজাতো খেণ বি সপ্তরশ্মিধমৎ ত্বমাংসি ॥
সূর্যকিরণ, নমো ভরন্ত এমসি।
থেবা নগরীর সপ্ততোরণে এ কী বিচিত্র রশ্মির আয়োজন,
নবহরিদ্রা দির্কা নদীতে ঝরে বালার্কবর্ণ আলিম্পন।
আর্গোস হ'তে এসেছিল তার ভীষণ অশ্ব-'পরে
শাদা ঢাল হাতে দারুণ দস্যু, তাকে এই সমতল
হ'তে তুমি দিলে চিরনির্মূল ক'রে।
পোলুনাইকেস এনেছিল শত্রুতা,
ফেনিয়েছিল সে নদীর শান্ত জলে,
চোখে-মুখে তার তুষারপক্ষ শ্যেনপক্ষীর ক্ষুধা,
মেঘে-মেঘে বড়ো তুলেছিল কোলাহল,
কোথা গেল তার শাদা ঢাল হাতে ঘোড়ার কেশরে সজ্জিত সেনাদল!

অন্তরা : এক

মোদের পিতৃপুরুষের এই ভিটা,
সপ্তদ্বার এই যে মহানগরী,
রক্তপায়ী সে ফিরেছিল সঞ্চারি,
তার দুহাতের মশাল সে যেন চিতা,
রাজমুকুট যে চেয়েছিল ঝলসাতে!
পালিয়ে গিয়েছে ইহলীলা সংবরি'।
সে-ভীষণ রণ হ'য়ে গেছে কাল রাতে,
যেন সে ড্রাগন নিয়ে এসেছিল সরীসৃপের শঙ্কিল শর্বরী।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততং।

হিরণ্যাক্ষ দ্যুম্পিতা জয় জয়,
তাঁরি সম্পাতে নদী হ'লো সোনারং,
বিজিত সৈন্য গেল সন্তরি, ক্যাপানাস্ গেল রোষবহ্নিতে মরি' ॥

স্থায়ী : দুই

দুর্ভাগা ও যে জীবন্তমৃত তান্তালসের মতো
প্রথমে শূন্যে উদ্বন্ধনে, আর শেষে গেল প'ড়ে,
প্রতিধ্বনিত কম্পিত মাটি ; নাকি সে মদনাহত
অলাতচক্রী মথিতমদিরা ঘোরে
বিদ্বেষ নিশ্বসি'।
ইন্দ্রসমান আরেস্ তখন পাপীকে শাস্তি দিতে
উচ্চৈঃশ্রবা তুরঙ্গে যেন মুখরিত চারিভিতে,
বিজিতপক্ষে নিয়তি তখন কৃষ্ণাচতুর্দশী।

সপ্ততোরণে সাতজন সেনাপতি
বিসর্জি' প্রাণ, অশ্বারোহীর অসি ও বর্ম ছেড়ে
উৎসর্জিল দ্যুম্পিতা নামে সর্বাধিনায়কেরে ;
শুধু দুইজন, এক জননীর জঠরের সন্তান
অসিযুদ্ধের বিনিময়ে নিল পরস্পরের প্রাণ,
এখন যমজ, কেননা তাদের এক মরণেই গতি।

অন্তরা : দুই

ওড়ে যে আবার বৈজয়ন্তীমালা
আকাশচুম্বী থেবাই রথের চূড়ে,
ভুলব অতীত, আসে তো আসুক অতীতের যতো জ্বালা
ঘন সুপ্তিতে দুঃস্বপ্নের ক্ষুব্ধ অশ্বক্ষুরে।
আজ মোরা খুঁজি পবিত্র বেদী মঙ্গলকল্যাণে,
সারা বিভাবরী ভ'রে ওঠে তারি বৈতালিকের গানে,

থেবা নগরীর ধরণী যেজন কাঁপায় সুরের টানে,
কিশোর নায়ক ব্যাকাস্ জাগুক আমাদের মাঝখানে।

সূত্রধার

গান সারা হোক, এলেন রাজাধিরাজ,
মেনইকিসের কুমার ক্রেয়োন ঐ,
অর্পিল বিধি সুকঠিন রাজকাজ
ক্রেয়োনের হাতে। তিনি আজ নিশ্চয়ই
আমাদের কাছে যুক্তির সন্ধানে
এসেছেন, মোরা রাজার সুধীসমাজ।

দুজন দেহরক্ষী নিয়ে সম্পূর্ণ রাজবেশে ক্রেয়োন প্রাসাদের সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেন।

ক্রেয়োন

প্রাতঃপ্রণাম নিন সুধীবৃন্দ, সবি তো জানেন
আমাদের রাজ্যতরী রাষ্ট্রতরী অকূল পাথারে
ভেসে প্রায় ডুবে যেতে গিয়েছিল, কোনোক্রমে বেঁচে
তলানির কাঠমাত্র নিয়ে আজ ফিরেছে ডাঙায়;
আপনারা বিচক্ষণ, নিশ্চিত জানেন কেন তবে
ডেকে পাঠিয়েছি। আজ আপনারা আমার নির্ভর,
যেমন ছিলেন যবে সিংহাসনে অখণ্ডপ্রতাপ
রাজা লাইয়স, আর তারপর যবে ঈদিপাস
অধিষ্ঠিত যুক্তরাজ্যে। ঈদিপাস যাবার পরেও
আপনারা স্থির সঙ্গী তাদের উত্তরপুরুষের;
কিন্তু তারা, শেষ দুটি বংশদীপ, তারাও যখন
পরস্পর সহোদর হত্যার নির্লজ্জ কালো রাতে

মুছে গেছে, সুতরাং একমাত্র নিকট আত্মীয়
ব'লে আমি রাজদণ্ডের যোগ্য উত্তরাধিকারী।
বেশ, এ তো ভালো, এ তো স্বাভাবিক, রাজশক্তি তবু
কোনো মানুষের, শক্তি যতদিন পরীক্ষা না করে
সেই মানুষের শক্তি ততদিন প্রমাণ হয় না।
যদি কোনো রাজার কুমার হয় রাজার দুলাল
কখনো বলে না স্পষ্ট কখনো থাকে না স্পষ্ট পথে,
নরাধিপ নাম হোক, তাকে আমি নরাধম বলি।
যার কাছে রাজ্যের চেয়েও বন্ধু বড়ো, আমি তাকে
মানুষের অন্তর্গত পৃথিবীতে গণ্যই করি না।
সর্বদর্শী সত্যদর্শী বিধাতার নাম নিয়ে বলি
যে-মুহূর্তে টের পাবো কালসাপ ঢুকেছে নগরে,
বাক্‌সংবরণ ক'রে থাকবো না। আমার স্বজন
স্বদেশের শত্রু হ'লে দণ্ড দিতে দ্বিধা করবো না।
কে না জানে এদেশ আমার আমাদের ভাগ্যতরী,
তারাই যথার্থ বন্ধু যারা পাটাতনে বসলেও
টলমল করে না তরী, পারাবার পার হ'য়ে যায়।
এ-সত্য বুঝেছি, তাই সত্যের পথের বিঘ্ন মুছে
পার হবো; এ-আদেশ মৃত ব্যক্তিকেও ছাড়বে না।
বীর যে এতেয়োক্লেস্, লড়েছিল এদেশের হ'য়ে,
এই নগরীর পক্ষে আমরণ যুদ্ধ করেছিল,
ধন্য যে এতেয়োক্লেস—তাকে যেন যত নাগরিক
স্রক্‌মাল্যচন্দনে সযত্নে সমাধি দেয়, আর
গভীর সম্মানে তার শোকগাথা উচ্চারণ করে।
অন্য একজন, সেই দেশদ্রোহী পোলুনাইকেস,
নির্বাসিত দুর্জন সে, দেশে ফিরে পিতৃপুরুষের

গৃহদেবতার যত সোনার বিগ্রহ নষ্ট ক'রে
স্বজনের রক্তে তার পিপাসা মেটাতে চেয়েছিল,
সকলকে দাসবংশে পরিণত করতে চেয়েছিল,
শোনো সব দেশবাসী, যেন পাপী পোলুনাইকেস
না পায় সায়ংকৃত্য, না পায় মৃত্যুর রাজকর,
সমাধি দিয়ো না তাকে, একবিন্দু অশ্রুও দিয়ো না,'
তার দেহ ফেলে রেখো কুক্কুর শকুনি খেয়ে যাক।
এ-বিষয়ে এ আমার শেষ কথা, আমার রাজত্বে
সুজন শয়তান আমি এক আসনে বসাতে পারবো না।
যে শুধু দেশের জন্য সব দিল, জীবিত হ'লে সে
উপঢৌকন পাবে, মৃত হ'লে শহীদ সম্মান।

সূত্রধার। মেনইকিস স্বর্গগত, তাঁর যোগ্য সন্তান ক্রেয়োন
তোমার আদেশ রাখো শত্রুমিত্র সবার উপরে,
তোমারি তো অধিকার নির্বিশেষ নীতিরচনার,
যারা ম'রে গেছে যারা বেঁচে আছে সবার উপরে।

ক্রেয়োন। দেখবেন যা বলেছি অন্যথা না হয় যেন তার।

সূত্রধার। এ-কাজে দরকার অল্পবয়সের একজন লোক।

ক্রেয়োন। ইতিমধ্যে একজন মৃতদেহ পাহারার কাজে
নিযুক্ত হয়েছে।

সূত্রধার। তবে বাকি আর কী কর্তব্যভার?

ক্রেয়োন্। আইনবিরুদ্ধ কণ্ঠ শুনলেই রোধ করবেন।

সূত্রধার। কে আছে এমন মূঢ় মৃত্যুকে যে আলিঙ্গন করে।

ক্রেয়োন্। মৃত্যু ছাড়া গতি নেই। কিন্তু ভুল আদর্শের টানে
স্বপ্নচারী কেউ-কেউ মৃত্যুর সন্ধানে ছুটে যায়।

একটি প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। মহারাজ, এ কথা বলবো না: 'আমি শ্বাস বন্ধ ক'রে

ছুটে আসছি একটানা, একটুও থামিনি।' সত্যি কথা
বলতে গেলে মনে-মনে হুঁচট খেয়েছি বারবার,
পায়ের গোড়ালি যেন বারবার টেনে ধরছিল,
বুক ধ্বকধ্বক্ ক'রে বলছিল: 'সাঙাৎ, ডুববি,
অমন চৌদুনে গেলে ডাইনে-বাঁয়ে দেখে শুনে চল,
ব্যস্তসমস্ত কেন? কপালে তো দুর্ভোগ আছেই।
আবার থামলি কেন? জোর চল। অন্য কারো কাছে,
ক্রেয়োন এ-কথা শুনলে পিঠে তোর থাকবে না ছাল।'
এ-সব ভাবতে-ভাবতে ঘামতে-ঘামতে ছোটো পথটাকে
বড়ো পথ ক'রে নিয়ে পৌঁছতে ভীষণ দেরি হ'লো;
এবার আপনাকে সব বলি, কিন্তু কী ক'রে যে বলি,
যা-ই বলি ভাগ্য যেন হতভাগা করে না আমাকে।

ক্রেয়োন। কিন্তু কী এমন কথা, যার এত ভয়ানক ভার?

প্রহরী। মহারাজ, অপরাধ নেবেন না, সবিনয়ে বলি
সে-কাজ করিনি আমি, কিংবা যার করা সেই কাজ
তাকেও দেখিনি, তবে আমি কোনো শাস্তি পাবো না তো?

ক্রেয়োন। চালাকচতুর বটে, কথা সাজাতেও বেশ জানো,
শাদা কথা বলো দেখি, খারাপ খবর আছে কোনো?

প্রহরী। খারাপ খবর, তাই বলতে গিয়েও পারছি না।

ক্রেয়োন। ভণিতা কোরো না, বলো, তারপর দূর হ'য়ে যাও।

প্রহরী। তাহ'লে এবার বলি। জানি না কে, এইমাত্র এসে
মৃতদেহ সমাধিবেদীতে রেখে সাজিয়ে গিয়েছে,
শেষ কাজ ক'রে গেছে একেবারে নিখুঁত নিয়মে,
বালি ফুল লতা পাতা ঠিকমতো ছড়ানো রয়েছে।

ক্রেয়োন। কার এই সাহস, তুমি কী বলছো, কী বলছো তুমি?

প্রহরী। হুজুর, জানি না। কোনো চিহ্ন রেখে যায়নি আসামি,

একটু কুড়ুল নেই, ঘাসের চাপড়া ঠিক আছে,
মাটি সেই শুকনো মাটি, একটিও লাঙলের রেখা
দেখতে পাইনি, এত সাবধানে করেছে সে-কাজ
আর কী কৌশলে সেই দেহ ঢাকা ধুলোর ছাউনিতে
যেন কোনো নোংরা হাত নোংরা চোখ না লাগতে পারে ;
হালকা ধুলোর ঢাকনা লেগে আছে, কেউ যেন এসে
বিছিয়ে দিয়েছে কোনো শাপমন্যি ভ্রূক্ষেপ না-ক'রে,
না, না, কোনো জন্তু কোনো শিকারি কুকুর গন্ধ শুঁকে
কাছে এসে ছিঁড়ে যায়নি ম'রে-যাওয়া লোকটার শরীর ;
ওঃ, আমরা পাহারাওলার দল একে অন্যকে
দূষেছি এতক্ষণ, এমন কি এ ওকে দুই ঘা
দিতে গিয়েছিল, শেষে দেখা গেল সকলেই দোষী,
কিন্তু কেউ দোষী নয়। সবাই হলফ ক'রে বলছে
'আমি দোষী নই', 'আমি দোষী নই', 'আমি দোষী নই।'
সবাই তাতানো লোহা হাতে নিয়ে আগুন পেরিয়ে
যেতে রাজি, তিন সত্য করতে রাজি বিধাতার নামে ;
আসল আসামি যে কে তাও কেউ বুঝতে পারছি না,…
আমাদের মধ্য থেকে একজন এমন সময়
আমাদের মাথা নিচু ক'রে দিয়ে গ'র্জে উঠল,
আস্পর্ধা ছিল না কারো টুঁ শব্দ করি যে একবার,
সে আমায় বললো যেন আপনাকে সব কথা বলি,
কিছু না লুকোই যেন, আমি তাই অগত্যা এসেছি,
তাকে এড়াবার কোনো উপায় ছিল না ব'লে, তাই,
দুঃসংবাদের চর কে বা কবে তাকে ভালোবাসে ?

সূত্রধার। রাজন্, যখন ওর কথা শুনছিলাম, কাঁপছিলাম,
হয়তো এর মধ্যে কোনো অদৃশ্য শক্তির হাত আছে।

ক্রেয়োন। আপনি সময় থাকতে থামবেন ? যদি ব'লে ফেলি
আপনি যতখানি বৃদ্ধ ঠিক সে-আন্দাজে বোকা লোক !
স্বর্গের আকাশে র'ন্ দেবতারা, তাঁরা কি কখনো
নরকের কীট দেখে গোর দিতে যান ব্যস্ত হ'য়ে ?
ঘরশত্রু যে তাঁদের রত্নদীপ নৈবেদ্যের থালা
স্তম্ভে খোদাই স্তোত্র ইন্দ্রনীল দেউলপাষাণ
ছারখার ক'রে দিতে এসেছিল তাকে মাটি দিতে ?
পাপীকে প্রশ্রয় দেন দেবতারা, আপনি বলবেন ?
না, না, সে তো হ'তেই পারে না। আমি তত মূর্খ নই।
এর মূলে কয়জন অতি বুদ্ধিমান নাগরিক…
আমার আদেশ শুনে ঘরে-ঘরে চোখ রাঙিয়েছে,
তারপর মাথা নেড়ে পরামর্শ আইন-ভাঙানি
কানাঘুষা ফিসফাস, চাপা শব্দ এখন চিৎকার।
ঘুষ দিয়ে সৈন্যদের মুখ তারা বন্ধ করেছে !
মানুষেরা মানুষের আত্মা কেনে মুদ্রাবিনিময়ে ?
সুন্দর মানুষ পেলে অর্থ তাকে পিশাচ বানায়,
ঘরবাড়ি ভেঙে-চুরে গৃহস্থকে ঘরছাড়া করে,
কেন যে মানুষ করে শয়তানের শিক্ষানবিশী,
আমি যদি ঈশ্বরের বিশ্বাসী ক্রেয়োন হই, তবে
ভাড়া-করা শবচোর এই সেপাইরা একদিন
দণ্ড পাবে। আর শোনো শেষকৃত্য যে করেছে তার
খোঁজ দিতে না-পারলে শেষকৃত্য তোমারো পাওনা।
তাকে নিয়ে এসো, নইলে তিলে-তিলে শুকিয়ে মারবো,
ঝুলিয়ে রাখবো শূন্যে, পেরেক ফোটাবো সারা গায়ে,
আশা করি তবে শিখবে একজনের কর্মচারী হ'য়ে
সবার বেতন নেওয়া ভালো নয়। সঞ্চয়ের ফল

অপচয়, স্বর্গ নয় বিপথে যাবার কর্মফল ।
প্রহরী। আমি কি এখন যাবো? অনুমতি করেন তো যাই।
ক্রেয়োন। তোমার প্রত্যেক শব্দ কাঁটা হ'য়ে বিঁধছে আমাকে।
প্রহরী। হুজুর, কোথায় বিঁধছে, মাথায়, না কানে, কোনখানে?
ক্রেয়োন। ব্যথার ঠিকানা নেবে বিদূষক নাকি বেয়াদব?
প্রহরী। ফেরারি আসামি তবে বুকব্যথা, আমি কর্ণশূল।
ক্রেয়োন। এ কোন লাগামছাড়া মুখ-আলগা অবাধ্য বাচাল!
প্রহরী। ঐটেই শিখেছি, কিন্তু সেই কাজ কখনো করিনি।
ক্রেয়োন। করোনি? তোমার আত্মা অর্থমূল্যে বিকিয়ে দাওনি?
প্রহরী। দোষ বা'র করবেনই ভেবেছেন, আজব ব্যাপার।
ক্রেয়োন। সন্দেহবাতিকগ্রস্ত আখ্যা দাও এক হাজার বার,
কিন্তু চোরকে ধরতে, আর যদি দেরি করো তবে
দেখবে যে বাঁ হাতের কাজে কোনো সুফল হয় না।
[প্রাসাদের অভিমুখে তাঁর প্রস্থান]

প্রহরী। আমিও তো চাই তাকে পাওয়া যাক। অবশ্য একথা
ভাগ্যদেবী বোঝাবেন তাকে পাওয়া যাবে কি যাবে না।
আমার বরাত ভালো, মানে-মানে আজকের মতো
পালাই পৈতৃক প্রাণ বুকে নিয়ে, ঘরে গিয়ে বাঁচি,
আগে তো আপন বাঁচা, এর পর কী হবে কে জানে;
[প্রহরীর প্রস্থান]

সংস্তব

স্থায়ী : এক

বড়ো বিস্ময় এই যে মোদের নিখিলবিশ্ব ভ'রে
তার মাঝে হেরো আরো বিস্ময় মানবযাত্রী ওরে—
তটিনীসিন্ধু হেলায় সে হয় পার,
হিমানী পবনে সে রচে সৌধ তার,

গভীর গহন পথ ছেড়ে দেয়, গিরিচূড়া যায় স'রে
ঊর্ধ্বে অদিতি, নিম্নে জরতী ধরণী মৃত্তিকার
নিথর পাষাণে হলকর্ষণে ফসল আনে সে মোদের মাতৃক্রোড়ে।

অন্তরা : এক

দ্যৌষ্পিতঃ পৃথিবি মাতরধ্রুগগ্নে মৃলতা নঃ।
বিশ্ব আদিত্যা অদিতে সজোষা অস্মভ্যং শর্ম বহুলং
বিয়ন্ত ॥
জানি বিহঙ্গ স্রোতের পাখায় হাওয়ায় বিহার করে,
সাগরে বিহরে সাগরের মাছ, পশু বনকন্দরে—
মানুষ তবুও দিক্‌দিগন্তে পেতেছে বিশ্বজাল,
দুই হাতে ধরে বুনো হরিণের পাল,
পাগলা ঘোড়ার বলগা পরায়, বন্য বৃষেরে রজ্জুবিনীত করে ॥

স্থায়ী : দুই

বাণী তার ধায় সীমান্তিকায়, কল্পনা অম্বরে,
হেরো মানুষের অটুট ধৈর্য নগরপ্রাকার গড়ে।
দুর্গ যে তার ঝঞ্ঝাতুষারজয়ী,
বুকে ভৈরবী 'ভোর ভয়ি' 'ভোর ভয়ি',
বীরবেশে ও যে সদা রয় প্রত্যয়ী,
রণবেশে ও যে অপেক্ষমাণ নব-নব সব কালবৈশাখী ঝড়ে,
কালভৈরবে তুলে ধরে তার আয়ুধ কালক্ষয়ী,
সমাধি ছাড়া সে আঁর সব-কিছু পার হ'য়ে যায়, অথচ মানুষ মরে।

অন্তরা : দুই

মানুষের কী মহিমা,
জাদু জানে ও যে পার হয়ে যায় দৃষ্টির দিক্‌সীমা,
এই ডেকে আনে অমানিশি আর এই আনে পূর্ণিমা;

নগরের নীতি স্বেচ্ছায় ভাঙে গড়ে,
দৈববাণীরে কলুষমলিন করে,
সৌধবাসীর পাশে ছাখো ঐ গৃহহারা পথ-'পরে,
চাই না তাদের যারা ম্লান করে শুভ্রের বর্ণিমা,
ছুর্জন যেন ভুলেও কখনো পশে না মোদের ঘরে ॥

সূত্রধার

এ কী দেখি, আমি চোখে দেখি, নাকি মনে
চোখে লাগেনি তো কাজল বা কার্পাস ?
ব্যথার প্রতিমা ওই না আন্তিগোনে,
ব্যথায় পাথর পিতা যার ঈদিপাস
পিতার মতন করুণ বিজনবালা,
বন্দিনী ক'রে আনলো রণাঙ্গনে ?
রাজার আজ্ঞা ক'রে নেয়নি কি মালা ?
ঘূর্ণি বাতাস কাঁপে নৈঋৎ কোণে।

কোনো নারী-নিসর্গের প্রতি

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

তুষার-তনু পাহাড় উঁচু। উত্তরের শেষ—
কল্পনার মালভূমির দেশ—
শুধালো মন—কে আছে আরো উঁচু তোমার চেয়ে
সে কোনো আরো উচ্চচূড়া আদর্শের ?
অন্ততর অথবা কোনো মাটির মৃদু মেয়ে ?
প্রশ্নটা কি শুনলো কেউ ? দাঁড়ালো এসে ধবল-চূড়া ছেয়ে
কোন মানসী মূর্তি এক মনের শত ইচ্ছাতে রঙিন—
'অভীপ্সার প্রতিকৃতি !—অতিকৃতি, অতিকৃতি—'
চেঁচিয়ে ওঠে অবাচী দেশ তরাই দক্ষিণ।
'সুদূর কোণে আমি তো প'ড়ে রয়েছি হ'য়ে নিচু ;
নাবাল সমতলের গায়ে রয়েছি হ'য়ে লীন ;
উত্তরের ঈর্ষা তবু আমার পিছু-পিছু
ডুবতে ছোটে অতল-তলে সাগর-মোহানায় !'
...ধবল চূড়া-শীর্ষে দেখি মূর্তি স'রে যায় !
তখনি বুঝি অভীপ্সার হয়েছে ভরাডুবি
ছুঃখ হয় খুবই।

সমুজ্জ্বলা প্রকৃতি যেন নিমেষে মুখ কালো
করলো আর মরণ-মেঘে লুকালো মুখ আলো।
অবাক হই—এ কী এ অনাসৃষ্টি !
মেঘলা ভারি আকাশ আর পৃথিবী-জোড়া বৃষ্টি
সে-কথাটুকু বুঝিয়ে ছায় যে-কথা বোঝা শক্ত ;
সাপের মতো সোহাগ যার, পাপের মতো মিষ্টি
জেনেছি তবু হয়েছি তারই মাধুরী-অনুরক্ত।

অবাচী দেশ ডাকলো ফের দক্ষিণের দিন!
যেখানে ছোটে চরণ লঘু হাওয়ায় কে হরিণ,
সেখানে নেমে যাই—
ঘাসের দেশে খেলছে দেখি চপল এক ভালোবাসার মেয়ে
তাকেই উঁচু মানলো প্রাণ মালভূমির চেয়ে—
এখানে সেই তলিয়ে-যাওয়া অভীপ্সাকে পাই—
আসক্তিই শক্তি দিলো, আকাশ দিলো আলো,
চির-চাওয়ার সেতু বেয়েই যা-কিছু পাওয়া এলো—
সকল ছেড়ে নভস্পৃক্‌ আদর্শের কাচে
একটি মেয়ে সকল চূড়া ছাড়িয়ে দেখি আছে।
মুমুক্ষায় মূর্খ মরা শাস্ত্র-বাণী যতো
কখন দেখি হয়েছে পদানত।

দিশারী হ'লো তখন থেকে তুষার-তনু তার
বুকে পাহাড়, চোখে আকাশ নীল—
অভিলাষের পাখির চোখ হাওয়ার হাত-লাগা
চিনতে চায় দূর বনের পাতার ঝিলমিল!
অন্যমনে জাগছে সেই চিরকালের অভীপ্সার ভাষা
লীলায় তার দেখেছি খুঁজে রয়েছে অনিমীল।
নাম রেখেছি চূড়ালা রানী অনেক চূড়া দেহে
ঝলমলিয়ে স্মরণে আনে উত্তরাশা-দিন—
হৃদয় তবু অতল-তল নাবাল ভূমি বেয়ে
ঘাসের দেশে তাকেই পেলো হাওয়ার দক্ষিণ।

বলো তুমি

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

বলো তুমি লিখে দেবে তোমার আপন হাতে নাম
আমার কবিতাভরা খাতাটার শেষের পাতায়
যদি আমি শেষ করি আমার এ-শূন্য পরিণাম
দীর্ঘ পথপরিক্রমা। যদি এই ধুলো কাদা পায়ে
তোমার অঙ্গনে এসে ক্লান্ত হাসি হেসে তবু ডাকি
শেষ ক'রে দিয়েছি আমার এই যাযাবর নাম,
প্রবাল-সাগর-তলে জীবনের সোনামোড়া ফাঁকি
ডুবিয়েছি। কোনো চরে সব স্বপ্ন পুড়িয়ে এলাম।

যে-আকাশে জীবনের সব তারা ঝলমল করে,
যে-বনের মর্মরেতে আশার পাতারা সব ঝরে;
যে-নদীর তীরে-তীরে পদচিহ্ন একেলা শুধায়,
যে-দিগন্ত জুড়ো হোলো তোমার ও-চোখের তারায়—
সে-আকাশ, নদী, বন, দিগন্ত হারিয়ে যদি যায়,
বলো তুমি ভ'রে দেবে তবু এ-জীবন কবিতায়?

আমাকে নিঃশেষ ক'রে

বিকাশ দাশ

আমাকে নিঃশেষ ক'রে প্রতিটি মুহূর্তে বিলিয়েছি
তোমার সত্তার কাছে। তুমিও আকণ্ঠ ক'রে পান,
আবার পেতেছ হাত। আমি সেই মুঠি ভ'রে দিতে
ঢেলেছি উপুড় ক'রে যৌবনের মদির পেয়ালা।

আমার আকাশ-দূত তোমার দিগন্তে নেমে গেছে,
নীল চিঠি হাতে নিয়ে, শিহরিত বন-সহচরী,
আমার সত্তার পাখি নীড় খোঁজে তোমার ছায়াতে,
রাত্রির নির্জনে তুমি তবু যে তৃষ্ণায় জ্ব'লে মরো।

জ্বলে শূন্য মরুভূমি স্নায়ুতে শিরায় সারাক্ষণ,
'কী পেলে নিঃশেষে ঢেলে ?' শুধালো মনের যুবরাজ।
আর সেই মুহূর্তের তরঙ্গিত সৈকতে দাঁড়িয়ে
ভেবেছি ফিরিয়ে নিয়ে এইবার নিজেকে বাঁচাই।

আমার পেয়ালা শূন্য। তুমি তবু বন্ধ মুঠি খুলে,
জানালে,—'ভরেছে কই' ?—স্বপ্নের কিনার-ঘেঁষা মন
আমাকে শুষেছে খালি। তবুও স্বপ্নকে নিয়ে যদি
একান্তে কখনো বসি ছায়া ফেলে তোমার আকাশ।

দুটি কবিতা

দিব্যেন্দু পালিত

তিন রকমের ইচ্ছে

তিন রকমের ইচ্ছে আমাকে পাগল করে।

এক, যা রাজার মতো।
মদে আর আমোদে
চোখের সুর্মায় রোজই খুঁজছে—
অন্তঃপুরে নতুন বসন্ত।

দ্বিতীয় ইচ্ছেটা স্বাবলম্বী হ'তে চায়।
রাজা নয়, রাজপুত্র।
পক্ষীরাজ নেই ; পক্ষীরাজের বাসনাও নেই—
অথচ পেশীতে সেই রকম রক্ত।
অনেক পথ পেরিয়ে—
হয়তো রাজকন্যার শিয়রে রুপোর কাঠি ;
গাঢ় ঘুম, আর রোদ, আর—
বন্য পেশীতে আকুল-করা ইচ্ছে।

তৃতীয় ইচ্ছেটা নিজেই ভারি অদ্ভুত।
রান্নাঘরের গুমোটে দাঁড়িয়ে
হাতের ময়লা তোয়ালেতে ঘাম মুছতে-মুছতে
আধ-বুড়ো বাবুর্চি ভাবে—
মেম সাহেবের ওই কচি, রাঙা আর শক্ত,
অথচ মিষ্টি নরম আপেল দুটো যদি পেতাম!

এই সব ভাবতে-ভাবতে
বাতাস যখন স্তব্ধ—
আর হাওয়া নেই, রোদও নেই ;
মরা দিনের নাড়ির মধ্যে
আত্মরতির মাছিটা ছটফট করে—

সব ভাবনাগুলোর গলা টিপে
হঠাৎ ভাবি—

আমি যদি নারী হতাম !

ফিরে যাওয়া

আমি তবে ফিরে যাই নদীর গভীর থেকে
গাঢ় ঘুমে ঢুলুঢুলু ঘাসে।
ফিরে যাই বাতাসের ক্লান্তিহীন
নীল বারো মাসে।

হয়তো মাথার চুলে তখনো রয়েছে কিছু রোদ।
কানে এসে বিঁধে গেছে মৃত এক শালিকের গান ;
পালাতে পারেনি। তার করুণ, কাতর, ভীরু প্রাণ—
হয়তো শিশিরে ভিজে মুছে দিয়ে গেছে সব বোধ।

সন্ধ্যাতারার ছায়া তার ম্লান চোখে কিছু আলো
ঢেলে দেবে। পিঁপড়েরা আলগোছে বেসে যাবে ভালো।
তারপর খুঁটে-খুঁটে,
ছোট্ট দেহের করপুটে—
সার বেঁধে চ'লে যাবে নরম মাটির খুব কাছে।

হয়তো তখনো বুকে আরো কিছু উত্তাপ
ঘন হয়ে আছে।

তখনো শ্রমের শেষে মানুষ খুঁজবে প্রিয় মুখ ;
আড়ালে লুকিয়ে লোভী যুবতীরা খুলে দেবে বুক।
কল্পনায় ডাক দেবে শিশুর নরম ঠোঁটে হাসির উল্লাস ;—
আরো দূরে যেতে-যেতে বাতাসে শুনবো বারোমাস।

দিব্য প্রতিমা

("To Mercy, Pity, Peace, and Love")
William Blake

দুঃখ যখন আঘাত করে সবাই ফেরে খুঁজে
মৈত্রী দয়া করুণা আর ভালোবাসা,
আনন্দময় নিত্যগুণকে জানায় বারে-বারে
ধরণী তার নিবেদনের নম্র ভাষা।

কারণ দয়া করুণা আর মৈত্রী ভালোবাসাই
পরম প্রভু, পরম পিতা, প্রিয়তম।
আবার দয়া ভালোবাসা মৈত্রী করুণাতেই
রচিত তাঁর সত্য মানুষ নিরুপম।

কে করুণা? হৃদয়ে তার হৃদয় মানুষেরই,
দয়ার মুখে এই মানুষের প্রতিকৃতি,
পুণ্য নরদেহই দ্যাখো, ভালোবাসার দেহ,
নরদেহের আঁচল জড়ায় মৈত্রী প্রীতি।

তাই তো বলি, দুঃখ যখন আঘাত করে বুকে
যে যেখানে ভক্তিভরে নোয়ায় মাথা,
তখন দয়া করুণা আর মৈত্রী ভালোবাসাই
মানুষকে বন্দনা করে, সেই বিধাতা।

হোক সে ম্লেচ্ছ, হোক ইহুদি, হোক তুরানি, তবু
বরণ কোরো মানবদেহের অধীশ্বরে,
যেথায় দয়া করুণা আর মৈত্রী ভালোবাসা,
আছেন তিনি তাদের সঙ্গে সবার ঘরে॥

অনুবাদ : নরেশ গুহ

স্থাপত্য

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

সমস্ত নির্মাণ করো ; তা ভিন্ন তোমার মুক্তি নেই।
ওরাই রাক্ষস হ'য়ে ধ্বংস ক'রে যাবে তোমাকেই।

দুর্ভেদ্য মুঠোয় সব ধরো ;
যেন না ছাড়াতে পারে ; তারপর ধীরে, দ্রুত গড়ো।

ফেটে কারা যেতে চায় তারা হবে গম্বুজ সুন্দর,
চুরমার বোধ দিয়ে তোলো তুমি সূক্ষ্ম চিত্রলতা,
তোমাকে আমূল বিঁধে যারা আজ অঙ্কুশ বক্রতা
বঙ্কিম খিলান হবে, ধ্বংস যার নেই অতঃপর।

গভীর সময় এই। এই সেই শিল্পের আঘাত।
সুঠাম মিনার ক'রে গ'ড়ে তোলো অন্তর্ভেদী জ্বালা।
কঠিন আঁকড়ে ধরো ঝাঁপ-দেওয়া সব ডালপালা ;
অপূর্ব অলিন্দে হ'বে জাফরি-কাটা চন্দ্রিকার রাত।

মারতে চেয়ো না পিষে। পারবে না। ধ্বংস হ'য়ে যাবে।
সমস্ত বিদ্যুৎশক্তি ক'রে তোলো প্রাণশিল্পময়।
এই তো চরম যুদ্ধ ; শিল্প লগ্ন। এ তো খেলা নয় ;
সত্তার তোলপাড় দিয়ে স্থাপত্যের তপস্যা জাগাবে।

চীৎকার সংহত ক'রে লাবণ্যের ঢেউ-তোলা ছাদ
তোমার গড়ার আছে ;—আক্রোশের, হিংস্রতার খাঁজ
কেটে-কেটে এঁকে যাও সুনিপুণ জালির সমতা ;
কিছুই ফেলার নয় ; এক খাতে বহাও অবাধ।

উপচে উঠেছে জল?   স্তম্ভ বেঁধে দাও সারি-সারি।
কেন তুমি ভেসে যাবে? লজ্জা? গ্লানি? বিশাল চত্বরে
ধীরে-ধীরে গেঁথে যাও।   অপমান? স্বচ্ছ সরোবরে
সোপানের শ্রেণী দাও।   ঘৃণা? ওরা ঝরোকা ও ঝারি?

সব হাহাকার ছেনে প্রতিধ্বনি ভ'রে দাও ঘরে;
তোমার সমস্ত শূন্য ঘিরে দাও খচিত দেয়ালে;
ফাটে যা, ভাঙে যা, হানে, ছেঁড়ে, খোঁড়ে, জল হ'য়ে ঝরে—
সমাধিমন্দির ক'রে থেকে যেয়ো তার অন্তরালে।

আগুনের মতো যদি তারো পরে কিছু থাকে জ্ব'লে,—
ভালোই।   বাতির স্নিগ্ধ আলো হবে, রোজ, সন্ধ্যা হ'লে।

তুমি আগে চলো

শান্তিকুমার ঘোষ

তুমি আগে চলো, বন্ধু, ঋজু ধাপ ভেঙে—
এই দুর্গের আড়ালে সমুদ্রের ছবি আছে:
উন্মাদ হাওয়া আর ঢেউ;
হৃদয়কে মেলে দেবো মূর্ছার শিখরে।

আয়নায় আলো ফেলে সংকেত জাহাজ দেয় সমুদ্রে কেবল।
সে-আলোয় ছাখো দূর অতিবলয়িক নানা পথে
নরনারী বস্তুভার চলে ঘোর নিবিড় জগতে।
বস্তুর বিস্তৃত বিশ্ব—সত্তায় সম্পূর্ণ, ভিন্ন—
শক্তির তাড়িত পুঞ্জ দাউদাউ অনন্ত অবধি।

অনন্তের দিকে গতি
আলোর তীরের মুখ, পাখির নিয়তি বেগ,
অনন্তের দিকে।
ডুবে যায় একে-একে উপত্যকা খেত নদী
উপরের থেকে দেখা।
শূন্যের স্মারকচিহ্ন—করুণ মাথার খুলি
পথের তোরণে।
বিপরীত জলস্রোত আছড়ায় বুকে এসে
—ভীষণ নির্জন তবু!
ভালোবাসা এত যাকে সে যেন আঁধার-লীনা
কখনো গেল না দেখা ধূপছায়া রূপ যার।
অর্গলবিহীন ঘর, চেয়ারের বিশালতা কৈশোরের ভয়ে ভরা।
ধূম্রকূটে ডুবে কোন গাঢ় ঘুমে জেগে থাকা আচ্ছন্ন প্রহরে।

পলাতক কারা সব তন্দ্রায় ভুলেছে নাম নিরুত্তর প্রহরীর ডাকে ;
স্বপ্নের নির্মাণ নীড় অনেক উঁচুতে দোলে ঝড়ের বাতাসে ;
ক্যানুতে আরোহী কত মস্তক বিজয়ে চলে শতকে দশকে।
আশা নেই…দু মুহূর্ত…কী মধুর কমনীয় ব্যর্থ ভালোবাসা।
শব্দের জগৎ ভেঙে পরমাণবিক বেগ কবিতার ব্যথা।

আভার সমুদ্র এক :
      সূর্যের নিকটে দূরে
নীল ঝরে নীল শুধু বর্ণহীন রূপ :
দর্পণ আলোকে পোড়ে আমার বিস্মিত মুখ,
                  কল্পনার উর্ণনাভ, প্রেম।

তাই আগে এসো, বন্ধু, দৃশ্যের অতীতে
                  সন্ধ্যার সমুদ্র বেয়ে
                        নিস্তব্ধ যেমন
বর্ণিল জগৎ ছেড়ে প্রায়ান্ধ বালক চলে ধ্বনিময় লোকে ॥

জলের পুরাণ (অংশ)

জ্যোতির্ময় দত্ত

শবদর্শন

এতোদিনে যুবতীর উন্মাদনা স্থির।
মৃত নয়, জলের নিষিদ্ধ গভীর
অন্ধকার জীবনে নীরবে জীবিত
নিভৃত জীবনের কৃষ্ণপুলকে স্ফীত,
নীরবে ভাসমান এক অতিকায় জলজ উদ্ভিদ।

আজ শ্যাওলার জীবন্ত, সবুজ শাড়ির
ভাঁজে-ভাঁজে হাল্কা নতুন তার জলের শরীর ;
এতোকাল দেহ ছিলো শুধু রক্তের কবর—
অন্তরে বাহিরে আজ উষ্ণ কিংবা স্নিগ্ধ শীতল
জল, জীবনের আদিম সম্বল।

মৃত্যুর আগে, মেয়েটি প্রথমবার যখন নিষাদকে দেখলো

হারানো জলার পুলকিত সরের মতো,
দুহাতে একটু সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো
এক ঘোর পুরুষ ; এমনকি প্রথম বর্ষার শৈবালও
তার উজ্জ্বল ত্বকের চাইতে জীবন্ত নয়,
তার কৃষ্ণ শুদ্ধতার তুলনায়

অপর মানুষেরা যেন নকল উদ্ভিদ, অত্যুজ্জ্বল
ঋতুদের সাজানো পুতুল। যেমন যখন
জাগেন কোনো প্রশান্ত উদার হিমবাহ,

থেমে যায় ঋতুদের চীৎকার আর অস্থির হাওয়ার কোলাহল,
তখনো তুষারের সারা গায়ে কুয়াশার দুর্বল স্নেহ

লেগে থাকে কোনো প্রাচীন বিধবার অশরীরী উষ্ণতার মতো,
তেমন তার পোকার প্রাণের মতো মৃদু,
বাড়ন্ত জলের চাইতে আতত
মুগ্ধ আকৃতির কেবল সম্বল
হারানো নিষাদের এই মায়ার আদল।

চারিদিকে গম্ভীর, প্রাচীন বৃক্ষেরা
সম্মত ছিলেন ; সেই গভীর জীবগণ
দেখলেন তাঁদের তনয়ার পুণ্য সম্মোহন,
এবং সেই উপবাসমৌন সন্ন্যাসীদের
নাভীর কোটর যেন সুগন্ধ দুধের
তরলতায় ভ'রে গেল।…

রাখাল কী ভাবে তার এই সম্মোহন ভাঙলো

কিন্তু রাখালের হাত, যেন তার পালিত কাঠবেড়ালি,
শরীরের ঘন আঘ্রাণে হ'য়ে গেছে বুনো ;
তার দেহের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে

বুকের কাছে খুঁজে পেলো শ্যামল, শীতল দুই অতি-ঘনিষ্ঠ স্তূপ ;
বুঝে গেলো এই তার হারানো দুই ভ্রাতার কবর ;
শুদ্ধ এখন তাই প্রগল্‌ভ জন্তুর ধড়।
মেয়েটি চমকে দেখলো, বুকের বিজনে অপঘাত
কোনো সফল জন্তুর নয়, নিতান্তই আড়ষ্ট এক মানুষের হাত
স্তনের কোটর ভ'রে আছে।…

নিষাদ আবার দেখা দিলেন

তবুও নিস্তার নেই। নিষাদের ছদ্মবেশ
চাঁদের আগমনের প্রথম আভাসে
খ'সে যেতে লাগলো। মেঘ তাঁর প্রাচীন কেশ,
রাত্রির রহস্য তাঁর চারিপাশে,
তাঁর অসীমতায় নির্ভয় জলশিশুর মতো

সমস্ত পৃথিবী খেলা করে। চুলে চাঁদ
ঢেলে দিল স্বর্গের দুধ,
আলোর ধারা যেন অর্বুদ,
নীরব, রহস্যময় বকের ঝাঁক
চুলের জটার ওপারে সেই নিভৃত আলোর হ্রদ

ছেড়ে উড়ে আসছে পৃথিবীর কোনো নিঃশব্দ জলার
স্তম্ভিত বুকে।…

দেবতার কৃপায় সে ডুবে গেলো

দেহের খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে, মিলিয়ে গেল অন্ধকারে—
এমন এক পরম দেহসারে
যেখানে জল আর জলের রূপক,
মাছের চোখের নির্মল দুঃখশোক,
এক হ'য়ে গিয়ে শুধু অন্ধকার হয়েছে।

সাইবেরীয় পাখিরা যেখানে পোহাতো রোদ্দুর,
তার জঙ্গম হৃদয়ের উৎস সেই সুদূর,
প্রশান্ত হ্রদে। তারপর, বেগান্ধ নদীর মতো,

হে কন্যা, ঘু'রেছো জঙ্গলের জটিল পাকস্থলী ;
পাতালের উষ্ণ গর্তগুলি

ভরেছো জলদানে। শ্যাওলা আর বেতের কবর
যখন আসন্ন মনে হ'লো, তখন, হে পুণ্য নদী,
ক্ষীণ চন্দ্রালোকে দেখলে সেই আদি,
বিশুদ্ধ জল, এতো স্থির, যে মনে হ'লো
উপরের শান্ত, শ্বেত সর

বুঝি ফেটে যাবে তোমার প্রবেশের আলোড়নে।
কিন্তু, আসলে, তোমার স্মরণে
একটি বুদ্বুদও জাগলো না। নিজের বিশুদ্ধতায়
জলের আপন হয়ে গেলে। হে পরম মাতা, তোমার প্রমায়
আমাদের এই একান্ত নিরপরাধ কন্যাকে রেখো।

প্রত্যবায়

অমিয় চক্রবর্তী

"দিনে জোড়া লাগবে না, আলোর উগ্র বিচিত্রতা
বহু-চক্ষু সমাজের ভুল দৃষ্টি মিশে
চেরা জীবনের ক্ষতে বাড়াবে আরোই দগ্ধ ব্যথা,—"
বলেছেন সন্ত ; আর মন্ত্র দিয়েছেন সান্ধ্য হোমে
পরম রাত্রির ইচ্ছা জেলে-তোলা আত্মার নিমিষে ;
জপমন্ত্র ; পুরাণী নক্ষত্র-নিশীথিনী
জাগে যেথা জয় ক'রে কৃষ্ণা বিস্মরণী যুগে-যুগে,
ঊর্ধ্বময় ধ্যানশিখা তারি আবর্তনে
স্নিগ্ধ হয়ে মর্ত্যে নামে পূর্ণতায়।

মন্ত্রদাতা, রাত্রি এলো, কী ক'রে বলো সে-পথ চিনি—
কোথায় আশ্বাস এই গোধূলির অশান্ত প্রত্যয়ে
যেখানে সঙ্গম-জল-মাটি
হারায় অগণ্য ঢেউয়ে ; পৃথিবী কান্তার, দিক্-ঘেরা।
লুপ্ত ক'রে জীব-সন্ধি আমার চৈতন্যে নিবিড়,
ঢেকে দিয়ে দৃশ্য সেই যার অন্তর্গত ব্যথা-জাগা
বাঁচার জেনেছি সুধা, ভরে সমাধির
এ কী অবর্ণতা, যোগ-সংকট মুহূর্ত ঘন হয়ে
চূর্ণ হোক শেষ রাত্রি, না হলে প্রত্যহ বক্ষে-ঘেরা
জ্বলুক নির্মম সূর্য, যৌবনী জনতা দৃপ্ত দিবা—
আবার সংসারে যুঝি, খুঁজি সেই প্রাণ অক্ষৌহিণী॥

চিঠিপত্র

ইংরেজি ও মাতৃভাষা

(বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত) ১০ জুন, ১৯৫৮

প্রিয়বরেষু,

পৌষ-ফাল্গুনের কবিতা পত্রিকায় আপনার প্রবন্ধটি খুব ভালো লাগলো। "ইংরেজি ও মাতৃভাষা" নামে ঐ রচনা আশা করি বহুল প্রচারিত হবে; ইংরেজিতেও ভারতের নানা জায়গায় বেরোনো দরকার। বিষয়টা প্রকাণ্ড জটিল, ভবিষ্যৎ দূরে থাক্ ঠিক এখনই কী ব্যবস্থা দাঁড়াবে বলা প্রায় অসম্ভব, কিন্তু ভাষার মূল্য যেখানে গভীর সেই কেন্দ্রিক স্থানে ক্রমান্বয় আলোচনা জাগিয়ে রাখা চাই। আপনি বাংলা ভাষার এবং বাংলা সাহিত্যের ভিতরকার কথা তার সৃষ্টিশীল প্রবাহের দিক থেকে সুস্পষ্ট ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন; এই আলোচনায় যোগ দেবার অধিকার তাঁদেরই যাঁরা ভাষাকে চিন্ময় জ্ঞানময় সত্তার অবিচ্ছেদ্য সূত্রে জানেন।…

রাষ্ট্রিক দিক যে নেই তা নয়, খুবই আছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামঞ্জস্য রক্ষা হবে সংস্কৃতির বৃহত্তর ভূমিকায়,—আশা করি প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকার সে কথা বুঝবেন। বাংলাদেশের সাহিত্যবুদ্ধি এবং জাতীয়তা কারো চেয়ে কম নয়, আমাদের বিশেষ দায়িত্ব যেন প্রাঞ্জল অনুশীলন এবং প্রচারের দ্বারা আমরা অনেকখানি আলোহাওয়া এই প্রসঙ্গে চারিয়ে দিতে পারি। "কবিতা"র পৃষ্ঠায় আপনি তাই করেছেন।…

আমি দূরে আছি, সব জিনিষটাকে ঘাঁটিয়ে দেখতে পারছি না। ভারতের প্রত্যেক জাতীয় ভাষাকে চরম এবং স্বতন্ত্র মূল্য না দিয়ে পারি না; ইংরেজিকেও সেই ভারতীয় ভাষামণ্ডলীর অন্তর্গত ব'লেই জানি। দেশজোড়া মানসিক এবং বিবিধ বৈষয়িক ব্যাপারে ইংরেজি আধুনিক যুগের ভারতবর্ষে ক্ষীয়মাণ হ'তে থাকবে তা ভাবাই যায় না, কেননা আজকের পৃথিবীতে সর্বরাষ্ট্রিক একটি

বা একের বেশি বহুসচল ভাষার দাবী বেড়ে যাচ্ছে, কমছে না। খাঁটি সাহিত্যের দিক থেকে আমার মনে কিছু খটকা আছে,—ভারতবর্ষ যে ইংরেজি ভাষায় উৎকৃষ্ট সৃষ্টির পরিচয় দেবে, সহজ প্রত্যহ অধিকারে আপন গরিমা প্রকাশ করবে তার আশা কম। কেনই বা তা আশা করবো, বস্তুত, আজকের ভারতে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার উৎকর্ষের দিক থেকে নীচুতে নেমেছে, এবং হয়তো আরো নামবে, যদিও সংখ্যায় হয়তো বেশি লোক ইংরেজি ব্যবহার করে এবং করবে। কিন্তু ইংরেজি ভাষাও থাকবে ভারতের অন্যান্য জাতীয় ভাষার পাশাপাশি; বিশেষ গরিমার স্থান তার না-ই বা হ'লো,—ইংরেজি ব্যবহারের স্রোত ভারতে মুক্ত রাখাটাই প্রধান কথা। সাহিত্যসৃষ্টি মুখ্যভাবে চলতে থাকবে প্রত্যেক ভারতীয় অঞ্চলের নিজস্ব ভাষায়। আপোষে এইটে মেনে নিতে দোষ কী?…

বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়, ম্যাসাচুসেটস **অমিয় চক্রবর্তী**

হুইটম্যান ও নজরুল ইসলাম

'কবিতা'-সম্পাদক সমীপেষু,

বর্ষ ২০, সংখ্যা ১ "কবিতা"য় শ্রী নরেশ গুহ মহাশয়ের "ওঅল্ট হুইটম্যান—একশো বছর পরে" প্রবন্ধ পাঠ করলাম। অতি সুন্দরভাবে হুইটম্যানের কবিতার ধারা ও কাব্যমানসের উন্মোচন করা হয়েছে। প'ড়ে আনন্দিত ও উপকৃত হলাম।

প্রবন্ধের শেষ দিকে তিনি লিখেছেন: "আসলে হুইটম্যানকে আবিষ্কারের উৎসাহ নিয়ে বাংলা কবিতায় প্রবেশ করলেন 'কল্লোল' যুগের কবিরা, বিশেষ প্রেমেন্দ্র মিত্র। কিন্তু ইউরোপীয় ট্র্যাডিশন-ভাঙার যে-বলিষ্ঠ প্রেরণা থেকে Song of Myselfএর মতো কবিতার উত্থান—বাংলা দেশের পরিবেশে কোথায় সেই প্রেরণা?…হুইটম্যান যেখানে সমগ্র জীবনের বন্দনাগানে মুখর, সেখানে বাংলা দেশের কবি মৃদুকণ্ঠে লিখছেন:

আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের,
বিলাশ-বিবশ মর্মের মত স্বপ্নের তরে ভাই
সময় যে হায় নাই।

...বাংলা কবিতায় হুইটম্যানের সুর বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের সচেতন পরিশ্রম সত্ত্বেও তাই মেকি প্রতিধ্বনি হ'য়েই শেষ হ'য়ে গেল।"

নরেশবাবুর এই অভিমত তথ্যনির্ভর নয়। বাঙালী কবির কাছে হুইটম্যানের আবেদন আদৌ পৌঁছয়নি, পৌঁছলেও তা খুব মিহি ও "মেকি", এ কথা ঠিক নয়।

কবি নজরুল ইসলাম বিপুলভাবে এবং সার্থকভাবে হুইটম্যানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় হুইটম্যানের সঙ্গে নজরুল ইসলামের সম্পর্কের কথা বিপুলসংখ্যক বিদগ্ধ বাঙালী পাঠকের আজো অজ্ঞাত। হয়তো এর প্রধান কারণ বিশ্লেষণী ও মননশীল পাঠকের অভাব এবং দ্বিতীয়ত আমেরিকার জাতীয় কবির সঙ্গে বাঙালী পাঠকের দূরত্ব। তবু এই দূরত্বকে আমাদেরই এক প্রিয় কবি স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করেছিলেন॥

ইংরেজি সাহিত্যের ফরাসী ইতিহাসকার লুই ক্যাজামিয়ান ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Lyrical Balladsএর আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন যে এঁদের সৃষ্টি-কর্মে যে-নীতি সক্রিয়, তাকে "an aesthetic application of sentimental democracy" বলা যায়। নজরুল ইসলামের সাহিত্যের প্রধান সুরটিকে মনীষী ক্যাজামিয়ানের কথাকেই একটু ঘুরিয়ে বলা যায় an aesthetic realisation of sentimental democracy। নজরুল ইসলাম যেমন, হুইটম্যানও তেমনি, জীবন, যৌবন, গান, প্রাণ ও 'গণতন্ত্রে'র কবি। নরেশবাবু জানিয়েছেন হুইটম্যানের আবেদন বাঙালী কবির কাছে পৌঁছলেও তা অসার্থক হয়েছে। এই উক্তি সত্য নয়। হুইটম্যানের ভাবাদর্শে রচিত নজরুল ইসলামের কবিতা ও গান সার্থক তো হয়েছেই, এমন কি আবেগে ও আবেদনে তা মাঝে-মাঝে হুইটম্যানকেও অতিক্রম করেছে। নজরুল ইসলামের "বিদ্রোহী" কবিতার প্রেরণা হুইটম্যানের Song of Myself থেকেই এসেছে। "বিদ্রোহী"র "আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ"—এই সুর

আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মজয়ঘোষণারই সুর। Song of Myself-এর প্রধান সুরও তাই—হয় তো বা আরো ব্যাপক। নজরুল ইসলামের 'জিঞ্জির' কাব্যের "অগ্রপথিক" কবিতাটি ("অগ্রপথিক হে সেনাদল, জোর কদম চল রে চল") আমাদের অতি পরিচিত ও প্রিয়। কিন্তু এই বিখ্যাত কবিতাটিও হুইটম্যানের Pioneers! O Pioneers! কবিতার হুবহু অনুবাদ এবং বাংলা কাব্যসাহিত্যের এক সার্থকতম অনুবাদ। কবিতাটি প্রথম যখন "সওগাতে" প্রকাশিত হয়, তখন নজরুল ইসলাম নিজেই পাদটীকায় হুইটম্যানের ঋণ স্বীকার ক'রে লিখেছিলেন, "ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'Pioneers'-এর ভাবানুসরণে"। কিন্তু পরবর্তী সংকলনসমূহে এই স্বীকৃতি দেখা যায় না। জানি না, এ অপরাধ নজরুল ইসলামের, না প্রকাশকদের।

বড়শিজা, বীরভূম **রাশীদুল হাসান**

আধুনিক কবি অমিত রায়

'আধুনিক কবি অমিত রায়' ('কবিতা', পৌষ-ফাল্গুন, ১৩৬৪) প'ড়ে দু-একটি কথা মনে হ'লো; সংক্ষেপে জানাই।

'কল্লোল'-যুগের বিদ্রোহ ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সার্থক, সে-বিষয়ে বিতর্ক আজ অবান্তর। কবি বা মানুষ রবীন্দ্রনাথ আজ তাঁর মৃত্যুর ১৭ বছর পরে তাঁর যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত হ'তে চলেছেন, সময় তা দেখছে। বাংলা কবিতা তাঁর সঙ্গেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেনি সচেতন পাঠকমাত্রেই সে-খবর রাখেন। 'রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্তি' হওয়া এখনকার কবিদের সমস্যা নয়; আধুনিক কবিতা আজ স্বকীয় অধিকারেই প্রতিষ্ঠিত। মনন যে আরো তীক্ষ্ণ হবে, জটিল হবে, দৃষ্টি যে আরো ব্যাপক হবে, প্রত্যয়ের ভিৎটাও যে টলবে, এটাই তো এ-যুগের দাবী, এবং তাই সজ্ঞান পাঠকের কাছে অমিত রায়ের নিঃসারতা ধরা পড়েই। রবীন্দ্রনাথ নিজেও যে এ-বিষয়ে অনবহিত দিলেন তা মনে হয় না; তার প্রমাণ অমিত রায়ের উক্তি,—'একদিন হয়তো দেখবে আর কিছু যদি না

থাকে আমার বাণীরূপ রয়েছে।' এখন, অমিত রায়কে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন 'আধুনিক' কবিদের প্রতিমূর্তিস্বরূপ দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছিলেন কিনা, তা যদি বিবেচ্য হয় তবে অমিত রায়ের মনোভাবসম্পন্ন পুরুষ সে-যুগে ছিলেন না বা এ-যুগে নেই তাও বা কী ক'রে বলা যায়—নরেশবাবু নিজেই তা স্বীকার করেছেন।

আমার মনে হয় সব মিলিয়ে অমিত রায় এক সার্থক ব্যঙ্গচিত্র। 'শেষের কবিতা'র মূল্য এ-দিক থেকেও উল্লেখ্য। নরেশবাবু বলেছেন, '—আমরা যে "শেষের কবিতা" নিয়ে অসুখী তার সঙ্গে রুচিবদলের কোনো সম্পর্ক আছে এমন অনুমান আমি একেবারেই বরখাস্ত ক'রে দিতে চাই।' কিন্তু তা কেন? 'রুচি' কথাটা কি এতই ভঙ্গুর? রুচিগঠনে কী কী প্রভাব কাজ করে, তা যদি বিচার করতে বসি তবে দেখি যে প্রথমেই আসে মানসিক প্রবণতা। সেই প্রবণতায় পরিবর্তনকে রবীন্দ্রনাথও আক্রমণ ক'রে থাকলেও অস্বীকার করতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ হয়ত ইচ্ছে করলেও 'আধুনিক' কবিতা লিখতে পারতেন না। কিন্তু সে-প্রশ্ন কি আমাদের পক্ষে খুব জরুরি আজ? বরং আধুনিক কবিতা কোথায়, কেন, কী ক'রে 'আধুনিক' হ'লো সে-বিষয়েই শ্রী নরেশ গুহর কাছে আমরা আলোচনার প্রত্যাশী।

কলকাতা

শৈলেশ রায়

কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত ও ১৪১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-১৩ মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড-এ মুদ্রিত।
সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক: বুদ্ধদেব বসু। সহকারী সম্পাদক: নরেশ গুহ।

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

'কবিতা'র এই সংখ্যার সঙ্গে আপনার চলতি বছরের চাঁদা শেষ হ'লো। পরবর্তী বর্ষ ২৩-এর চাঁদা (চার টাকা) আগামী **২০শে অক্টোবরের মধ্যে** মনি-অর্ডারে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ জানাই। যাঁরা আর গ্রাহক থাকতে ইচ্ছুক নন তাঁদের **নিষেধাজ্ঞাও ঐ তারিখের মধ্যে পৌঁছনো দরকার।** যাঁদের কাছ থেকে চাঁদা বা নিষেধাজ্ঞা কোনোটাই পাওয়া যাবে না, তাঁদের আমরা আশ্বিন সংখ্যা ভি. পি. যোগে পাঠাতে বাধ্য হবো। ভি. পি.তে পাঠাতে আমরা অনিচ্ছুক, কেননা তাতে অতিরিক্ত এক টাকা খরচ পড়ে, এবং সেই ব্যয় গ্রাহকদেরই বহন করতে হয়। উপরন্তু, ভি. পি. ফেরৎ এলে আমরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হই। ভি পি.তে যাঁরা পত্রিকা পাবেন, তাঁরা প্যাকেটটি গ্রহণ করতে যথাসাধ্য সচেষ্ট হ'লে বিশেষ বাধিত হবো।

মনি-অর্ডারে চাঁদা পাঠাবার সময় নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালনীয়:

(১) কূপনে গ্রাহক নং উল্লেখ করবেন।
(২) নূতন গ্রাহকরা "নূতন গ্রাহক" কথাটি লিখে দেবেন।
(৩) কূপনের উল্টো পিঠে পরিষ্কার অক্ষরে নাম ও ঠিকানা লিখবেন।
(৪) যাঁরা **রেজিস্টার্ড ডাকে** পত্রিকা নিচ্ছেন বা নিতে চান তাঁরা **ছয় টাকা** পাঠাবেন।

পাকিস্তানের গ্রাহকদের কোনো ভারতীয় ডাকঘর থেকে মনি-অর্ডার পাঠাবার অনুরোধ জানাই; তা সম্ভব না-হ'লে ব্যাঙ্কের মারফৎ ব্যবস্থা করতে হবে। পত্র লিখলে আমরা ব্যাঙ্কে দাখিলের জন্য বিল্ পাঠিয়ে দেবো।

চিঠিপত্র, মনি-অর্ডার, চেক ইত্যাদি পাঠাবার ঠিকানা:

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ২৯

লেখকদের বিষয়ে

* ।কবিতা'য় প্রথম প্রকাশ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র 'আন্তিগোনে' অনুবাদ নয়া দিল্লির সাহিত্য আকাদেমি থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে। *দিব্যেন্দু পালিত পড়াশুনো করেছেন ভাগলপুরে, বর্তমানে কলকাতায় কর্ম করেন। তাঁর গল্প ও কবিতা বহু পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়ে থাকে। বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নতুন কাব্যগ্রন্থ 'নিরন্ত নির্ঝর' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বিষ্ণু দে-র দুটি নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইলো: 'আলেখ্য' ও 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ'। গত গ্রীষ্মে অনুষ্ঠিত কবিতা-মেলা তাঁকে ও শ্রী অজিত দত্তকে সম্মাননা জানিয়েছেন। *ব্রজমাধব ভট্টাচার্য ব্রিটিশ গিয়ানাতে টেগোর মেমরিএল স্কুলের অধ্যক্ষ। শান্তিকুমার ঘোষ লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স থেকে ডক্টরেট উপাধি নিয়ে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্য-এর উপন্যাস 'অপরা' প্রকাশ করেছেন নিউ স্ক্রিপ্ট। আর-একটি উপন্যাস, 'তিন চরিত্র' সবিতা প্রকাশভবন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতিভা বসু-পরিচালিত

শিশুবিতান

একটি নতুন ধরনের স্কুল।
নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত
ছাত্রছাত্রী নেয়া হয়।

ভর্তি চলছে।

১১২/১ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড,
কলকাতা ২৬

অনুসন্ধানের জন্য—
টেলিফোন: ৪৬-১২০৪

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

নতুন কবিতার বই

নিরন্ত নির্ঝর

প্রকাশক: শতভিষা প্রকাশনী

দুই টাকা

কবিতাভবনে প্রাপ্তব্য

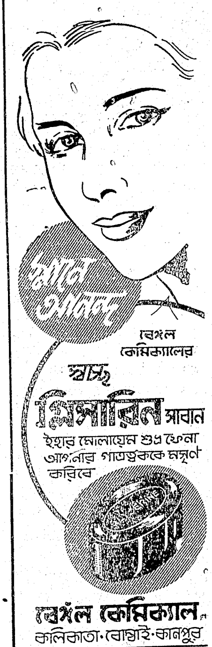

Books on Art :

INDIAN TEMPLE SCULPTURE
With an Introduction
by
Jawaharlal Nehru,
Text by
K. M. Munshi
140 Plates.
Rs. 36.00 net.

—

THE ART OF THE CHANDELAS
Text with Descriptions
by
O. C. Gangoly
60 Plates
Rs. 32.00 net.

—

THE ART OF THE PALLAVAS
Text and Descriptive Notes
by
O. C. Gangoly
46 Plates.
Rs. 32.00 net.

—

RUPA & CO.
15, Bankim Chatterjee St.,
Calcutta-12.

107, South Malaka, Allahabad-1
11, Oak Lane, Fort, Bombay-1

কবিতা

বর্ষ ২১

ও

বর্ষ ২২-এর

সম্পূর্ণ সেট

পাওয়া যাচ্ছে।

বহু মূল্যবান কবিতা

অনুবাদ-কবিতা

ও

প্রবন্ধের সঞ্চয়ন।

প্রতি সেট পাঁচ টাকা

মাশুল স্বতন্ত্র

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়ে প্রকাশিত। * আশ্বিনে বর্ষারম্ভ, বৎসরের প্রথম সংখ্যা থেকে গ্রাহক হ'তে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা এক টাকা, বার্ষিক চার টাকা, রেজিস্টার্ড ডাকে ছয় টাকা, ভি. পি. স্বতন্ত্র। * ষাণ্মাসিক গ্রাহক করা হয় না। * চিঠিপত্রে গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ আবশ্যিক। * ঠিকানা-পরিবর্তনের খবর দয়া ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবেন, নয়তো অপ্রাপ্ত সংখ্যা পুনরায় পাঠাতে আমরা বাধ্য থাকবো না। অল্প সময়ের জন্য হ'লে স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। * অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে যথাযোগ্য স্ট্যাম্পসমেত ঠিকানা-লেখা খাম পাঠাতে হয়। প্রেরিত রচনার প্রতিলিপি নিজের কাছে সর্বদা রাখবেন, পাণ্ডুলিপি ডাকে কিংবা দৈবাৎ হারিয়ে গেলে আমরা দায়ী থাকবো না। * সমস্ত চিঠিপত্রাদি পাঠাবার ঠিকানা:

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ

কলকাতা ২৯

22

2288